রানা প্লাজার মর্মান্তিক ঘটনা ও পোশাক শিল্পের উন্নয়নে নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম
নাগরিক উদ্যোগ

রানা প্লাজার মর্মান্তিক ঘটনা ও পোশাক শিল্পের উন্নয়নে নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া

সম্পাদনা
জাকির হোসেন
আবুল হোসাইন
এ. এস. এম. সাদিকুর রহমান

রানা প্লাজার মর্মান্তিক ঘটনা ও পোশাক শিল্পের উন্নয়নে নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া

সম্পদনা
জাকির হোসেন
আবুল হোসাইন
এ. এস. এম. সাদিকুর রহমান

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৪

প্রকাশক
বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম ও
নাগরিক উদ্যোগ
বাড়ি নং ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৫৮৬৮, ফ্যাক্স: ৯১৪১৫১১,
ই-মেইল: info@nuhr.org

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
বারেক হোসেন মিঠু

আলোকচিত্র
ইন্টারনেট

মুদ্রণ
চৌধুরী প্রিন্টার্স এন্ড সাপ্লাই
৪৮/এ/১, বাড্ডানগর লেন, পিলখানা
ঢাকা-১২০৫

মূল্য
১৫০ টাকা

ISBN: 978 984 33 90912

উৎসর্গ

রানা প্লাজা-তাজরীনসহ সকল গার্মেন্ট বিপর্যয়ে
নিহত ও আহত শ্রমিকদের প্রতি

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রপ্তানিশিল্পে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এ শিল্পের জন্য বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনাময় এক দেশ। শুরুতে খুব পরিকল্পিতভাবে গড়ে না উঠলেও প্রতিবছর এ খাতের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। প্রায় তিন দশকের এ শিল্প বিকাশের সাথে সাথে দুর্ঘটনার সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। কিন্তু ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধস যেন অতীতের সকল দূর্ঘটনাকে ছাড়িয়ে যায়। এ ধস বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের ইতিহাসে এক ভয়াবহ ঘটনা। বলা হয়ে থাকে, এটি বিশ্বে শিল্পক্ষেত্রে তৃতীয় বৃহত্তম ঘটনা। এ বিপর্যয় যেন আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে, এ শিল্পের হাজারো সমস্যা ও অনিয়ম; কমপ্লায়েন্স, শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা, প্রচলিত আইনকানুন ও বিধিবিধান ইত্যাদি বিষয়গুলোকে উপেক্ষিত রেখে মুনাফা অর্জনকেই মূখ্য করে দেখা হয়েছে।

এ ঘটনার পর দেশ-বিদেশে সমালোচনার ঝড় ওঠে। দেশের বরেণ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গও এ বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও সভা-সেমিনারে তাদের মতামত প্রদান করেন। আসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রস্তাবও। সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে প্রাধান্যের ভিত্তিতে বেশ কিছু প্রবন্ধ নিয়ে এ মূলত সংকলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সাথে সাথে এ সংকলনটি প্রকাশের আরো একটি উদ্দেশ্য গার্মেন্টস শিল্পের অন্যতম এ ঘটনাকে ঘিরে যে চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছিল, তা যেন আমাদের স্মৃতিপট থেকে মুছে না যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ হয়ে থাকে। আর সংগত কারণেই রানা প্লাজা ধস এবং ধস পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতা, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের তথ্য সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। সেই সাথে সাথে রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় নিহত, আহত ও নিখোঁজদের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

সংকলনটিতে গার্মেন্টস শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা ও সংস্কারের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্বিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে গার্মেন্টস শিল্পের ভবিষ্যৎ, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন-বিধিবিধানের সংস্কার, শ্রমিক আন্দোলন, গার্মেন্টস-এর কর্মপরিবেশ, শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি নিয়ে।

আশা করি, এ সংকলনের তাত্ত্বিক আলোচনা ও তথ্যসমূহ দেশের চিন্তাবিদ, নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী এবং গার্মেন্টস শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিদের এ বিষয়ক কর্মকাণ্ডে প্রণোদনা যোগাবে এবং ভবিষ্যতে দিক নির্দেশনাও দেবে।

জাকির হোসেন
প্রধান নির্বাহী
নাগরিক উদ্যোগ

আবুল হোসাইন
আহ্বায়ক
বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম

সূচীপত্র

এক নজরে রানা প্লাজা ধস ৯
রানা প্লাজা ভবন ধসে উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ তৎপরতার তথ্যের সংকলন ১০
জরুরি সহায়তা ও পুনর্বাসন ১২
উদ্ধার ও হতাহতের পরিসংখ্যান ১২
সরকারের অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক উদ্ধারকাজ পরিচালনায় আনুসাঙ্গিক ব্যয় ১৩
এনজিও কতৃক জরুরী সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের বিবরণী ১৪
রানা প্লাজা ধসে আইনগত ব্যবস্থা ১৫
শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ১৬

প্রবন্ধসমূহ

সাভার ট্র্যাজেডি, পোশাকশিল্প ও বাংলাদেশ ১৯
মুহাম্মদ ইউনূস

বিদেশি চাপ নয়, প্রয়োজন শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়ন ২৪
ফজলে হাসান আবেদ

উপলক্ষটি আত্মোপলব্ধি ও আত্মসমালোচনার ২৭
সৈয়দ আবুল মকসুদ

আরেকটি 'গার্মেন্টস হত্যাকাণ্ড' এবং লুটেরা বুর্জোয়ার স্বার্থ ৩১
হায়দার আকবর খান রনো

পোশাক শ্রমিকদের জীবন এত মূল্যহীন নয় ৩৪
হামিদা হোসেন

হারানো অধিকার, হারানো জীবন ৩৬
আইরিন খান

সংকট উত্তরণে কিছু প্রস্তাব ৩৮
রুবানা হক ও আনিসুল হক

মালিকের জন্য দায়মুক্তি, জাতির জন্য শোক! ৪১
ফারুক ওয়াসিফ

বিল্ডিং কোড প্রয়োগের একটি পথনির্দেশনা ৪৪
মেহেদী আহম্মদ আনসারী

নারী নূপুর পরা নিথর 'পা' যা বলে গেল ৪৬
কাবেরী গায়েন

ভবনধস এড়াতে যা যা করা দরকার ৪৯
মো. আলী আকবর মল্লিক

আইন না মানার কারণেই এমনটি হয়েছে ৫১
মোবাশ্বের হোসেন

সাভার ট্র্যাজেডির পর দেশের রাজনীতিতে বিতর্ক ও ধাঁধা ৫৪
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

জিএসপি, টিকফা ও গার্মেন্টস ৫৭
আনু মুহাম্মদ

সাদাকালো এত লাশ, এর দায়িত্ব কার ৬০
আহমদ রফিক

মানুষকে ফুঁসে উঠতে হবে ৬৩
হাসান ফেরদৌস

শ্রমিকরা মরণফাঁদে ৬৬
এ এম এম শওকত আলী

সাক্ষাৎকার : জামিলুর রেজা চৌধুরী ৬৯

সাক্ষাৎকার : স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন ৭৩

তৈরি পোশাক খাতঃ এগোনোর পথ ৭৭
ফাহমিদা খাতুন

সাভার ট্র্যাজেডি ও আমাদের সাংবাদিকতা ৮০
শাইখ সিরাজ

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও রাজনীতি ৮২
বদিউল আলম মজুমদার

শুরু করতে হবে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কাজ ৮৫
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বিধ্বস্ত রানা প্লাজার জমিতে বিপণিবিতান! ৮৮
আলী ইমাম মজুমদার

ক্ষতিপূরণের ফাঁপা আশ্বাস ৯১
এম এম খালেকুজ্জামান

আইনগুলো সব কেন রানাদের পক্ষে? ৯৩
ডক্টর তুহিন মালিক

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব ৯৫
আয়েশা সানিয়া, সৈয়দ গালিব সুলতান, ফাহিম হাসান, নিশা নূর, রুমানা জেসমিন খান

নয়াউদারবাদী টি-শার্ট ৯৭
পাভেল পার্থ

সাভার ট্রাজেডি, পোশাক শিল্পখাত ও ভবিষ্যৎ করণীয় ১০০
এম এম আকাশ

রানা প্লাজা ধস ও পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ ১০৫
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

রানা প্লাজা ট্রাজেডির এক বছর: গার্মেন্টস শ্রমিকের কাজ, নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ এবং আজকের বাস্তবতা ১০৮

সেমিনার প্রতিবেদন: 'রানা প্লাজা ট্রাজেডির এক বছর: গার্মেন্টস শ্রমিকের কাজ, নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ এবং আজকের বাস্তবতা' ১১৫

পরিশিষ্ট-১ : রানা প্লাজা ধসে নিহতদের নামের তালিকা ১২০
(স্বজনদের মধ্যে হস্তান্তরিত মৃতদেহের তালিকা অনুসারে)

পরিশিষ্ট-২ : রানা প্লাজা ধসে নিহতদের নামের তালিকা ১৩১
(ডিএনএ রিপোর্ট অনুসারে)

পরিশিষ্ট-৩ : রানা প্লাজা ধসে নিখোঁজদের নামের তালিকা ১৩৪

পরিশিষ্ট-৪ : রানা প্লাজা ধসে আহতদের নামের তালিকা ১৩৮

এক নজরে রানা প্লাজা ধস

১. ২০১০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সোহেল রানা, তাঁর বাবা মো: আব্দুল খালেক এবং মা মর্জিনা বেগমের সাথে তন্ময় হাউজিং লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী সায়ফুলের ১০ তলা ভবন নির্মানের জন্য চুক্তি হয়।
২. সাভার পৌরসভা থেকে ভবন নির্মানের অনুমতি (অবৈধভাবে) পায় ১০ এপ্রিল ২০০৬।
৩. ভবনের আয়তন ১৭৮২৫.১১ বর্গমিটার।
৪. ভবন উদ্বোধন হয় ১৯ আগস্ট ২০০৯।
৫. ভবন ধসে পড়ে ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সকাল ৮.৫৮মিনিটে।
৬. মোট মৃতের সংখ্যা ১১৩৫।
৭. সরকারী হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন হাসপাতলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ১৬ জন।
৮. লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ৮৪৬ জনের।
৯. সরকারী হিসাব অনুযায়ী, নিখোঁজের তালিকায় রয়েছেন ৩৩২ জন (যদিও নিখোঁজের সংখ্যা আরো অনেক বেশী বলে অনেকে মনে করেন)।
১০. উদ্ধার অভিযানের সময় মারা গেছেন ২ জন, আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন।
১১. অজ্ঞাত পরিচয়ে জুরাইন কবরস্থানে লাশ দাফন হয়েছে ২৯১ জন।
১২. ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলে লাশের আলামত জমা হয়েছে ৩১৬ জনের (যদিও কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাত আরও ২৫টি লাশের বিষয়ে কোন তথ্য দিতে পারেননি)।
১৩. ঢাকা জেলা প্রশাসন থেকে নিহত ৮৪০ পরিবারকে ২০,০০০ টাকা এবং আহত ৯৮১ জনকে ৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।
১৪. রানা প্লাজায় বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ-

৭ম ও ৮ম তলা
নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড (গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি)
৬ষ্ঠ তলা
ফ্যান্টম টেক
৫ম তলা
ইথারটেক লিমিটেড (গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি)
৪র্থ তলা
ফ্যাটম অ্যাপারেলস লিমিটেড (গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি)
৩য় তলা
নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড (গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি)
২য় তলা
মার্কেট ও ব্র্যাক ব্যাংকের শাখা
১ম তলা
মার্কেট এবং ব্রাক ব্যাকের এটিএম বুথ
বেইজমেন্ট
গাড়ি পার্কিং এর স্থান ও সোহেল রানার ব্যক্তিগত অফিস

রানা প্লাজায় অবস্থিত গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে উৎপাদিত পণ্যের বিদেশী ক্রেতা

১. অ্যাসোসিয়েটস ব্রিটিশ ফুডস পিএনসি এর প্রাইমার্ক
২. কানাডিয়ান লবেলা কসলিমেটেড লিমিটেড এবং
৩. স্প্যানিশ কোম্পানি ম্যাংগো

বিগত বছরগুলোতে পোশাক কারখানাগুলোতে একাধিকবার দূর্ঘটনা ঘটলেও বিদেশী কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি।

রানা প্লাজা ভবন ধসে উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ তৎপরতার তথ্যের সংকলন

রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় সেদিন সর্বস্তরের জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে উদ্ধার কাজে অংশগ্রহন করেন। দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই ধসের পর আহত ও নিহত ব্যাক্তিদের উদ্ধার, চিকিৎসা, সৎকার, মানবিক সহায়তা ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহন করেন। এ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাদের সর্বশক্তি নিয়ে এ বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাড়ান এবং দুর্গতদের প্রতি হাত বাড়ান। রানা প্লাজা ধসের ঘটনাটি সেদিন দেশের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষসহ পুরো জাতিকে এক করেছিল।

রানা প্লাজা উদ্ধার কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সমন্বয় সেলের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা নিম্নরুপ:

১. নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা	প্রধান সমন্বয়ক
২. দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৩. দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তারের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৪. স্বারাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫. তথ্য মন্ত্রনালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬. জেলা প্রশাসক, ঢাকা	সদস্য
৭. পুলিশ সুপার, ঢাকা	সদস্য
৮. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৯. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১০. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর এক জন প্রতিনিধি	সদস্য

সরকারের সম্মতিতে ১৪.০৫.২০১৩ তারিখ সকাল ৬টায় উদ্ধার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষনা করা হয়।

উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ সরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা

- দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়
- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
- জেলা প্রশাসন, ঢাকা
- বাংলাদেশ পুলিশ
- র‍্যাব
- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
- আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

উদ্ধার কার্যক্রমে সহযোহিতা

- জেলা প্রশাসন, ঢাকা
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
- আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
- এ্যাকশন এইড, বাংলাদেশ

চিকিৎসা কার্যক্রম

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে যে সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকে আহত রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হয় তার বিবরণ:

হাসপাতালের নাম	জরুরী/ প্রথমিক চিকিৎমসাপ্রাপ্ত	রেফার্ড
সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৩৫	৫৯
এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১০০	০১
সুপার ক্লিনিক	৫৫	০০
সিমা জেনারেল হাসপাতাল	১৩০	০০
সাভার জেনারেল হাসপাতাল	৩০	০০
লেকজোন হাসপাতাল-১	৫৪	০০
লেকজোন হাসপাতাল-২	১৭	০০
রাবেয়া হাসপাতাল	০৬	০০
ওয়ান্ডার হাসপাতাল	০১	০০
প্রাইম হাসপাতাল	২৫	০০
প্রিন্স হাসপাতাল	১৫	০০
রেজিয়া ক্লিনিক	৩৮	০০
আল-মদিনা হাসপাতাল	০৩	০০
দ্বীপ ক্লিনিক	৩৮	০০
পলাশ হাসপাতাল নিউ দ্বীপ ক্লিনিক	৩৬	০০
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতাল, সাভার	০০	০০
সি. আর.পি, সাভার	০০	০০
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	০০	১১
পলাশ হাসপাতাল	০০	০০
রোজ ক্লিনিক	০০	০০

জরুরি সহায়তা ও পুনর্বাসন

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল:

ক্রম.নং	বিবরণ	টাকার পরিমান
০১	৩৬ জন গুরুতর আহতের অনুকূলে অনুদান (পারিবারিক সঞ্চয়পত্র)	৩,৯০,০০,০০০/-
০২	৭৯৮ জন নিহতের পরিবারের ১০৯৯ সদস্যের মাঝে ১০৪৭ টি চেক হস্তান্তর	১২,৩৩,৫০,০০০/-
০৩	ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে (১ম ও ২য় পর্যায়ে) সনাক্তকৃত মোট ১৬৪ নিহতের ২২৮ জন নিকটাত্মীয়ের অনুকূলে অনুদান	২,৭৬,০০,০০০/-
০৪	স্বেচ্ছাসেবক জনাব এজাজ উদ্দিন চৌধুরী কায়কোবাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে প্রেরণে এয়ার এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া এবং চিকিৎসা বাবদ অনুদান	৩৫,০০,০০০/- + ৭০,৯৬,৭২০/- =১,০৫,৯৬,৭২০/-
০৫	স্বেচ্ছাসেবক জনাব এজাজ উদ্দিন চৌধুরী কায়কোবাদ-এর স্ত্রী বেগম জারমিন ও দুই সন্তানকে অনুদান	১২,০০,০০০/-
০৬	আহতদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের খরচ নির্বাহের জন্য ২২ টি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের অনুকূলে অনুদান	১,৪২,১৪,০০০/-
০৭	ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী, ঢাকা (ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্তকৃত নিহতদের পরিচয় নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষার খরচ নির্বাহের নিমিত্ত)	৫০০,০০,০০০/-
০৮	দুর্ঘটনাস্থলের চারদিকে টিন ঘেরা বাবদ ব্যয়	৩,৯৫,০০০/-
মোট		**২২,১৩,৫৫,৭২০/-** **(বাইশ কোটি তের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সাতশত বিশ)**

উদ্ধার ও হতাহতের পরিসংখ্যান

মোট উদ্ধার	৩৫৫৫ জন	
জীবিত উদ্ধার	২৪৩৮ জন	
মরদেহ উদ্ধার	১১১৭ জন	
জীবিত উদ্ধারকৃতদের মধ্যে হাসপাতালে মারা যায়	১৮ জন	
মোট মৃতের সংখ্যা	১১৩৫ জন	
আত্মীয়-স্বজনের নিকট মরদেহ হস্তান্তর করা হয়	৮৪৬ টি	পরিশিষ্ট-১
ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্তকৃত	২০৬ জন	পরিশিষ্ট-২
আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের মাধ্যমে দাফন করা হয়	২৯১টি	
নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা	২৭৬ জন	পরিশিষ্ট-৩
আহত ব্যক্তির সংখ্যা (যাদেও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে)	৮৪৪ জন	পরিশিষ্ট-৪
অঙ্গহানী বা স্থায়িভাবে পঙ্গু ব্যক্তির সংখ্যা	৩০ জন	

সূত্র : জেলা প্রশাসন, ঢাকা

বি: দ্র: রানা প্লাজায় নিহত, আহত, বিশেষ করে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্তকৃত লাশের সংখ্যা ও নিখোঁজদের তালিকার সংখ্যা নিয়ে সেনাবাহিনী, মন্ত্রণালয়সমূহ, ঢাকা জেলা প্রশাসন, বিজিএমইএসহ বিভিন্ন এনজিও ও শ্রমিকদের সংগঠনসমূহের মধ্যে তারতম্য আছে।

রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনায় সরকারি হিসাব মতে, ১১৩৫ টি লাশের মধ্যে ৮৪৬ টি লাশ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার গুলোর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি ২৯১ জনের লাশ অজ্ঞাত পরিচয়ে জুরাইন কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। এছাড়া লাশ সনাক্ত করার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ এর ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং পরীক্ষগারে আলামত হিসেবে যতগুলো লাশের আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু লাশের সংখ্যা তার থেকে কম। অতিরিক্ত আলামতের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন উত্তর দেননি।

সরকারের অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক উদ্ধারকাজ পরিচালনায় আনুসাঙ্গিক ব্যয়

ক্রমিক নং	সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নাম	বিবরণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
০১	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	উদ্ধার কাজ পরিচালনা ব্যয়	১,২১,৩৬,৯৬২.৫৬/-
০২	জেলা প্রশাসন, ঢাকা	হস্তান্তরিত লাশের সৎকার বাবদ (৮৪৪ x ২০,০০০/-)	১,৬৮,৮০,০০০/-
		আহতদের তাৎক্ষণিক প্রদান (৮৪৪ x ৫০০০/-)	৪২,২০,০০০/-
		নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের প্রদান (৬৫ x ৫০০/-)	৩২,৫০০/-
		উদ্ধারকাজে জরুরী যন্ত্রাংশ ক্রয় করে ফায়ার সার্ভিসকে প্রদান, জ্বালানী সরবরাহ, লাশ হস্তান্তরের নিমিত্তে মালামাল ক্রয়, এ্যাম্বুলেন্স/ বাস/ মাইক্রোবাস ভাড়া, রোবার স্কাউটদের নাস্তা, কাঁটা তাঁরের বেড়া ও আনুসঙ্গিক।	৪২,৫৩,৩১৮/-
		মোট	২,৫৩,৮৫,৮১৮/-
০৩	ঢাকা জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলার জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক নিহতদের লাশ দাফন, কাফন, পরিবহন ও আনুষাঙ্গিক কাজে ব্যয়িত অর্থ		৩৫,১৫,৪৩৯/-
০৪	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	গাড়ি, পাম্প, উদ্ধার সরঞ্জাম ইত্যাদি বাবদ	২৫,০০,০০০/-
০৫ জেলা সুপার, ঢাকা		তাঁবু, লোহার রোড ব্লক ইত্যাদি বাবদ	২৭,০৩,০০০/-
সর্বমোট			**৪,৬২,৪১,২১৯.৫৬/-** **(চার কোটি বাষট্টি লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুই শত উনিশ টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা)**

এনজিও কতৃক জরুরী সহায়তা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের বিবরণী

ক্রম	সংস্থার নাম	বাজেট	বাস্তবায়নকাল	দাতা সংস্থার নাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	উপকারের ধরণ
০১	কারিতাস-বাংলাদেশ	৩,৬৮,৭৭,৩৯২/-	জানুয়ারি/১৪-ডিসেম্বর/১৪	কারিতাস লুক্সেমবার্গ	৩,০১৯ জন	জরুরী ত্রাণ বিতরণ- ১০০০ জন মনোসামাজিক সহায়তা প্রদান-১৩০৯ জন। নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদনি-৫০ জন। মনোসামাজিক কার্যক্রম-৫০০ জন, কারিগরী প্রশিক্ষণ-৬০ জন। চিকিৎসা সহায়তা এবং খাদ্য সহায়তা-১০০ জন।
			এপ্রিল/১৩-অক্টোবর/১৩			
০২	কৈননীয়া	১৪,৮৬,০০০/-	সেপ্টেম্বর/১৩-মে/১৪	হিউকোমেডিকা জার্মানী	৬ জন	২ জনকে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন। ৪ জনকে পুনর্বাসন
০৩	হোপ-৮৭ বাংলাদেশ	৯,৯৫,০৫০/-	মে/১৩-অক্টোবর/১৩	হোপ-৮৭ অস্ট্রিয়া	৬ জন	কৃত্রিম হাত ও পা সংযোজন-২ জন, পুনর্বাসন-৪ জন।
০৪	ইসলামিক এইড বাংলাদেশ	৬৮,৮১,৯০০/-	জুন/১৩-মে/১৪	হেলপিং হ্যান্ড ফর রিলিফ এন্ড ডেভেলপমেন্ট-ইউএসএ	৭,৭৩০ জন	পুনর্বাসন-১২০জন, কফিন বিতরণ-২০ জন, মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট বিতরণ-৫০ জন, খাবার বিতরণ-১৯২ জন, সহায়তা প্রদান-১৬ জন।
০৫	সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টাঃ	৬৫,৬৪,৬৫৮/-			৫০০ জন	কারিগরী প্রশিক্ষণ-১০০ জন, আয়বর্ধন কর্মসূচিতে সহায়তা-১০০ জন, হেলথ সাপোর্ট-১০০জন, শিক্ষা-১০০জন, পুনর্বাসন-১০০জন।
০৬	স্পন্দন-বি	৪৮,০০,০০০/-	মে/১৩-ডিসেম্বর/১৩	স্পন্দন-বিইউএসএ	৩৯৮ জন	পুনর্বাসন-১২০ জন, কফিন বিতরণ-২০ জন, মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট বিতরণ-৫০, খাবার বিতরণ-১৯২ জন, সহায়তা প্রদান-১৬ জন।
০৭	ট্রাস্ট	৪,৮২,০০,০০০/-	অক্টোবর/১৩-সেপ্টেম্বর/১৫	এফ সি আর পি - কানাডা সোসাইটি	৬১১ জন	ইমারজেন্সী মেডিক্যাল এন্ড থেরাপি সার্ভিস-৩৭৪জন। ভকেশনাল ট্রেনিং সুবিধা প্রদান-৮০ জন, পারিবারিক সহায়তা-৩৭ টি পরিবার, জীবিকা সহায়তা প্রদান-১২০ জন।
			ডিসেম্বর/১৩-মে/১৩	উয়াং ফাউন্ডেশন লিঃ		
			ডিসেম্বর/১৩-মার্চ/১৪	হাই কমিশন অব কানাডা		
			নভেম্বর/১৩-জুলাই/১৪	অটো গ্রুপ		
			জুলাই/১৩-মার্চ/১৪	বাঁচাও-ইউ এস এ		
			মে/১৩-ডিসেম্বর/১৩	সাভার ট্রাজিডি সাপোর্ট গ্রুপ-আস্ট্রেলিয়া		
০৮	সেন্টার ফর ডিজ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট	৯,৫০,৫৩০/-	মে/১৩-অক্টোবর/১৩	রাইট ফর দি ওয়ার্ল্ড এন্ড টুল বক্স ডব্লিউ এ-অস্ট্রেলিয়া	১৬১ জন	কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন-১১ জন, হুইল চেয়ার বিতরণ-১৫০
০৯	নিজেরা করি	৫১,৫০,০৬৮/-	জুলাই/১৩-অক্টোবর/১৩	ডি-ডে(আনটিল দি ভাইয়োলেন্স স্টপস)	২২৬ জন	স্বাস্থ্য সহায়তা-৬ জন পুনর্বাসন-১০৮ জন। খাদ্য সহায়তা-১১২ জন।

১০	ব্রাক	৫,৪৬,০০,০০০/-	ফেব্রুয়ারি/১৪-জানুয়ারি/১৫	ব্রাক ইউকে	৪০০ জন	জীবিকা সহায়তা-৩৫০ জন এফডিআর-৪২ জন। কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন-৮ জন
			জুলাই/১৩-জুন/১৪	বেনটন গ্রুপ-ইতালি		
১১	গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৭,৫৯,৫০০/-	জুলাই/১৩-ডিসেম্বর/১৩	মেডিকো ইন্টারন্যাশনাল-জার্মানী	৩২১৯ জন	প্রাথমিক চিকিৎসা-২৯২৬ জন হাসপাতাল চিকিৎসা-২৭২ জন। এমপুটেশন-২১
১২	সুরভী	৭,৫৯,৬৮৪/-	সেপ্টেম্বর/১৩-নভেম্বর/১৩	হিউম্যান কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল-কানাডা	৪৪ জন	গাভী বিতরণ-১৫ জনকে ছাগল বিতরণ-৭ জনকে মুদির দোকান-১২ জনকে সেলাই মেশিন-১০ জনকে
	মোট	**১৬,৯০,২৪,৭৮২/- (ষোল কোটি নব্বই লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত বিরাশি টাকা মাত্র)**			**১৬৩২০জন**	

সুত্র: এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

রানা প্লাজা ধসে আইনগত ব্যবস্থা

২৪ এপ্রিল ২০১৩ ভবন ধসের পর সাভার মডেল থানার এক পুলিশ সদস্য, জেলা গোয়েন্দা সংস্থার একজন ডিবি পুলিশ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), এবং ভবন ধসে নিহত এক শ্রমিকের স্ত্রী বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানা এবং পাঁচটি গার্মেন্টসের মালিকসহ বেশ কিছু ব্যক্তিকে (এঁদের মধ্যে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও রয়েছেন) অভিযুক্ত করে পৃথক পৃথক ভাবে থানা এবং আদালতে পাঁচটি মামলা দায়ের করেন। পুলিশ সদস্যরা অভিযুক্ত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেন।

রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর অথরাইজড অফিসার হেলাল আহমেদ বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানাকে আসামী করে ইমারত নির্মান আইন, ১৯৫২এর ১২ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। যার নম্বর-৫৩, তারিখ- ২৪-৪-২০১৩। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৪ এপ্রিল ২০১৩ এসআই ওয়ালী আশরাফ বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানা, তাঁর পিতা মো: আব্দুল খালেক, 'ফ্যান্টম অ্যাপারেলস্ লিমিটেড' এর চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম, 'ফ্যান্টম টেক' লিমিটেড এর স্প্যানিস ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডেভিড মেয়ের রিকো, ইথার টেক লিমিটেড এর চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান এবং 'নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড এবং 'নিউ ওয়েভ স্টাইল লিমিটেড এর চেয়ারম্যানবজলুস সামাদ আদনান সহ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে দন্ডবিধির ৩৩৭/৩৩৮/৩০৪ (ক)/৪২৭/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-৫৫; তারিখ:২৪-৪-২০১৩। যেহেতু রানা প্লাজা ধ্বসে পড়ার পর ধামরাই এলাকার সোহেল রানার মালিকাধীন এক ইটের ভাটা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ, তাই গোয়েন্দা শাখার এসআই মীর শাহীন শাহ্ পারভেজ বাদী হয়ে ভবন মালিক সোহেল রানাকে অভিযুক্ত করে ধামরাই থানায় অস্ত্র আইন , ১৮৭৮ এর ১৯ (এ) ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। এছাড়া ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (বি) ধারায় ধামরাই থানায় আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়। যার নম্বর-৪, তারিখ: ৬-৫-২০১৩। এছাড়া পোশাক শ্রমিক জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী শিউলি আক্তার বাদী হয়ে গত ৫ মে ২০১৩ ঢাকা মহানগর মূখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা, নিউ ওয়েভ স্টাইল গার্মেন্টসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বজলুস সামাদ আদনান এবং সাভার পৌরসভার প্রধান প্রকৌশলী ইমতেমাম হোসেন বাবুকে অভিযুক্ত করে দ-বিধির ৩০২/৩৪/৫০৬ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ পর্যন্ত কোনো মামলার তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান করা হয়নি। জামিনে আছেন প্রায় ৮ জন চিহ্নিত আসামী।

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ

রানা প্লাজা ধসের পর দেশে-বিদেশে সমালোচনার ঝড় উঠলে আইএলওর নেতৃত্বে রানা প্লাজা সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়। এতে বিদেশি ক্রেতাপ্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশি শ্রমিক সংগঠন ও সরকারের প্রতিনিধিরা আছেন। রানা প্লাজার শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম অধিকার সংগঠন 'ইন্ডাস্ট্রি অল গ্লোবাল ইউনিয়ন' যৌথভাবে একটি তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেয়। শুরুতে এ তহবিলের লক্ষ্য ছিল ৪ কোটি ডলার বা ৩১০ কোটি টাকা। তবে সমন্বয় কমিটি পরবর্তীতে হিসাব করে দেখেছে ২৩০ কোটি টাকা হলেও (৩ কোটি ডলার) ক্ষতিপূরণের পূর্ণাঙ্গ অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব।

রানা প্লাজা ক্ষতিপূরনের জন্য তহবিলের লক্ষ্যমাত্রা এক কোটি ডলার কমিয়ে ৩ কোটি ডলারে নামিয়ে আনা হয়েছে। ইতিমধ্যে ২ কোটি ১০ লাখ ডলার (১৭০ কোটি টাকা) যোগাড় হয়েছে। আর ৯০ লাখ ডলার (৬০ কোটি টাকা) প্রয়োজন। ওই পরিমাণ অর্থ হলে সব ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে। মার্চ, ২০১৫ মধ্যে এ অর্থ যোগাড় করতে সর্বাত্নক চেষ্টা চলছে। পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণের রানা প্লাজার ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে অর্থপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা চলছে। তবে শেষ পর্যন্ত তা না পাওয়া গেছে রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে অর্থ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হবে।

প্রাথমিকভাবে ক্ষতিপূরণের ৪০ শতাংশ অর্থ পরিশোধের কাজটি ডিসেম্বর, ২০১৪ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়। নিহতের পরিবারের সদস্য (যাদের সনাক্ত করা গেছে) ও আহত শ্রমিকদের মধ্য থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যকে এই অর্থ দেয়া হয়েছে। আরো প্রায় সাড়ে ৪০০ শ্রমিকের পরিবারের সদস্যকে এই অর্থ দেয়া হবে।

সমন্বয় কমিটির হিসাব অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণের জন্য গঠিত রানা প্লাজা ডানারস ট্রাস্ট ফান্ড থেকে তিন কিস্তিতে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রায় আড়াই হাজার সদস্যকে তাদের অর্থ (দাবিনামা অনুযায়ী যাদের শনাক্ত করা গেছে) প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের ৪০ শতাংশ দেয়া হয়েছে। এর বাইরে প্রাইমার্ক নিউ ওয়েভ বটমের ৬০০ শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ দিয়েছে।

রানা প্লাজার ৫টি গার্মেন্টস থেকে পোশাক কিনত অন্তত ২৮টি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান। এসব ব্র্যান্ডকেই লক্ষ্য করেই মূলত আইএলওর ক্ষতিপূরণ তহবিল গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু দেড় বছরে ১৩টি ব্র্যান্ড অর্থ প্রদান করেছে। বাদবাকি অন্তত ১৫টি ব্র্যান্ড কোনো অর্থ দেয়নি। ক্রেতা প্রতিষ্ঠান প্রাইমার্ক ছাড়াও বোনমার্শে, সিএন্ডএ, লোবলো, চিলড্রেন্স প্লেস, ওয়ালমার্ট, এইচএন্ডএম, কেআইকে, ম্যাঙ্গো, ম্যাটালান, মাসকট ও প্রিমিয়ার ক্লদিং অর্থ দিয়েছে। রানা প্লাজার কারখানা থেকে পোশাক ক্রয় করে, এমন একাধিক ব্র্যান্ডও এতে অর্থ সহায়তা দিয়েছে। কিন্তু ক্যারিফোরসহ অনেক ব্র্যান্ডই ক্ষতিপূরণের অর্থ দেয়নি। আন্তর্জাতিক শ্রম অধিকার সাংগঠন ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন আগামী এপ্রিলের আগেই এ সব ব্র্যান্ডকে ক্ষতিপূরণ তহবিলে অর্থ শ্রদানের আহ্বান জানিয়েছে।

এদিকে আন্তর্জাতিক তিনটি সংগঠন যৌথভাবে 'কাউন্টডাউন ক্যাম্পেইন' বা 'ক্ষণ গণনা' শীর্ষক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। রানা প্লাজা ধসের ঘটনার দুই বছর হতে চললেও আহত পোশাকশ্রমিক ও নিহত শ্রমিকদের পরিবারগুলো ন্যায়বিচার পায়নি। ভোক্তা, সরকার ও ব্র্যান্ডগুলোকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে এই প্রচারাভিযান। একই সঙ্গে ব্র্যান্ডগুলোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ও এই কর্মসূচির বড় উদ্দেশ্য।

কিন্তু ব্র্যান্ডগুলো রানা প্লাজা ধসে ক্ষতিগ্রস্থদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও মিথ্যা সহানুভূতি দেখিয়েছে। সব মিলিয়ে ব্র্যান্ডগুলো এক হাজার কোটি ডলার উপার্জন করলেও তারা মাত্র তিন কোটি ডলার দিতে পারেনি। (সুত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৪)

তথ্যসুত্র:

- সপ্নভঙ্গ: রানা প্লাজা ধস, তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন অধিকার, জুন ২০১৩
- Primary Fact-Finding Report ASK Investigation Unit, 2013
- রানা প্লাজা ভবন ধসে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতার উপর প্রাপ্ত তথ্যের সংকলন, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য
- লাখো শ্রমিকদের বুক ফাটা কান্না, বাংলাদেশ টেক্সটাইল-গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
- বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা

সাভার ট্র্যাজেডি, পোশাকশিল্প ও বাংলাদেশ

মুহাম্মদ ইউনূস

এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড থেকে আমরা কি কিছু শিখলাম?

১) সাভার ট্র্যাজেডি জাতি হিসেবে আমাদের ব্যর্থতার প্রতীক। রানা প্লাজার ফাটল ফেটে ভবন ধসে দেখিয়ে দিল আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে বিশাল ফাটল ধরেছে, সেটা আমলে না নিলে জাতিও এ রকম ধসের ভেতরে হারিয়ে যাবে।

রানা প্লাজায় মৃত ব্যক্তিদের আত্মা আজ আমাদের কর্মকাণ্ড দেখছে, আমাদের আলোচনা শুনছে। আত্মাদের দীর্ঘশ্বাস আমাদের সর্বক্ষণ ঘিরে আছে।

এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড থেকে আমরা কি কিছু শিখলাম? নাকি শুধু মর্মান্তিক বেদনা জানিয়ে আমাদের কর্তব্য শেষ করব।

২) আমাদের করণীয় কী?

ক) এই ঘটনার যাতে ভবিষ্যতে কোনো দিন পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য কী কী করতে হবে।

খ) যারা প্রাণ হারাল, অঙ্গ হারাল, আয় হারাল, তাদের জন্য আমাদের করণীয় কী?

গ) পোশাকশিল্পকে শুধু রক্ষা নয় বরং শক্তিশালী করার জন্য আমাদের কী করতে হবে।

ঘ) সাভারে শুধু শুধু ভবন ধসে পড়েনি। রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠান ধসে পড়ার একটি বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এই ভবন ধসে পড়েছে। ভবনধসের বিশ্লেষণ করলে আমাদের ধসে পড়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর চেহারা ধরা পড়বে। এই ধস থামানোর উপায় বের করতে হবে।

৩) পোশাকশিল্পকে রক্ষা তো বটেই, বরং শক্তিশালী করা নিয়ে কিছু বলতে চাই।

সিটিজেন্স অ্যাকশন গ্রুপ গঠন

ক) পোশাকশিল্প সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে। বাংলাদেশে পোশাক তৈরি করতে বিপাকে পড়তে হচ্ছে বলে একটি বিশাল বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এই দেশ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এরপর আরও অনেকে তার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে এ দেশ থেকে চলে যেতে পারে। এটা যদি হয়, এটা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করবে। এই শিল্প শুধু আমাদের আয় বাড়াচ্ছে না, আমাদের নারীসমাজকে সম্পূর্ণ নতুন জীবনের সন্ধান দিয়ে সমাজে বিরাট পরিবর্তন এনেছে।

এই শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে দেওয়া যাবে না। বরং শক্তিশালী করার জন্য সমগ্র জাতিকে একতাবদ্ধ হতে হবে।

সরকার, পোশাকশিল্পের মালিক, এনজিও, নাগরিক সমাজ সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বিদেশি ক্রেতাদের পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত করতে হবে যে, তারা যাতে আর কখনো আমাদের কারণে বিপাকে না পড়ে, সে ব্যাপারে সব পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আমরা একতাবদ্ধ এবং ভবিষ্যতে আমাদের অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে পালন করব।

খ) এদের প্রত্যেকে (সরকার, মালিকপক্ষ, নাগরিক সমাজ ইত্যাদি) যৌথভাবে যেমন কাজ করবে, তেমনি নিজ নিজ আওতায় স্বতন্ত্রভাবেও কাজ করে যাবে। নাগরিক সমাজকে নিজস্ব পদ্ধতিতে কর্মসূচি নিতে হবে। নাগরিক সমাজ দেশের পক্ষ থেকে বিদেশি ক্রেতাদের মনে আস্থা এবং আশা সৃষ্টির প্রয়াস নিতে পারে। তারা অবিলম্বে যৌথভাবে স্বাক্ষরিত একটি চিঠি ক্রেতা কোম্পানিগুলোর বোর্ড চেয়ারম্যান ও কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে পাঠাতে পারে। বক্তব্যের বিষয় হবে: বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরা, নারীর ক্ষমতায়নে এবং বাংলাদেশের ব্যাপক পরিবর্তনে এর ভূমিকা তুলে ধরে তাদের ধন্যবাদ জানানো। এই শিল্পের যাবতীয় সমস্যা মেটাতে সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে নাগরিক সমাজ প্রস্তুত হয়েছে, এটা জানানো।

এ ব্যাপারে যেসব কর্মসূচি নিয়ে তারা চিন্তাভাবনা করছে, সেটা জানানো, তাদের কর্মসূচি নিয়ে বৈঠক করার আগ্রহ প্রকাশ করা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটা 'সিটিজেন্স অ্যাকশন গ্রুপ ফর প্রটেক্টিং গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' বা অনুরূপ নামে যে একটা প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে, সেটা এবং এর পরিচিতি তাদের জানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

গ) আরেকটি চিঠি যাবে বিদেশি সংগঠন, এনজিও, কনসাল্টিং ফার্মের কাছে; যারা তৃতীয় বিশ্বের পোশাকশিল্পের মান উন্নয়ন, শ্রমিকস্বার্থ রক্ষা, মনিটরিং, স্ক্রিনিং ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে, তাদের কাছে। অ্যাকশন গ্রুপ তাদের সঙ্গে কাজ করতে চায়, তাদের সহযোগিতা চায়, এটা জানিয়ে দেওয়া। তাদের সঙ্গে বৈঠকের আহ্বান জানানো এবং ক্রমাগতভাবে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করা।

ঘ) ক্রেতা দেশগুলোর সরকারের বিভিন্ন এজেন্সিকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখা, আমরা পোশাকশিল্পের ব্যাপক পরিবর্তন আনার জন্য বদ্ধপরিকর, সেটা জানিয়ে দেওয়া।

ঙ) দেশের অভ্যন্তরে সরকার, শিল্পমালিক, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, শ্রমিক সংগঠন, এনজিও, বায়িং হাউস, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে চিঠি দেওয়া এবং কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য বৈঠক করা।

অ্যাকশন গ্রুপ নিয়মিতভাবে সরকার, বিদেশি ক্রেতা, শিল্পমালিক, পোশাকশ্রমিক ও অন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে পোশাকশিল্পের সম্প্রসারণ এবং পোশাকশ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে পোশাকশিল্প নিয়মিত মনিটর করবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পরামর্শ দেবে, সংবাদমাধ্যমকে অবহিত রাখবে ও কর্মসূচি নেবে। তারা হবে নাগরিক ওয়াচ ডগ প্রতিষ্ঠান।

শ্রমিকদের ব্যাপারে আমার দুটি প্রস্তাব

পোশাকশিল্পের সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু প্রস্তাব ক্রেতাদের কাছে আমি মাঝেমধ্যে দিয়েছি। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রস্তাব আমি এখন আবার ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তুলে ধরতে চাই। বিশেষ করে, পোপ ফ্রান্সিসের বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের 'ক্রীতদাসতুল্য শ্রমিক' ঘোষণা দেওয়ার পর আমার প্রস্তাবটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ মঙ্গলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

ক) আমার প্রথম প্রস্তাবটি এ রকম:

দেশে ন্যূনতম মজুরি আইন আছে। এর ফলে কোনো প্রতিষ্ঠান এর নিচে বেতন দিলে এটা বেআইনি প্রতিপন্ন হয়।

আমার প্রস্তাব হলো: পোশাকশিল্পের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে একটি আন্তর্জাতিক ন্যূনতম বেতন স্থির করে দেবে। বাংলাদেশে সর্বনিম্ন বেতনের হার যদি এখন ঘণ্টায় ২৫ সেন্ট হয়ে থাকে, এটাকে আন্তর্জাতিক শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক মানের করে সর্বনিম্ন ৫০ সেন্ট নির্ধারণ করে তারা সব দরদাম নির্ধারণ করবে। কোনো ক্রেতা এর নিচে বেতন ধরে দর নির্ধারণ করবে না, কোনো শিল্পমালিক এর নিচে বেতন ধার্য করবে না। এটা কমপ্লায়েন্সের একটা অঙ্গ হবে। এর একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এমন ধারণা করাই স্বাভাবিক। এর ফলে বাংলাদেশ 'সস্তা' শ্রমিকের জন্য যে পরিমাণ

আকর্ষণীয় হতে পেরেছিল, সে আকর্ষণীয়তা রাতারাতি হারিয়ে ফেলবে। এই আকর্ষণীয়তা ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশকে অন্যান্য দিক থেকে আকর্ষণীয়তার পরিমাণ বাড়াতে হবে। যেমন: শ্রমিকপ্রতি উৎপাদনের হার বাড়ানো, অন্যান্য সব দিক থেকে কর্মদক্ষতা বাড়ানো, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ আস্থা অর্জন করা, কোনোরূপ বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি যাতে না হয়, তার নিশ্চয়তা দেওয়া, শ্রমিকের মঙ্গল সর্বাঙ্গীনভাবে নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

এই আন্তর্জাতিক ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত না করা পর্যন্ত পোপের মর্মান্তিক উক্তি 'ক্রীতদাসতুল্য' অবস্থান থেকে আন্তর্জাতিক বাজারের পোশাক ব্যবসায়ীরা শ্রমিকদের নিষ্কৃতি দিতে পারবে না।

বিভিন্ন ক্রেতা দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে, ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে, নাগরিক গোষ্ঠী, চার্চ গ্রুপ এবং মিডিয়া নেতাদের সঙ্গে আন্তরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে সমর্থন অর্জন করতে হবে। আমি এ ব্যাপারে অতীতে চেষ্টা চালিয়েছি। সাভার ট্র্যাজেডির পর এবং পোপের ধিক্কারের পর আবার সুযোগ এসেছে বিষয়টি তুলে ধরার। আমি আমার দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আমার চেষ্টাকে আরও জোরদার করব, এই অঙ্গীকার করছি।

আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বোঝাতে হবে যে পোশাকশিল্পের শ্রমিক বাংলাদেশে বসে কাজ করলেও তাঁরা তাঁদের দেশের জন্যই শ্রম দিচ্ছেন। তাঁরা ওই দেশেরই ব্যবসার স্টেকহোল্ডার। এই শ্রমিকদেরই শ্রমে তাঁদের ব্যবসা। পারিশ্রমিকের ব্যাপারে তাদের থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন, সেটা হয় না। সেখানেই পোপের বক্তব্যের মূল মেসেজ। এটা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বুঝতে হবে। আন্তর্জাতিক কনজ্যুমারদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। আন্তর্জাতিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য সব ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে একমত করতে হবে এমন হওয়ারও দরকার নেই। কয়েকটি বড় ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে এগিয়ে এলেই কাজটা শুরু হয়ে যাবে। অন্যরাও ক্রমে ক্রমে এটা মেনে নেবে।

খ) আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অনেক দিন ধরে অনেকের কাছে দিয়েছি। কিন্তু দানা বাঁধেনি। এখন আবার নতুন করে বলার এবং বাস্তবায়নের সুযোগ দেখা দিয়েছে।

আমরা যে পোশাক পাঁচ ডলার দাম ধরে সুন্দর মোড়কে পুরে চমৎকার কার্টনে ভরে নিউইয়র্ক বন্দরে পৌঁছে দিই, সেই পোশাকের পেছনে তুলা উৎপাদনকারী কৃষক থেকে শুরু করে, তুলা প্রক্রিয়াজাত করা, পরিবহন করা, সুতা বানানো, কাপড় কেনা, রং করা, জামা তৈরি করে সুন্দর মোড়কে কার্টনে ভরে নিউইয়র্ক বন্দর পর্যন্ত নিয়ে যেতে যত শ্রম, ব্যবস্থাপনার মেধা এবং কাঁচামাল লেগেছে, বিভিন্ন **স্তরে মালিককে যা লাভ করতে হয়েছে, তার সবকিছু এই পাঁচ ডলারের মধ্যে নি**হিত আছে। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো বিপণিকেন্দ্র থেকে যখন একজন মার্কিন ক্রেতা ৩৫ ডলার মূল্যে এটা কিনে সস্তায় কেনার আনন্দ উপভোগ করেন, তখন মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে, এই বণ্টনব্যবস্থায় সামান্যতম পরিবর্তনও কি করা যায় না? উৎপাদন যারা করল, তারা সবাই মিলে পেল পাঁচ ডলার, বিক্রি করতে গিয়ে যোগ হলো আরও ৩০ ডলার। বিক্রয়মূল্যটা সামান্য একটু বাড়ালেই শ্রমিকদের জন্য অনেক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করার মধ্যেও কিছুটা সংগতি আসে। এই সংগতি আনার ব্যাপারেই আমার প্রস্তাব।

আমার প্রস্তাব হলো: ৩৫ ডলারের জামাটিকে যদি ৩৫ ডলার ৫০ সেন্টে কিনতে বলি, তাতে ক্রেতা কি খুবই বিচলিত বোধ করবে? এই অতিরিক্ত ৫০ সেন্ট দিয়ে যদি আমি উন্নত বিশ্বের কনজ্যুমারদের কাছে পরিচিত ও আস্থাভাজন একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় বাংলাদেশে একটি 'গ্রামীণ বা ব্র্যাক পোশাকশিল্প শ্রমিক কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করতে পারি, তাহলে শ্রমিকের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তার শারীরিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, অবসরকালীন নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, সন্তানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, সন্তানের দেখাশোনা, উপার্জন, ভ্রমণ সবকিছু এর মাধ্যমে করা সম্ভব।

এর জন্য কী করতে হবে? পোশাকের যে মূল্য দর-কষাকষির মাধ্যমে চূড়ান্ত হবে, তার ভিত্তিতে উৎপাদন চুক্তির যে

মূল্যমান দাঁড়াবে, তার ওপর ১০ শতাংশ টাকা আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান জমা দেবে। আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গঠিত 'শ্রমিক কল্যাণ ট্রাস্ট' শুধু ওই কারখানার শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য। কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে প্রতিটি কারখানার জন্য পৃথক উপতহবিল থাকবে, যাতে প্রতিটি কারখানার উৎপাদনের জন্য সে সে কারখানার শ্রমিকেরা সরাসরি উপকৃত হয়।

বাংলাদেশ যদি বছরে ১৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পোশাক রপ্তানি করে, আর সব ক্রেতা প্রতিষ্ঠান যদি এই প্রস্তাব মেনে নেয়, তবে এই তহবিলে প্রতিবছর ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার জমা পড়বে। এর ফলে ৩ দশমিক ৬ মিলিয়ন শ্রমিকের প্রত্যেকের জন্য বছরে ৫০০ ডলার করে কল্যাণ তহবিলে জমা হবে। এ রকম অর্থ সংগ্রহ করা গেলে এবং তা শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করা গেলে শ্রমিকদের অনেক দুঃখ লাঘব হবে। অন্যান্য দেশের জন্যও এটা একটা দৃষ্টান্ত হবে। শুধু ৩৫ ডলারের জামাটি ৩৫ ডলার ৫০ সেন্টে বিক্রি করলেই অনেক সমস্যা মিটে যায়।

কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠান যদি বলে, এর ফলে আমার বিক্রি কমে যাবে, আমার লাভ কমে যাবে, তাদের আমি বলব, এর জন্য যাতে আপনার বিক্রি না কমে, বরং যাতে বাড়ে, সে ব্যবস্থাও করা যায়। আপনার জামায় আমরা একটা ট্যাগ লাগিয়ে দেব: এতে লেখা থাকবে From the Happy Workers of Bangladesh, with Pleasure. Workers wellbeing being Managed by Grameen অথবা BRAC অথবা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠান। এর সঙ্গে সুন্দর একটা লোগো থাকবে, দেখলেই বুঝতে হবে, এই কারখানার শ্রমিকেরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে, উষ্ণতার সঙ্গে, এই জামা তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য অতিপরিচিত এবং আস্থাভাজন একটি প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব নিয়েছে। ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এটা তাদের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করতে পারবে। একজন কনজ্যুমার জামাটি কিনতে গেলেই বুঝতে পারবে, তার এই কেনার মাধ্যমে বাংলাদেশের একজন শ্রমিক সুস্থ-সুন্দর জীবনের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। বিক্রেতা কোম্পানির ওয়েবসাইট ও বার্ষিক রিপোর্ট থেকে যে কেউ জানতে পারবেন তাঁর জামার শ্রমিকদের জন্য কী কী সুযোগ-সুবিধা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এবং ক্রমাগতভাবে করা হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এতে ওই জামার বিক্রি বাড়বে, কমবে না।

শ্রমিকেরা যে তাঁদের পরিবারের অংশ, এটা দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়ীদের অনুভব করতে হবে। আগের মতো 'ক্রীতদাসতুল্য' শ্রমিকের দিন শেষ হয়ে যেতে হবে।

আমার প্রস্তাবের সঙ্গে সব ক্রেতা প্রতিষ্ঠান একমত হয়ে যাবে, এমন আশা আমি করছি না। আমি আশা করছি, দু-একটি প্রতিষ্ঠান এটা পরীক্ষামূলকভাবে করার জন্য এগিয়ে আসবে। তাদের দেশের সরকার ও শ্রমিক অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো, নাগরিক গোষ্ঠী, চার্চ গ্রুপ এটা সমর্থন করার জন্য এগিয়ে আসবে।

সাভারের গণমৃত্যুর প্রেক্ষাপটে এবং পোপের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আরও জরুরিভাবে সব পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

পোশাকশিল্পের বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়াটা আমাদের কাছে যেমন দুঃখজনক হবে, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও সমান দুঃখজনক হওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি। যে দেশ তাদের ব্যবসার কারণে গভীরভাবে উপকৃত হতে পারত, যে দেশে তাদের কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনগুলো দ্রুত চোখে পড়ার মতো হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, সে দেশে কাজ করাটা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের কাছে আনন্দদায়ক হওয়ারই তো কথা। যে দেশ তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারত, সে দেশ থেকে চলে যাওয়াটার মধ্যে কোনো সুখ নেই। সরকার ও নাগরিকেরা যদি একজোট হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের যাবতীয় অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য এগিয়ে আসে, তখন তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটা দেশের নতুন ভবিষ্যৎ গড়ার মধ্যেই থাকবে নতুন প্রজন্মের ব্যবসার আনন্দ। আমরা এই আনন্দ তাদের দিতে চাই। এই আনন্দ উপভোগ করতে তারা এগিয়ে আসবে বলেই আমার বিশ্বাস। শুধু যে ডিজনি চলে গেছে, তাদের ফিরিয়েই আনব না, বরং যারা এখানে এখনো আসেনি, তাদেরও এখানে আসার জন্য আগ্রহী করে তুলব আমরা। দুনিয়ার ব্যবসার জগতে পরিবর্তন আসছে। এখনো পরিবর্তনটি ক্ষীণ হলেও সেটা আসছে। আমরা সে পরিবর্তনকে গতিমান করে দিতে পারি। আমাদের কর্মকাণ্ড এবং তার ফলাফল সেই ভিত্তি তৈরি করে দিতে পারে।

সাভারবিষয়ক কর্মসূচি

সাভারে যত লোক প্রাণ হারিয়েছে, যাদের অঙ্গহানি হয়েছে, যারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সিটিজেন্স অ্যাকশন গ্রুপ তাদের একটা পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেইস তৈরি করতে পারে এবং ক্রমাগতভাবে আপডেট করে যেতে পারে। এর প্রাথমিক কাজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে করার উদ্যোগ ইতিমধ্যে নিয়েছে। অ্যাকশন গ্রুপ এটা সমন্বয় করার দায়িত্ব নিতে পারে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য এ পর্যন্ত অনেক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে, অনেক অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, এর সর্বোত্তম বাস্তবায়ন কীভাবে হতে পারে, এ ব্যাপারে অ্যাকশন গ্রুপ পরামর্শ দিতে পারে। কর্মসূচি মনিটর করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ রেখে তাদের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সঠিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে দিতে পারে।

সাভারের কারণে সৃষ্ট অসংখ্য পরিবারের সমস্যা নানাবিধ- তাৎক্ষণিক, স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি। বিভিন্ন মেয়াদের, বিভিন্ন ধরনের (স্বাস্থ্য, উপার্জন, লেখাপড়া ইত্যাদি) সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকর কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসার ব্যাপারে দেশবাসীকে উদ্যোগী রাখার জন্য অ্যাকশন গ্রুপকে প্রস্তুত হতে হবে।

আমাদের কি বোধদয় হবে না?

সাভার সারা জাতির মনে গভীর বেদনা ও বিশাল ক্ষত সৃষ্টি করে গিয়েছে। এই বেদনা ও ক্ষত আমাদের যেন আমাদের জাতীয় জীবনের মূল সমস্যা সমাধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে, এই কামনা করছি। সাভার আমাদের অপরাজনীতির সৃষ্টি। অপরাজনীতি যে আমাদের ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে, সেটা টেলিভিশনের পর্দার সামনে সাভারে অর্ধসহস্রাধিক অসহায় মৃত্যু, বহু শত মানুষের অঙ্গহানি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। তারপরও কি আমরা সবকিছু মেনে যাব? আমাদের কি বোধদয় হবে না?

মুহাম্মদ ইউনূস: *শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ও গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা*

সূত্র: প্রথম আলো, ০৯ মে ২০১৩

বিদেশি চাপ নয়, প্রয়োজন শক্তিশালী শ্রমিক ইউনিয়ন

ফজলে হাসান আবেদ

আমার দেশ বাংলাদেশ আবারও মাতম করছে। গত সপ্তাহে সাভারে বাজেভাবে নির্মিত একটি ভবন ধসে পড়েছে; কয়েকটি পোশাক কারখানা সেখানে বসানো হয়েছিল। ৩০০-এরও বেশি (এ লেখা পর্যন্ত) মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত, চূড়ান্ত সংখ্যা ৭০০-ও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় ধরনের দুর্যোগের সঙ্গেই বাংলাদেশের মানুষ পরিচিত। তাহলেও ১৯৭১-এ স্বাধীনতা অর্জনের পরের বিয়োগান্ত অধ্যায়গুলোর একটি হলো এ ঘটনা। কেননা, এ বিপর্যয় সহজেই এড়ানো যেত। ভবনের কাঠামোগত দুর্বলতা দেখার পরেও সেটা উপেক্ষা করা হয়েছে। যাঁরা এর শিকার, তাঁরা আমাদের সমাজের সবচেয়ে নাজুক মানুষ। কঠিন পরিশ্রমী ও সৎ কিন্তু দুর্দশাপূর্ণ জীবন তাঁদের। তাঁদের অনেকের মৃত্যু হয় পশ্চিমা ব্র্যান্ডগুলোর জন্য পোশাক বানাতে গিয়ে।

একজন পশ্চিমা নাগরিক যে পোশাক গায়ে চড়িয়েছেন, তা সেলাই হয়েছে বিপজ্জনক পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য হওয়া মানুষদের হাতে। এটা জেনে পশ্চিমা ক্রেতাদের অনেকে বিব্রত হন। তাঁদের এই অস্বস্তিকে আমি মূল্য দিই। খুবই স্বাভাবিক যে ধনী দেশের মানুষেরা বাংলাদেশ ও তার উৎপাদকদের চাপ দিয়ে দেশটার বিপজ্জনক কর্মপরিবেশের উন্নতি ঘটানোর উপায় খুঁজছেন।

কিন্তু কেউ কেউ যেমন বলছেন, তেমন করে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য কেনা বন্ধ করা সহানুভূতিশীল পদক্ষেপ হতে পারে না। প্রায় ৩০ লাখ নারী এই শিল্পে কাজ করেন। পোশাকশিল্প থেকে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক সুযোগ বাংলাদেশে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের সমাজের গভীরে প্রোথিত দারিদ্র্য দূর করায় আমি আমার জীবন নিয়োজিত করেছি এবং আমি জানি, বাংলাদেশ থেকে পণ্য নেয় এমন ব্র্যান্ড বর্জন করা মানে আহারবঞ্চিত মানুষদের আরও দারিদ্র্যের মধ্যেই নিক্ষিপ্ত করা। বিদেশি ব্র্যান্ডগুলো দিব্যি তখন অন্য দেশের সঙ্গে উৎপাদনের চুক্তি করে নেবে।

পোশাকশিল্পের উত্থানের সুফল বাংলাদেশে দৃশ্যমান। যেমন আগেকার কালে দরিদ্র পরিবারগুলো সদ্যোজাত মেয়েটিকে নিয়ে দেখত যে কত অল্প বয়সে তাকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করা যায়। কেননা, মেয়েদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যৌতুকের পরিমাণও বাড়ত। এমনকি গত শতকের আশির দশকে যৌতুক বেআইনি করা হলেও কার্যত তা প্রচলিত ছিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সেও মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। সেই মেয়েটি কখনো গ্রামের বাইরে বের হতে পারত না, নিজের বা নিজের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ তার অজানা ছিল।

অনেক নারী এবং তাঁদের কন্যাদের পোশাকশিল্পে কাজ করার সুবাদে– যেখানে শ্রমিকের অধিকার কার্যত অনুপস্থিত–গরিবি দশার পরিবারগুলো এখন স্বপ্নটা বদলে ফেলতে পারছে। অনেকেই পারছে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ঠিক করে ফেলতে। তারা ভাবতে পারছে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করার কথা, সঞ্চয়ের কথা, ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নতুন ব্যবসা চালু করার কথা। ভাবতে পারছে বসবাসের স্থানটাকে আরও পরিচ্ছন্ন রাখার ও প্রশস্ত করার কথা।

বাইরের অনেকের মনেই বাংলাদেশ নামটা শুনলে কেবল দুর্যোগের কথাই ভেসে ওঠে– কারখানার আগুন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও দারিদ্র্য। কিন্তু সত্যিকার বাংলাদেশ হলো সেই দেশ, যেখানে ক্ষুদ্রঋণের জন্ম হয়েছে, সিভিল সোসাইটি যেখানে জোরদার। জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক বেড়েছে এখানে: ১৯৯০ সালের তুলনায় মাতৃমৃত্যুর হার এখন ৪ ভাগের ১ ভাগ; ১৯৮০-এর তুলনায় শিশুমৃত্যুর হার এক-পঞ্চমাংশ। এ ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বেলায় নারী-পুরুষ বৈষম্যও আমরা দূর করতে পেরেছি।

সাভারের মতো ট্র্যাজেডি ঘটতেই থাকলে এই যুগান্তকারী অর্জনগুলো ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে। আইন ধনী ও গরিব, ভূমিহীন শ্রমিক ও কারখানা মালিক–সবার বেলাতেই সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হবে। নাজুক ও প্রান্তিক মানুষদের শোষণ করে যারা লাভবান হয়, তাদের হাতে মানুষের জীবন এতটা সস্তা হতে থাকা আমরা চলতে দিতে পারি না।

তাহলে সমাধান কী? পরিবর্তনটা সবার আগে বাংলাদেশের তরফেই আসতে হবে। যারা মানুষের জীবনকে সজ্ঞানে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে ফেলে, তাদের জবাবদিহির উপযুক্ত রাজনৈতিক সংকল্প অর্জন করতে হবে আমার দেশকেই। এর জন্য কারখানার মালিক; আমারটিসহ সিভিল সোসাইটির সংগঠনগুলো এবং পশ্চিমা ক্রেতাসহ বেসরকারি খাতের সমর্থন প্রয়োজন।

সমাধানের সূত্রপাত হতে হবে শ্রমিকদের ভেতর থেকেই। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে কোনো বাধা যেন নিয়োগদাতারা দিতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে তাঁরা দলবদ্ধভাবে দর-কষাকষি করতে পারেন এবং জীবনের নিরাপত্তা ও মানসম্মত মজুরি নিয়ে তাঁরা নিয়োগদাতাদের জবাবদিহির মুখে রাখতে পারেন। ব্যবসা-মালিক ও রাজনীতিবিদদের সংঘবদ্ধ চক্র এমনিতে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে, একমাত্র শ্রমিকদের সংগঠিত শক্তি দিয়েই তাদের মুখোমুখি দাঁড়ানো সম্ভব। মুশকিল হলো, অনেক সময় মালিক ও রাজনীতিক এক ও অভিন্ন।

কারখানার মালিককে চাপ দিয়ে দাম কমিয়ে নেওয়ার বদলে পশ্চিমা ক্রেতাদের উচিত আরও উন্নত নিরাপত্তা মান অর্জনে অর্থায়ন করা। শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা উন্নত করার খরচ এতই কম যে ক্রেতার কাছে পণ্যের দাম বাড়ানোর দোহাই এটা হতে পারে না। বিদেশের বাজারেও এই কথা জোরেশোরে প্রচার করা উচিত। যেসব ক্রেতা পোশাক কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশের হালচাল জেনে ক্ষুব্ধ হন, তাঁদেরও বুঝতে হবে, যেখানে শ্রমিকের জীবন বিপন্ন, সেখানে পোশাকের প্রাইস ট্যাগই ক্রয়ের একমাত্র মানদণ্ড নয়।

একই সঙ্গে মালিকদেরও কোনোভাবে ছাড় দেওয়া চলবে না। কেননা, তাঁদের উদাসীনতা অপরাধমূলক এবং কোনো অজুহাতেই এই অপরাধ ছাড় পেতে পারে না। কিন্তু তাঁদের যা করণীয়, তা তাঁরা নিজেরাই করে ফেলবেন এমনটি বিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই। যে দেশের রাজধানী এবং তার আশপাশেই এক লাখ কারখানা রয়েছে, যেখানে ৩০ লাখ শ্রমিক পোশাক কারখানায় কর্মরত, সেসব কারখানার কর্মপরিবেশ তদারক করায় যেখানে রয়েছেন মাত্র ১৮ জন কর্মচারী, সেখানে বিবেকবর্জিত মালিকদের তরফে মাত্রাছাড়া দায়িত্বহীনতা তো ঘটবেই। কারখানায় নজরদারির জন্য কর্মীসংখ্যা ব্যাপক মাত্রায় বাড়াতে হবে এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে।

চূড়ান্তভাবে, সরকারকেও শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রশ্ন উপেক্ষার ইতি টানতে হবে, বাড়াতে হবে আইনের বাস্তবায়ন। কিন্তু যতদিন রাজনীতিবিদ আর মালিকদের মধ্যে অশুভ আঁতাত টিকে থাকবে, ততদিন এই লক্ষ্য অর্জন খুবই কঠিন। এঁরা উভয়ে মিলে অপরাধমূলক দায়িত্বহীনতাকে ক্ষমা করে যাবেন; পরিণামে ঘটবে সাভারের মতো ঘটনা, যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক কারখানা নামক নড়বড়ে ভবনের ফাঁদে আটকা পড়বেন, যা একসময় ভেঙে পড়বে তাঁদেরই ওপর। এই সমস্যার সমাধান যতদিন না হচ্ছে, ততদিন নিহত শ্রমিকদের ভুলে যাওয়া চলবে না।

'মেইড ইন বাংলাদেশ' হওয়া উচিত গর্বের প্রতীক, লজ্জার নয়। বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি এই লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে কাজ করায় প্রস্তুত হয়ে আছে। আমাদের রাষ্ট্রের জন্মের শৈশবকালে সত্তরের দশকে, স্বাধীনতাসংগ্রামের শক্তিতে শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বাংলাদেশ ভরপুর ছিল। এই শক্তি থেকে জন্মানো ক্ষুদ্রঋণ, কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা এবং

অন্যান্য সামাজিক উদ্ভাবনগুলো বস্ত্র খাতের মতো রপ্তানিমুখী শিল্প থেকে সৃষ্টি হওয়া সুযোগের সঙ্গে মিলে কোটি কোটি দরিদ্র জনসাধারণের, বিশেষত নারীদের জীবন বদলে দিয়েছিল।

আজ আমি আমার দেশবাসীর সঙ্গে দুঃখভারাক্রান্ত, কিন্তু একই সঙ্গে আমি সরব হয়ে বলছি, এভাবে আর চলতে পারে না। অপূরণীয় ক্ষতিতে শোকতপ্ত হওয়ার পাশাপাশি, আসুন আমরা আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পুনরুজ্জীবিত হই।

নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত, ইংরেজি থেকে অনূদিত

স্যার ফজলে হাসান আবেদ: *প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, ব্র্যাক*

সূত্র: প্রথম আলো, ০১ মে ২০১৩

উপলক্ষটি আত্মোপলব্ধি ও আত্মসমালোচনার

সৈয়দ আবুল মকসুদ

সাভারে ভবনধস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রে যাঁদের কথার মূল্য আছে, তাঁরা বলেছেন, বহুতল ভবনটি নির্মাণে নিম্নমানের রড, সিমেন্ট, বালু প্রভৃতি ব্যবহারের কারণে এই ক্ষতি হয়েছে। বক্তব্যটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। আমার অল্প বিদ্যাবুদ্ধিতে যা বুঝি, তা হলো নিম্নমানের রড-বালু-সিমেন্টের চেয়ে নিম্নমানের চিন্তা একটি জাতি ও দেশের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর।

সাভারে ভবনধসের মতো ঘটনা, আমি দুর্ঘটনা বলতে চাই না, বাঙালির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। যদিও এর চেয়ে বেশি মানুষ বাংলাদেশে অতীতে এক ঘণ্টায় নিহত হয়েছেন, তেমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটার পর থেকেই স্থানীয় মানুষ বিশেষ করে, যুব সম্প্রদায় দুর্গত মানুষকে উদ্ধারে যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তার তুলনাও খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ফায়ার সার্ভিস, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি প্রভৃতির সদস্যের সঙ্গে তাঁরা দিন-রাত উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ তাঁদেও ডেকে আনেনি, নিয়োগ দেয়নি অর্থের বিনিময়ে। তাঁরা স্বনিয়োজিত। নিয়োগ যদি তাঁদের কেউ দিয়েই থাকে তা তাঁদের বিবেক। যে বিবেক বাংলাদেশের অধিপতি শ্রেণীর অনেকের মধ্যে লেশমাত্র নেই। বৈশাখের তীব্র গুমোট, কাঠফাটা রোদ। তার মধ্যেই সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে মৃতদেহ ও জীবন্মৃত মানুষকে উদ্ধারের কাজ করছেন, তা ঘরের মধ্যে বসে টেলিভিশনে দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করছি। তাঁদের প্রশিক্ষণ তো নয়ই, অভিজ্ঞতাও নেই ত্রাণকাজের। কিন্তু আছে মনুষ্যত্ববোধ ও মানুষের জন্য অশেষ দরদ; আর আছে কর্তব্যবোধ। এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শত শত চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যে ভূমিকা দেখলাম, তার জন্য তাঁদের জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

দেশ-বিদেশের কোটি কোটি উদ্বিগ্ন মানুষকে সর্বশেষ পরিস্থিতি অবগত করার কাজটি করেছেন সাংবাদিকেরা। সংবাদকর্মীদের দুর্ভাগ্য এই যে দুরূহতর কাজটি করেও তাঁদের কপালে ধন্যবাদ মেলে না। টিভি চ্যানেলের প্রতিবেদক ও ক্যামেরায় যাঁরা কয়েকটি দিন বিরামহীন কাজ করেছেন, তাঁদের কষ্টের বিষয়টি ঘরের মধ্যে বসে বোঝা সম্ভব নয়। অকল্পনীয় হৃদয়বিদারক ও বীভৎস দৃশ্য তাঁরা নিজেরা অতি কাছে থেকে দেখেছেন। হাত-পা বিচ্ছিন্ন মানুষ, বিমের চাপায় চ্যাপ্টা মৃতদেহ, অন্ধকূপে সেলাই মেশিনের নিচে চাপা পড়া মানুষের আর্ত-আকুতি, এক ফোঁটা পানি ও অক্সিজেনের জন্য তাঁদের নিস্তেজ কণ্ঠস্বর, তাঁরা নিজের চোখে দেখেছেন ও নিজের কানে শুনেছেন। তারপরও যে তাঁরা সুস্থ থাকতে পেরেছেন, সে জন্য তাঁদের মানসিক শক্তির প্রশংসা না করা খুবই ক্ষুদ্রতা।

ভবনধসের সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যেসব তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে এগিয়ে আসেন, তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। যাঁরা পানির বোতল, অন্যান্য পানীয় ও শুকনো খাবার প্রভৃতি সরবরাহ করেছেন, তাঁদের কর্তব্যবোধ অতি প্রশংসার যোগ্য।

আমাদের সব সরকারেরই দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতার শেষ নেই। তা নিয়ে আমরা সমালোচনা করতে কার্পণ্য করি না। অন্যদিকে বাঙালিদের একটি গোত্র সরকারের খোশামুদি করে অপার আনন্দ পায়। আর একটি শ্রেণী যেকোনো ব্যাপারে সরকারকে তুলাধোনা করে পরম তৃপ্তি পায়। পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ হলো সমালোচনা করা। ভবনধসের পর থেকে সরকার যে ব্যবস্থা নেয়, তাতে বড় ত্রুটি ছিল না।

নয়তলা ভবনের ধ্বংসস্তুপ থেকে পাঁচ দিনে শ চারেক মৃতদেহ এবং আড়াই হাজার আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করা অত্যন্ত বড় কাজ। ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‍্যাব, পুলিশের সদস্য এবং অন্য স্বেচ্ছাসেবী

উদ্ধারকর্মীদের যদি আমরা ধন্যবাদ না জানাই, তা হবে খুব নিম্নমানের দীনতা। গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন না, কাছে থেকে না দেখেছেন, শুধু টিভি পর্দায় দেখে তাঁদের পক্ষে আংশিকও উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দেয়াল ও সেলাই মেশিনের নিচে চাপা পড়া গলিত লাশ ও জীবিত মানুষ। তাঁদের টানাটানি ভয়াবহ কাজ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তেমন একজন সরকারপ্রধান, যাঁর সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলা যায়। বিভিন্ন সময় জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে খোলামেলাভাবে মতবিনিময় করা যায়। যদি তাঁর কোনো ব্যাপারে দ্বিমত থাকে, সেটাও তিনি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেন, রেখে-ঢেকে বলেন না। তাঁকে কোনো যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ দিলে তিনি তা শোনেন ও বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। তবে স্তাবক ও সুবিধাভোগীরা তাঁর সেই উদারতার সুযোগ নিতেও কার্পণ্য করেন না।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে ভবনধসের প্রসঙ্গ নিয়ে আমার মতো অভাজনের সঙ্গেও অনেকক্ষণ কথা বলেছেন। দুর্ঘটনার সংবাদ শোনার পর থেকে সরকার সাধ্যমতো যত ব্যবস্থা নিয়েছে, বিশেষ করে, আটকে পড়াদের জীবিত উদ্ধারের ব্যাপারে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েও উদ্ধারকাজে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি দৃষ্টি রেখেছেন শুনে অবাক হয়েছি। তা তিনি করেছেন শুধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে, তাতে সন্দেহ নেই। যেসব শ্রমিক দৈবক্রমে বেঁচে গেছেন, তাঁদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যাপারেও তাঁর উদ্বেগ লক্ষ করেছি।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছে, ভবনধসে প্রাণহানি ও এত শ্রমিকের আহত হওয়ায় তিনি মর্মাহত। অন্য সময় তাঁকে যতটা প্রাণবন্ত দেখি, রোববার তা দেখিনি। তাঁকে দেখেছি অনেকটা বিমর্ষ। সম্ভবত দেশের পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি চিন্তিত। আগে থেকেই বিরূপতা ছিল, এবার বিদেশি আমদানিকারকেরা হয়তো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সে আভাস আন্তর্জাতিক মিডিয়া থেকে জানা গেছে। তাতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পড়বে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব।

উদ্ধারকাজে সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেও বলা যায়, হাজার হাজার মানুষের জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন যেখানে, সেখানে বাইরে থেকেও সাহায্য নেওয়া উচিত ছিল। ভারত, থাইল্যান্ড, চীন ও জাপানের সহায়তা চাওয়া যেত। বিশেষ করে, ভারতের ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সের সহায়তা হতো সবচেয়ে কার্যকর। তা হলে হয়তো আরও কয়েক শ মানুষের জীবন বাঁচত।

যাঁরা চলে গেছেন, মৃত্যুর আগে কেমন ছিল তাঁদের অনুভূতি, পৃথিবী সম্পর্কে কেমন ধারণা নিয়ে তাঁরা চলে গেছেন, তা আমরা কোনো দিনই জানতে পারব না। কিন্তু যাঁরা মরণসাগরের কিনারা থেকে ফিরে এসেছেন, সেসব মানুষের অবস্থা দেখার দুর্ভাগ্য আমাদের হচ্ছে। ভবনধস হলে তার ছাদ ও দেয়ালচাপায় আহত ব্যক্তিদের জখম কত রকম হতে পারে, তা রানা প্লাজার আহত ব্যক্তিদের না দেখলে অনুমান করাও সম্ভব নয়। ঢাকা মেডিকেলের ২০৬ নম্বর মহিলা ওয়ার্ডে চিকিৎস-াধীন ময়মনসিংহের রোজিনা, রংপুরের মমতা, খুলনার শিরিনা, যশোরের ফেলী, রাজবাড়ীর ঝর্ণা ও অন্যরা কাতরাচ্ছেন। পৃথিবী যে কত নিষ্ঠুর, তা তাঁদের চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। নিজেদের যে শারীরিক যন্ত্রণা, তা অনেকেই ভুলে গেছেন। কারণ, তাঁদের কেউ হারিয়েছেন মাকে, কেউ আদরের ছোট বোনটিকে মরতে দেখেছেন, কেউবা মেয়েকে।

পুরুষদের ১০১ এবং পাশের ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের রোগীদের অনেকেরই জখমের সঙ্গে কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে পানিশূন্যতা ও রক্তক্ষরণে। হেমোডায়ালেসিসসহ যথাযথ চিকিৎসা চলছে। সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসক, মেডিকেলের ছাত্রছাত্রী ও সেবিকারা সার্বক্ষণিক নজর রাখছেন আহত ব্যক্তিদের প্রতি। শুধু পেশাদারি থেকে বা চাকরির কারণে নয়, মানবিক দরদ থেকেও।

সব পেশার মানুষের মধ্যেই ভালোত্ব রয়েছে। অতি অল্পসংখ্যক দলীয় কর্মকর্তার আচরণে পুলিশের প্রতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নেতিবাচক মনোভাব। অথচ পুলিশ প্রতিদিন মানুষকে সাহায্য করছে। ঘটনার দিন বিএনপির হরতাল ছিল। আমি কোনোভাবে সাভার যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। দু-একটা বাস ও বেবিট্যাক্সি চলছিল। আমি যাব, এ কথা শুনে বঙ্গবন্ধু

ভবনের কাছে ডিউটিতে থাকা পুলিশের কয়েকজন সদস্য বললেন, এ পরিস্থিতিতে যেতে পারবেন না, তবে যদি যেতেই চান স্যার, তাহলে আপনাকে আমরা শ্যামলী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি। হাসপাতালে আমি আহত ব্যক্তিদের দেখতে যাব, গাড়ি দরকার, বলামাত্র ঢাকার পুলিশ কমিশনার বেনজীর আহমেদ পুলিশসহ আমাকে গাড়ি দেন। আমরা কারও উপকারের কথা স্বীকার করি না বলে আজকাল কেউ কারও উপকার করতে উৎসাহ পান না।

অবশ্য ভবনধসের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'স্তম্ভ নাড়াচাড়া'র কথায় সরকারের খুব ক্ষতি হয়েছে। নির্বাচনের বছর। আওয়ামী লীগেরই হয়েছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি। দেড় বছর হরতাল দিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করে বিএনপি-জামায়াত যেটুকু লাভবান হয়েছে, তার চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে ওই বক্তব্যে। জনগণ মনে করছে, সরকার যেকোনো ব্যাপারে বিএনপি-জামায়াত-শিবিরকে অযৌক্তিকভাবে দোষারোপ করে।

ভবনধসের মূল কারণ নিম্নমানের সিমেন্ট, রড, বালু নয়–নষ্ট রাজনীতি। কীর্তিমান সোহেল রানার বর্ণাঢ্য জীবনের ইতিহাস যদি আমরা পাঠ করি, তাহলে আর কোনো কিছু জানার দরকার হয় না। সংবাদপত্রে সামান্য লেখা হয়েছে। 'অষ্টম শ্রেণী পাস কিশোর রানার সঙ্গে ১৯৯৪ সালে পরিচয় হয় সাভার কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি হেলালের গাড়িচালক জাকিরের। জাকিরের সহায়তায় সন্ত্রাসী কাজে জড়িয়ে পড়েন রানা। পরে রানার বড় বোন সুফিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় জাকিরের। ২০০৬ সালে জাকির র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হন। এতে রানার হাত রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। সুফিয়ার দ্বিতীয় বিয়ে হয় র‍্যাবের এক কর্মকর্তার সঙ্গে। রানার মালিকানাধীন দুটি দোকান র‍্যাবের এক কর্মকর্তাকে উপহার দেওয়া হয়। হেলালের সৌজন্যে রানার উত্থান হলেও তাঁর মালিকানাধীন চৌধুরী এন্টারপ্রাইজের অফিস দখল করেন রানা। সেখানে আটতলা 'রানা টাওয়ার' নির্মাণ করা হয়। ২০০৮ সালে গুম হন হেলাল। এর সঙ্গে রানার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগে যোগ দেন রানা। ১৯৯৮ সালে সাভার পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন তিনি। গত জানুয়ারিতে পৌর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক হন।' [সমকাল, ২৮ এপ্রিল]

তাঁর জীবনালেখ্য থেকে আরও জানা যায়, '১৯৯৬ সালে ছাত্রলীগের নেতা থাকার সময় থেকেই জমির ব্যবসা শুরু করেন রানা। শুরু হয় রানার উত্থান। ২০০৩ সালে গ্রেপ্তার হন তিনি। তাঁর বাবা আবদুল খালেক ওরফে কলু খালেক বিএনপিতে যোগ দিলে ১২ দিন পর জামিনে মুক্তি পান রানা। কলু খালেক গত ডিসেম্বরে আবার আওয়ামী লীগে যোগ দেন। বাবার বিএনপিতে যোগ দেওয়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে তখনকার ছাত্রলীগ নেতা রানা বাসস্ট্যান্ড-সংলগ্ন রবীন্দ্র সাহার ২৬ শতাংশ ডোবা জমি দখল করেন। এর সামনেই রানার বাবার ক্রয়সূত্রে আরও ২৬ শতাংশ জমি ছিল। বাবার জমি ও দখল করা জমিতে ২০০৬ সালে 'রানা প্লাজা' নির্মাণ করা হয়। ২০১০ সালে পৌরসভার অনুমোদনে ভবনটিকে পাঁচতলা থেকে নয়তলায় উন্নীত করা হয়।' [ঐ]

রানার কর্মময় জীবনকাহিনি যদি কেউ লেখেন তা ১০ খণ্ডেও কুলাবে না। আওয়ামী লীগ একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন। কিন্তু দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির কারণে সেই দলের কত নেতা যে দুর্বল হিন্দুদের বাড়িঘর জোতজমি জবরদখল করেছেন–তার একটি দৃষ্টান্ত রানা। আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি নস্যাৎ করে দিয়েছেন এই নব্য ধনী যুবনেতা। টিভিতে দেখলাম, অসহায় রবীন্দ্রনাথের ভীতসন্ত্রস্ত মুখ। তিনি টিভি প্রতিবেদককে বলছেন, 'আপনারা তো চইল্যা যাইবেন, আমার নিরাপত্তা কেরা দিব।' তিনি রানাকে ভালো চেনেন। এই সমাজকেও চেনেন। আরও ভালো চেনেন রাষ্ট্রকে। তিনি জানেন, রানা বেরিয়ে আসবেন। রবীন্দ্র বাবুর স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি কে দেবে? তাঁর অবস্থা যদি আমরা বিবেচনায় না রাখি, তাহলে ভবনধসের মর্ম উপলব্ধি করতে পারব না।

সাভারের ঘটনার পর মনে করেছিলাম, এই ঘটনা সমগ্র জাতির চৈতন্যে গভীর প্রভাব ফেলবে। রাজনীতিকেরা উপলব্ধি করবেন, নষ্ট রাজনীতির ফলাফল শেষ পর্যন্ত শুভ হয় না। পোশাকশিল্পের নেতারা ভেবে দেখবেন শুধু মুনাফা অর্জনই বড় ব্যাপার নয়, শ্রমিকের জীবনেরও একটি মূল্য আছে। খুবই তাৎপর্যের বিষয়, গত ১০-১৫ বছরে পোশাকশিল্পে যত অগ্নিকাণ্ড হয়েছে বা ভবনধস, তাতে শুধু শ্রমিকেরাই নিহত হয়েছেন। কারখানার চেয়ারম্যান, পরিচালক, এমডি, ম্যানেজার মারা যাননি। কারখানায় কি শুধু শ্রমিকেরাই থাকেন, নাকি মালিক-কর্মকর্তারাও?

বিবিসি সংলাপে বিজিএমইএর সভাপতি বলেছেন, ভবনধসের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যম দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। তাঁর ভাষায়, 'মিডিয়া তার দায়িত্ব পালন করেছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা বারবার এসব দেখাচ্ছি। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।' সংবাদ গোপন করলেই কি দেশের ভাবমূর্তি বাড়ত?

কষ্ট হয় একটি কথা ভেবে যে বিজিএমইএর নেতারা জানেন না, পোশাকশিল্পের মালিকদের দেশের মানুষ খুবই মর্যাদা দেয়। যাঁদের কারখানার মানসম্মত ভবন রয়েছে, যাঁরা সময়মতো বেতন পরিশোধ করেন, তাঁদের সম্পর্কে মানুষের বা মিডিয়ার কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ শুধু তাঁদের বিরুদ্ধে, যাঁরা নষ্ট। যাঁরা নিয়মিত বেতন দেন না। যাঁরা শ্রমিকদের মনে করেন দাসদাসী। যাঁরা শ্রমিকদের পুড়িয়ে মারেন। দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করলে তারাই করেন, মিডিয়া নয়।

ধারণা করেছিলাম, সাভার ঘটনার পর পোশাকশিল্পের নেতারা গলার সুর নরম করবেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁদের ঝাঁজ আরও বেড়েছে। কণ্ঠ আরও উঁচু। তাঁদের ভবিষ্যতে বড় বিপদে পড়ার আগে আত্মসমালোচনা ও আত্মোপলব্ধি প্রয়োজন রয়েছে।

মুসলিমবিরোধী রাজনীতির কারণে যেমন বিধ্বস্ত হয় টুইন টাওয়ার, আমাদের নষ্ট রাজনীতির কারণেই ধসে পড়েছে রানা প্লাজা। পি ভি নরসীমা রাও তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, 'বাবরি মসজিদ তো ধ্বংস নয়, ওরা ধ্বংস করেছে আমাকেই।' আমার ধারণা, রানা প্লাজা শুধু নয়, সেই সঙ্গে বিধ্বস্ত হয়েছে মহাজোট সরকার।

সৈয়দ আবুল মকসুদ: *গবেষক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক*

সূত্র : প্রথম আলো, ৩০ এপ্রিল ২০১৩

আরেকটি ‘গার্মেন্টস হত্যাকাণ্ড’ এবং লুটেরা বুর্জোয়ার স্বার্থ

হায়দার আকবর খান রনো

গার্মেন্টস শিল্পে একের পর এক দুর্ঘটনা। শত শত প্রাণহরণ। মাত্র কয়েক মাস আগেই তাজরীন ফ্যাশনসে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শতপ্রাণ ঝরে যাওয়ার পর গোটা দেশ শোকে বিহ্বল হয়েছে। তাতে কী? আবারও মৃত্যুর মিছিলে গার্মেন্টস শ্রমিক। কাল সকালে সাভারের রানা প্লাজা নামের একটি ভাঙনোন্মুখ ভবনে অবস্থিত গার্মেন্টসে ঘটে যাওয়া বীভৎস ‘হত্যাকাণ্ডের’ পর আমি বাকরুদ্ধ। এ কোন দেশে বাস করছি আমরা!

কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটছে এ সম্পর্কে আমি বলব, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মালিকরাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। কিন্তু তাদের বিচার হচ্ছে না, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে না তাদের। ফলে ওদের সাহস বেড়ে যাচ্ছে, আস্কারা পাচ্ছে ওরা। অবৈধভাবে ভবন নির্মাণ, সেখানে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা না রাখা, একটিমাত্র গেট রাখা বা অন্যান্য গেট বন্ধ রাখা, কারখানার নিচে গেটের কাছে দাহ্যবস্তু রাখা ইত্যাদি কাজ তো ওরা করছেই। ফলে আগুন লাগা বা দুর্ঘটনা ঘটা খুবই স্বাভাবিক, এবং সেক্ষেত্রে শ্রমিকদের মৃত্যুর মিছিলটাও দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

সাম্প্রতিকের প্রায় প্রতিটি গার্মেন্টসে আগুন লাগা বা দুর্ঘটনা ঘটার পর যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় তা হল শ্রমিকদের নির্গমনের পথগুলো বন্ধ করে রাখা। প্রতিটি দুর্ঘটনার পরই ‘পাশবিক’ এ কাজটি নিয়ে আমরা অনেকদিন আলোচনা-সমালাচনা করি অনেক দিন। তারপর সেই একইভাবে আবার আরেকটি গার্মেন্টসে আগুন লাগে বা অন্য কোনো ঘটনা ঘটে- এই কাল যেমন ভবন ধসে পড়ল- আবার শ্রমিকের মৃত্যু- ছোট ছোট পিঁপড়ার প্রাণের মতোই যেন এ সমাজে ওরা মূল্যহীন।

গত নভেম্বরে তাজরীন ফ্যাশনসের আগুনে ১১২ জন শ্রমিকের লাশের মিছিল আমরা দেখলাম- যদিও মৃতদের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হবে- কিন্তু সেই হত্যাকাণ্ডের জন্যই বা আমরা কাকে দায়ী করেছি? তাজরীনের মালিক এ ঘটনার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী ছিল। তাকে কি বিচারের মুখোমুখি করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

ওই মালিক দায়ী মূলত তিনটি কারণে। প্রথমত, ওখানে ভবনটি নির্মিত হয়েছিল অবৈধভাবে। দ্বিতীয়ত, ভবনটিতে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করলেও মালিকপক্ষ আগুন নেভানোর কোনো ব্যবস্থা রাখেনি বা রাখলেও সেগুলো তখন ব্যবহারের অনুপযোগী ছিল। তৃতীয়ত, সেই একই পুরনো পাশবিক পদ্ধতিতে আগুন লাগার পর শ্রমিকদের বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেওয়া। এর ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়েছে।

এ সব কিছুর দায় কিন্তু মালিককেই নিতে হবে। কারখানার সুপারভাইজার বা অন্যরা গেট বন্ধ করে দেওয়ার কাজটি করলেও এর জন্য মূল দায় মালিকের। পাশাপাশি দায়ী ওই কর্মচারী বা কর্মকর্তারাও। আমরা কি এদের কাউকে গ্রেপ্তার বা বিচারের মুখোমুখি হতে দেখেছি?

২৪ এপ্রিলের রানা প্লাজার দুর্ঘটনাটি আগুন লাগা নয়, ভবন ধসে পড়া। এখানে পুরো বিষয়টা এখনও জানা যায়নি। কিন্তু নিশ্চিতভাবে এখানেও অসংখ্য অনিয়ম রয়েছে। ভবন নির্মাণে অনিয়ম তো থাকতেই পারে, পাশাপাশি ভবন ভেঙে পড়ার আশঙ্কার মধ্যে শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করানোর মতো বিষয়-আশয় রয়েছে। এভাবে বারবার মৃত্যুকূপের মধ্যে শ্রমিকদের ঠেলে দেওয়ার পর এই একুশ শতকেও মালিকরা পার পেয়ে যাচ্ছে, কোনো দায় ছাড়া। ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য

অপরাধ করছে ওরা। এত বড় মাপের 'হত্যাকাণ্ড' ঘটিয়েও ওরা রক্ষা পাচ্ছে প্রশাসন ও রাজনীতিবিদদের আনুকূল্যে।

তাজরীনের অগ্নিকাণ্ডের পর শ্রমিক সংগঠনগুলো অনেক বড় বড় সমাবেশ করেছে। কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মালিকসহ দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু সরকার কিছুই করতে পারে নি বা করে নি। মালিকের টিকিটি ছোঁয়া যায় নি। এভাবে মানুষ মেরে এবং আইন ভঙ্গ করে ওরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে মালিকদের দুটি সংগঠন আছে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ। এসব সংগঠন এ ধরনের যেকোনো দুর্ঘটনার পর মালিককে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। ওরা এটা করবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ এ সব মালিক তো ওদের সংগঠনের সদস্য। তাজরীনের মালিককে দেখেছিলাম টেলিভিশনে বিভিন্ন টক শো'তে এসে বড় বড় কথা বলে গেছে। দুর্ঘটনার সব দায় চাপিয়ে গেছে ওই শ্রমিকদের ওপর, যারা অসহায়ভাবে ওইদিন 'খুন' হয়েছিল অথবা কোনোরকমে প্রাণে বেঁচেছিল।

বলবেই বা না কেন, তার পক্ষে তো আছে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র। কারণ তার ওইসব সংগঠন বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ ছাড়াও সরকার তাদের পক্ষে কাজ করে। মালিকদের বাঁচায় সরকার, শ্রমিককে নয়। শ্রমিকের প্রাণের দাম এখানে তুচ্ছ। মাত্র কয়েক লাখ টাকায় এখানে প্রাণহরণের দায় শোধ হয়। 'খুনি' শাস্তি পায় না। ফলে নতুন নতুন খুনি তৈরি হয়। অন্য খুনিরা সাহস পায়।

গার্মেন্টস শিল্পে সুস্থিরতা আনতে হলে একে মৃত্যুকূপ বানানোর এই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। এখানে নানা বৈষম্য ও নিপীড়নের মধ্যে শ্রমিকরা কাজ করেন। আট ঘণ্টা শ্রমঘণ্টার বদলে ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় তাদের। বেতন-ভাতা তো এখনও অপ্রতুল। অনেক জায়গায়ই মজুরি কাঠামো মানা হয় না। বেতনভাতা অনেক জায়গায় অনিয়মিতও বটে। কখনও কখনও অন্যায়ভাবে কর্মচ্যুত হয় শ্রমিকরা। অন্যান্য অধিকার তো উপেক্ষিত হয়ই। অধিকার নেই ট্রেড ইউনিয়ন করার। যার ফলে ন্যায়সঙ্গত ও পদ্ধতিগত উপায়ে দাবি-দাওয়া আদায়ের কোনো সুযোগই নেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের। আমাদের দেশে শ্রমিক শোষণের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা আর নেই।

এমন অবস্থায় গার্মেন্টস শিল্পে কাজ করে আমাদের লাখ লাখ শ্রমিক জাতীয় অর্থনীতির জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন। সেক্ষেত্রে তাদের কর্মপরিবেশটিও যদি উন্নত না হয় বা সেখানে অন্তত বিপদের আশঙ্কামুক্ত হয়ে তারা কাজ করতে পারবেন এমন সুযোগটিও থাকবে না এটা তো দীর্ঘদিন ধরে মেনে নেয়া যায় না। এই রাষ্ট্র শ্রমিকদের সব ধরনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গার্মেন্টস শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ ও এ শিল্পের স্থিরতা আশা করতে পারে না। এখন যদি আমরা সবাই সচেতন না হই, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কাজ করতে না পারি তবে আশার আলো দেখা যাবে না। এভাবে চলতে চলতে একদিন এ শিল্প তার সঞ্জিবনী শক্তি হারিয়ে মৃত শিল্পে পরিণত হবে।

আমাদের এখানে বুর্জোয়ারা হচ্ছে লুটেরা বুর্জোয়া। তারা তাৎক্ষণিক লাভকে বড় করে দেখে। ফলে শিল্পের স্বার্থের কথা তারা ভাবে না। যদি ভাবত তাহলে শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষা করার দিকে মনোযোগ দিত। লুটেরা বুর্জোয়াদের পক্ষে এটা সম্ভবই নয়। সত্যিকারের শিল্প বুর্জোয়া শ্রেণি যেটির বিকাশ ঘটেছে পশ্চিমে, এর ফলে সেখানে শিল্পায়ন হয়েছে এবং শ্রমিক তার ন্যূনতম অধিকারগুলো পাচ্ছে। আমাদের দেশে এমনটি হলে কারখানায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত হয়ে শিল্পের উত্তরোত্তর বিকাশ হত।

আরেকটি বিষয় উদ্বেগজনক। গত কয়েক দশকে গার্মেন্টসে দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় বাইরের বিশ্বে আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প বাজার হারাচ্ছে। ক্রেতারা নানা অভিযোগ তুলছে। এ সব দুর্ঘটনা বন্ধ করতে বলছে তারা, বলছে গার্মেন্টসে কর্মপরিবেশ উন্নত করতে। বিষয়টি নিয়ে আমরা না ভাবলে শিগগির এ শিল্পটি বাইরের বিশ্বে বাজার হারাবে।

আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে আজ যে সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে তার বড় কারণ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে না দেওয়া। এটা মৌলিক অধিকার। আমাদের সংবিধানেও এর স্বীকৃতি আছে। শ্রমিকরা যদি আজ ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারত তবে তারা শ্রম আইন মানার ব্যাপারে মালিকদের বাধ্য করতে পারত। সংগঠিত ও যথাযথ পদ্ধতিতে মালিকপক্ষের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে পারত। শ্রম আইনে আছে মালিকরা শ্রমিককে আট ঘণ্টার বেশি খাটাতে পারবে না। আর যদি

খাটাতেও চায় তবে কয়েকটি শর্ত মেনে নিতে হবে। যেমন শ্রমিকের পূর্ণ ও স্বাধীন সম্মতিক্রমে এবং তাকে দ্বিগুণ বেতন দিয়ে তার কাছ থেকে বাড়তি শ্রম নেওয়া যাবে।

আজকে শ্রমিক সংগঠন আইনসিদ্ধভাবে প্রতিটি গার্মেন্টসে কাজ করতে পারলে যে সব জায়গায় আগুন লাগছে সে সব জায়গায় আগুন লাগত না। কারণ শ্রমিক সংগঠন সেখানে সজাগ থাকত। তারা আগুন নেভানোর যথাযথ ব্যবস্থা রেখে দিতে মালিক ও কারখানা প্রশাসনকে বাধ্য করত। আবার যে ভবনে দুর্ঘটনা হচ্ছে সে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত হলেই শ্রমিকরা ওখানে কাজ না করানোর জন্য মালিকদের চাপ দিত। এগুলো তো নেতিবাচক কিছু নয়। তাতে গার্মেন্টস শিল্প এভাবে মৃত্যুকূপ হয়ে উঠে বাইরের বিশ্বের বাজার নষ্ট করত না।

সমস্যা হচ্ছে আমাদের সরকারগুলো শ্রমিক-বান্ধব সরকার নয়, এরা মালিক-বান্ধব। কারণ সরকারে যারাই থাকেন তারাই চলেন গার্মেন্টসের টাকায়। সংসদ সদস্যদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ গার্মেন্টসের মালিক। ফলে মালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার প্রতিটি গার্মেন্টসে র‍্যাব ও পুলিশের সহযোগিতায় শ্রমিকদের দমনের কৌশল গ্রহণ করে রেখেছেন।

এর আলটিমেট ফলাফল এই সব 'খুনোখুনি' এবং নৈরাজ্য। আজ যখন এ শিল্পের কোনো প্রতিষ্ঠানে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে, অনেক মানুষ 'খুন' হবেন, মালিককে বিচারের মুখোমুখি করা তো দূরের কথা, তাকে সমাজে সদম্ভে বিচরণের সুযোগ করে দেওয়া হবে- তখন শ্রমিকদের মধ্যে দানা বাঁধা ক্ষোভ একভাবে না একভাবে প্রকাশিত হবেই। সেটি তো খুব একটা সুখকর হবে না। তখন আবার তারাই বলবেন যে শিল্পে অস্থিরতা তৈরি করা হচ্ছে। এখন কথা হল, শ্রমিকও তো বলতে পারেন যে, মালিকদের ওই সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক, কারণ ওরা শ্রমিক-স্বার্থ ক্ষুণ্ন করছে, তাহলে কী হবে? আমার প্রাপ্য অধিকার, সংবিধানসম্মত অধিকার আমাকে না দেওয়ার তুমি কে?

শ্রমিকের মৌলিক অধিকার ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগ দিতে এরা খুব ভয় পান। ভয় পান সরকার ও পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র। তারা মনে করেন ট্রেড ইউনিয়ন করলে শ্রমিক যদি ন্যায্যটা আদায় করে নেন তাতে মালিকের লাভ কমে যাবে। শ্রমিককে এক সর্বগ্রাসী শোষণের মাধ্যমে মালিকদের লাভের অংক বড় করে তোলা আর শেষে অসহায় নির্মম মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া এটাই যেন এখন আমাদের তৈরি পোশাক খাতের বাস্তব চিত্র। ইতিহাসের কাছে এর দায় কি শোধ করতে হবে না?

আমাদের যে সব রাজনৈতিক দল আছে তার বেশিরভাগই ওই লুটেরা বুর্জোয়া ও ধনীক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের স্বার্থরক্ষা করে। ফলে সরকার পরিবর্তন হলে যে শ্রমিকদের ভাগ্যের উন্নয়ন হবে তা নয়। বরং সেই একই চক্রে ঘুরপাক খাবেন শ্রমিক। শ্রমিক-বিদ্বেষী, জন-বিদ্বেষী এ সব সরকারের কাছে শ্রমিকদের জীবনের দাম খুবই অল্প।

আমাদের দেশে সত্যিকারের শিল্প বুর্জোয়া শ্রেণি গড়ে না উঠলে অথবা সত্যিকারের জনগণের দল সরকার গঠন করতে না পারলে গার্মেন্টসে এমন 'হত্যাকাণ্ড' চলতেই থাকবে।

হায়দার আকবর খান রনো: *সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি*

সূত্র: bdnews24.com, ২৫ এপ্রিল ২০১৩

পোশাক শ্রমিকদের জীবন এত মূল্যহীন নয়

হামিদা হোসেন

স্বজন হারাদের এই কান্না থামবে কি?

সাভারের রানা প্লাজা ধসে সহস্রাধিক শ্রমিকের মৃত্যু এবং দুই হাজারের বেশি শ্রমিকের আহত হওয়ার ঘটনা কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি করপোরেট অপরাধ, এই অপরাধের কারণ করপোরেট লোভ আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। এ রকম ঘটনা যে এবারই প্রথম ঘটল, তা-ও নয়। ১৯৯০ সালে সারাকা গার্মেন্টসের অগ্নিকাণ্ডে ১৭ জন নারীসহ ৩২ জন গার্মেন্টস শ্রমিকের মৃত্যুর পর থেকে এমন অনেক ঘটনাই ঘটেছে, যেসবের জন্য শিল্প খাত ও রাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতা ও অবহেলা দায়ী।

অতি নিম্ন মজুরিতে শ্রম দিয়ে যাঁরা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতকে লাভজনক করেছেন, সেই শ্রমিকদের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমরা যখন শোক করছি, তখন প্রশ্ন তোলা জরুরি যে রাষ্ট্র কেন বারবার এই ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করেছে, কেন রাষ্ট্রের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা পোশাকশিল্পের ব্যবস্থাগত ব্যর্থতাগুলোর ওপর নজরদারি করতে ব্যর্থ হয়েছে, কেন এই খাতের করপোরেট অপরাধগুলোকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে শাস্তির ঊর্ধ্বে রাখা হয়েছে।

আজ আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে, যে পোশাকশিল্প মালিকদের কোটি কোটি টাকার মুনাফা এনে দিয়েছে এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বড় করেছে, সেই শিল্পের শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকে কেন এত কম দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে শ্রমিকদের জীবন যখন ঝুঁকির সম্মুখীন, তখনো কেন তাঁদের সম্মিলিতভাবে দাবি আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয় না। আমাদের ভুলে যাওয়া চলবে না যে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা আমাদের দেশ থেকে তৈরি পোশাক কেনার সময় অর্থ-সাশ্রয় করতে চাইলে তার ফলে এই দেশের শ্রমিকেরা শোষিত হন, তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়গুলো উপেক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পকে কীভাবে আইনি বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে চলতে বাধ্য করা যায়? ২৫ এপ্রিল হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে রুল জারি করেছেন, তার ফলে এই শিল্পের ব্যবস্থাগত ত্রুটি ও অপরাধমূলক ঘটনাবলির কারণগুলো নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যাবে। রানা প্লাজার মালিক ও ওই ভবনের গার্মেন্ট কারখানাগুলোর মালিকেরা কেন আইন মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তা ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁদেরকে আদালতে হাজির করার জন্য হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রমিকদের মৃত্যু, আহত হওয়া, তাঁদের ক্ষতিপূরণ ও বকেয়া বেতন বিষয়ে কয়েকটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

আদালতের এবারের নির্দেশনাগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে, যদিও তৈরি পোশাকশিল্পের ব্যাপারে আদালত ইতিপূর্বে যেসব আদেশ দিয়েছেন, সরকার বা এই শিল্পের মালিকেরা সেগুলোর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি। ২০০৬ সালে আশুলিয়ার পলাশবাড়ীতে স্পেকট্রাম সোয়েটার ইন্ডাস্ট্রির ভবনধসে প্রাণ হারিয়েছিল ৬৪ জন। ওই ভবনের জমির মালিকানা ও ভবনটি নির্মাণের আইনি বৈধতা এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা-পরিস্থিতি সম্পর্কে দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে দমকল বিভাগ, শ্রম অধিদপ্তর ও বিজিএমইএর প্রতি আদেশ জারি করেছিলেন হাইকোর্ট। কিন্তু প্রতিবেদন দিয়েছিল একা বিজিএমইএ। সে সময় কারখানাগুলোর নিরাপত্তা-পরিস্থিতি তদারকির দায়িত্ব নিয়েছিল বিজিএমইএ। কিন্তু মাঠপর্যায়ে কারখানা পরিদর্শনের কাজ দুই সপ্তাহের বেশি এগোয়নি। অনেক কারখানাই পরিদর্শন করা হয়নি। তেজগাঁও এলাকায় ফিনিক্স ভবন ধসের ঘটনায় হাইকোর্ট গুরুতর আহত ব্যক্তিদের মাথাপিছু তিন লাখ ও সামান্য জখম ব্যক্তিদের মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন। ২০০৬ সালে চট্টগ্রামে কেটিএস গার্মেন্টস কারখানায় আগুন লাগে; গত বছরের নভেম্বরে সাভারের তাজরীন ফ্যাশন গার্মেন্টসে আগুন লেগে ১১২ জনের মৃত্যু ঘটে।

এসব ঘটনায় তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের দোষ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে বিরাট ফাঁকি ও গাফিলতি নজরদারিতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা আবারও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটেছে অনেক, কিন্তু সব ঘটনাতেই মালিক ও ব্যবস্থাপকেরা দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহির ঊর্ধ্বে থেকে গেছেন।

শ্রম অধিদপ্তর স্বীকার করেছে, প্রায় পাঁচ হাজার গার্মেন্ট কারখানা নিয়মিত নজরদারি করার জন্য পর্যাপ্ত লোকবল তাদের নেই। দমকল বিভাগ বলেছে, তাদের পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই।

গত দুই দশকে তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ বাংলাদেশের শ্রম আইন (২০০৬) অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। বিল্ডিং কোডও ব্যাপকভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান ও ভবন ব্যবহারসংক্রান্ত বিধিবিধানগুলো নতুন করে পর্যালোচনা করা উচিত; যোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। কারখানার জন্য নির্মিত ইমারতের ভিত বসবাসের জন্য নির্মিত ইমারতের চেয়ে বেশি মজবুত হওয়া প্রয়োজন। তৈরি পোশাক কারখানার লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া এমন কঠোর হওয়া উচিত, যেন বসবাসের লক্ষ্যে নির্মিত ভবনকে কেউ পোশাক কারখানা হিসেবে ব্যবহার করতে না পারেন। রাজউকের স্পষ্টতই প্রকৌশলগত পেশাদারির অভাব রয়েছে। অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী যেমনটি বলেছেন, বিল্ডিং কোড অনুসরণ তদারকির জন্য একটি উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন বিল্ডিং মনিটরিং অথরিটি বা ইমারত তদারকি কর্তৃপক্ষ গঠন করা প্রয়োজন। এই সংস্থার সদস্য হিসেবে বিজিএমইএকে নেওয়া যেতে পারে নিরাপত্তার মানদণ্ডগুলো নিশ্চিত করার শর্ত সাপেক্ষে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর যোগ্যতার ঘাটতি থেকে থাকলে অথবা এ ধরনের কঠিন দায়িত্ব পালনে তারা সক্ষম না হলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, শ্রমিক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতিটি কারখানার জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

রানা প্লাজার উদ্ধারকার্যে যে দুর্যোগ-দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া লক্ষ করা গেছে, তাতে এ রকম পরিস্থিতিতে আমাদের সহযোগিতা ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা প্রমাণিত হয়েছে। স্পেকট্রাম সোয়েটার কারখানা ধসের সময় উদ্ধারকাজ প্রায় অসম্ভব হয়েছিল প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কার্যকর সহযোগিতা-সমন্বয়ের অভাবে। স্পেকট্রাম ধসের পর গঠিত একটি টাস্কফোর্স সুপারিশ করেছিল, বিশেষভাবে উদ্ধারকাজ পরিচালনার উপযোগী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হোক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তা করা হয়নি এবং রানা প্লাজায় উদ্ধারকাজের সময় উদ্ধার-সরঞ্জামের ঘাটতির কারণে উদ্ধারকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের খুন্তি-শাবল ইত্যাদি দিয়ে দেয়াল, বিম, পিলার খুঁড়তে ও ভাঙতে হয়েছে। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক উদ্ধারকর্মী উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছেন খালি হাতে, কাঁচি-খুন্তি ইত্যাদি দিয়ে তাঁরা নানা ধরনের ধাতব তার কেটেছেন, মানুষের জীবনরক্ষার ক্ষেত্রে সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু উদ্ধারকাজের ব্যবস্থাপনায় যদি আরও বেশি সমন্বয়-শৃঙ্খলা থাকত এবং যথাসময়ে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি যদি আরও বেশি থাকত, তাহলে তাঁরা আরও অনেক মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হতেন। শিল্প খাতের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমাদের শিল্প পুলিশ রয়েছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা, এই শিল্পে দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবিলার জন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজেস্টার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নেই!

রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি অত্যন্ত শক্তিশালী এক জেগে ওঠার ডাক। এই দুর্ঘটনায় বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানির মধ্য দিয়ে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে, তা সহ্য করার মতো নয়। মানুষের প্রাণের এত চড়া মাশুল সহ্যাতীত রকমের ভারী। এখন দায়িত্ব এড়ানোর, পলায়নপরতার সময় নয়। আমাদের রাষ্ট্র ও পোশাকশিল্প, সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে, শ্রমিকদের জীবন মূল্যহীন নয়। তাদের আরও নিশ্চিত করতে হবে, এই শ্রমিকদের শ্রম এত সস্তা নয়।

ইংরেজি থেকে অনূদিত

হামিদা হোসেন: *আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারপারসন*

সূত্র: প্রথম আলো, ১৮ মে ২০১৩

হারানো অধিকার, হারানো জীবন

আইরিন খান

ঢাকার বাইরে, সাভারে রানা প্লাজার ধ্বংসস্তুপ থেকে শত শত নারীর লাশ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। তাঁদের মৃত্যুর বিবর্ণতার পিঠে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ছিল পরনের সালোয়ার-কামিজ আর শাড়ি। আর তখন রাজধানীতে ইসলামি চরমপন্থীরা বাস পোড়াচ্ছেন, দোকানপাটে লুটতরাজ চালাচ্ছেন এবং হামলা চালাচ্ছেন পুলিশের ওপর। তাঁদের প্রধান দাবি: একটি ইসলামি রাষ্ট্র, যেখানে নারীরা থাকবেন পুরুষ থেকে আলাদা।

কিন্তু তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি যে এসব নারীর মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল সম্পদ আসে। বাংলাদেশের মূল আয়ের উৎস পোশাকশিল্প। এর মাধ্যমে এক হাজার ৯০০ কোটি ডলার অর্জিত হয়। আর পোশাকশিল্পের বিশাল অংশজুড়ে রয়েছেন নারী-কর্মীরা। হাড়ভাঙা খাটুনির মাধ্যমে এসব নারী নিজের জীবিকার বাইরেও অনেকের জীবিকা টিকিয়ে রাখছেন; অথচ তাঁদের শ্রম-নিরাপত্তার রেকর্ড ভীতিকর।

দুই দশকের বেশি সময় ধরে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুই নারীনেত্রীর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এরপরও দেশটি, যা আমার স্বদেশ, নারীর ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামপন্থীরা 'নাস্তিক ব্লগারদের' ফাঁসির দাবিও তুলেছেন। এসব বিক্ষোভকারী ৮৪ জন ব্লগারের একটি তালিকা করে তাঁদের বিচার চাইছেন। অথচ বিক্ষোভকারীদের অনেকে কখনো ইন্টারনেটেই প্রবেশ করেননি। এই তালিকায় আরও নাম থাকতে পারত, কিন্তু রাজীব হায়দার নামের এক ব্লগারকে ইতোমধ্যে হত্যা করা হয়েছে। ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন আসিফ মহিউদ্দিন।

এই ব্লগারদের মাধ্যমেই অনুপ্রাণিত হয়ে শত শত তরুণ রাস্তায় নেমে চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন। কিন্তু এ পথে নেমে তাঁরা নিজেরাই চরমপন্থীদের মতো আচরণ করছেন। যাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের সবার মৃত্যুদণ্ড দাবি করছেন তাঁরা। এখানে এসব তরুণ মূল জিনিস থেকে বিচ্যুত তাঁদের কাছে এটা মনে হয়নি যে দোষী বা নির্দোষ সবার ক্ষেত্রে মানবাধিকার সমানভাবে প্রযোজ্য; এমনকি জঘন্য দুষ্কর্মকারীও একই সুযোগ পাবে।

রাজনৈতিক শ্রেণীর কথা আর কী বলব? প্রধান বিরোধী দল হিসাব-কিতাব করেই ইসলামপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছে। তবে তা হয়েছে ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন বিপজ্জনক পদক্ষেপে। সরকারের ভূমিকা যা দেখা যাচ্ছে, তাতে বলছে একটা, করছে আরেকটা। সরকার একটি লৈঙ্গিক সমতার নীতি ঘোষণা করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে যে আইন, তা বৈষম্যে ভরা। তারা ইসলামি চরমপন্থীদের দোষ দিচ্ছে, কিন্তু গ্রেপ্তার করেছে চারজন ব্লগারকে (মহিউদ্দিনসহ)। এ ছাড়া 'ইসলামের বিরুদ্ধে নেতিবাচক বিষয়ে উসকানি' দেওয়ার অভিযোগ এনেছে সংবাদপত্রের একজন সম্পাদকের বিরুদ্ধে।

নিরাপত্তা আইনের লঙ্ঘন বা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণকাজ, এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি সরকার। এতে দেশের লাখ লাখ শ্রমিকের জীবন ঝুঁকির মুখে। রানা প্লাজার ভবনধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়েছে (এক হাজার ১২৭ জনে পৌঁছেছে)। এর আগে একটি পোশাক কারখানা ভবনে আগুন লাগার ঘটনায় আটজন বা এর বেশি লোক মারা যান।

জীবনভর মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করে আমি যা দেখেছি, তা হচ্ছে- বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে জটিলতা যেমন বাড়ছে, এর সূত্র ধরে অধিকার নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। এতে আবার বৈচিত্র্য রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক অধিকার, নারীর অধিকার, শ্রম অধিকার।

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের অধিকারের মধ্যে যোগসূত্রটি আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান: নারীর অধিকারের সঙ্গে শ্রম অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার সঙ্গে নারীর অধিকার, বিবেকের স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্মীয় স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে বিবেকের স্বাধীনতা। আরও রয়েছে ব্লগারদের যা খুশি লেখার স্বাধীনতা। রয়েছে জীবনের ভয় না করে নারী ও পুরুষের কাজ করে যাওয়া।

মানবাধিকার বিশ্বজনীন। বাংলাদেশের কি এই দৃষ্টিভঙ্গি, সাহস আর রাজনৈতিক ইচ্ছা আছে? চার দশক আগে স্বাধীনতার সময় তারা যেমনটি করেছিল, সে রকম আজ মানবাধিকার রক্ষার অঙ্গীকার পুরোপুরি সম্পন্ন করবে? ১৯৭১ সালে আমার দেশের মানুষ কেবল ধার্মিকদের জন্যই লড়েনি, অধার্মিকদের জন্যও লড়েছে। ১৯৭১ সালে আমরা কেবল সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করার জন্য লড়িনি, লৈঙ্গিক বৈষম্য দূর করতেও লড়েছি। ১৯৭১ সালে আমরা সব মানুষের অধিকারের জন্য লড়েছি।

কিন্তু বাংলাদেশে সবার জন্য অধিকার অর্জিত হয়নি। রানা প্লাজার বিপর্যয় ও ইসলামপন্থীদের সহিংসতা পরস্পর গ্রন্থিত ব্যাধিরই অংশ। এর মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি, রাজনৈতিক ফায়দা লোটা ও বিশ্বজনীন মানবাধিকারের অবমাননা। যখন আমি কেবল নিজের অধিকার দেখব, আপনারটা নয়, তখন কোনো মানবাধিকারই নিরাপদ নয়।

ইংরেজি থেকে অনূদিত

আইরিন খান: *ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ল অর্গানাইজেশনের মহাপরিচালক; সাবেক মহাসচিব, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।*

সূত্র: প্রথম আলো, ১৭ মে ২০১৩

সংকট উত্তরণে কিছু প্রস্তাব

রুবানা হক ও আনিসুল হক

এ দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি খাত একই সঙ্গে আশা-নিরাশার মধ্যে দিয়ে হাঁটছে। পৃথিবীর অন্য যেকোনো দেশ যখন উৎপাদনক্ষমতায় সীমিত, তখন আমরা আমাদের কারখানা নিয়ে ক্রেতাকে সুলভ মূল্যে সুস্থিত উৎপাদনের আশ্বাস দিই। এর মাঝে যেমন বাংলাদেশের সুন্দর ভবিতব্যে পদার্পণের স্বপ্ন দেখি, তেমনি একই সঙ্গে তাজরীন, রানা প্লাজা আমাদের সবাইকে দুঃস্বপ্নের মতো জড়িয়ে থাকে, প্রতিনিয়ত, প্রতিপ্রহরে।

ক্রেতারা এ মুহূর্তে 'মেড ইন বাংলাদেশ' লেবেল দেখে শঙ্কিত হচ্ছেন। এনজিওকর্মীরা বিদেশে বড় বড় ব্র্যান্ডের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছেন। আর আমরা এই প্রান্তে দেশি আর বিদেশিদের তিরস্কার শুনছি। ইইউ শুল্কমুক্ত-সুবিধা পরিহারের কথা ভাবছে, আমেরিকা জিএসপি তুলে নেবে বলে বারবার আমাদের সাবধান করছে। যত উত্তম সরবরাহকারী হই না কেন, বহু ক্রেতা তাদের সুনাম ক্ষুণ্নের আশঙ্কায় এ দেশ থেকে সরে পড়তে পারেন। এতে বাংলাদেশের ক্ষতির ঝুলি ভরবে বৈ কমবে না। আজকে প্রয়োজন একটি আমূল পরিবর্তনের কার্যকর পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন।

আমরা যে প্রস্তাবগুলো দিচ্ছি, তা সুধীসমাজ, গুণীজনেরা, ব্যবসায়ী মহল, আর সরকার বিবেচনা করতে পারে। এই শিল্পের জন্য কিছু করতে হলে শিল্প খাতকে ভালো করে বুঝতে হবে। শিল্পকে বন্ধ করা নয় বরং বন্ধ শিল্প নতুনভাবে শুরু করার মানসিকতা নিয়ে সব কাজ করতে হবে।

বিজিএমইএর কাছে চার হাজার ৩৮২টি কারখানার তালিকা রয়েছে, যার মধ্যে তিন হাজার ২৮০টি ঢাকায়, ৭৮৮টি চট্টগ্রামে, ৩১৪টি নারায়ণগঞ্জে। এই চার হাজার ৩৮২টির মধ্যে দুই হাজার ৬৮টি কারখানা সরাসরি রপ্তানি করে। বাকি দুই হাজার ৩১৪টি কারখানা, যার মধ্যে অনেক কারখানা পরোক্ষভাবে উৎপাদন করছে, বেশ কিছু বন্ধ ও অস্তিত্বহীন আছে। ৩৫ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। বিকেএমইএর এক হাজার ৮৭০টি কারখানায় যেখানে ছয়-সাত লাখ শ্রমিক কাজ করেন, তার মধ্যে ৯০০টি প্রত্যক্ষভাবে রপ্তানি করে (যার আবার ৫০০টি প্রথম সারির আর বাকি ৪০০টি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারির), ২৭০টি সম্পূরক প্রতিষ্ঠান (অ্যাক্সেসরিজ) হিসেবে কাজ করছে। বাকি ৭০০টি কারখানা হয়তো বা বন্ধ, নতুবা অস্তিত্বহীন।

প্রকৃতপক্ষে, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর অধীনে বহু কারখানা বহু বছরের খারাপ ব্যবসা ও অধিকাংশই রাজনৈতিক কোলাহলের কারণে রুগ্ন অথবা বন্ধ হয়ে গেছে।

পোশাক রপ্তানি খাতে দীর্ঘমেয়াদি, সার্বিক এবং চতুর্মুখী সমাধানের জন্য, প্রথম প্রয়োজন কারখানাগুলোর নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু নিরীক্ষা, জরিপ ও পর্যবেক্ষণ। যেহেতু বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ ভোটারদের সংগঠন, সেহেতু বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর পক্ষে নিরপেক্ষ নিরীক্ষণ সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বিজিএমইএ/ বিকেএমইএ নিয়ে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় সংগঠনকে দিয়ে পরীক্ষণ প্রয়োজন। দেখা প্রয়োজন কটি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সারির কারখানা এবং কটি কারখানা বন্ধ। সময় বাঁচানোর জন্য এই যাচাই প্রক্রিয়াটি রাজউক এবং বিইউবিটির প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে কিছু ছাত্রছাত্রীকে দিয়েও করানো যেতে পারে।

এই তৃতীয় সারির কারখানাগুলোই অগ্নিবিষয়ক নিরাপত্তা এবং কাঠামোগত দুর্বলতায় ভোগে। প্রথম অবস্থায় এদেরই পরিচর্যা প্রয়োজন।

শিল্পের খাতিরে, এই শিল্প খাতকে বাঁচাতে হলে জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে এই তৃতীয় সারির কারখানাগুলোকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। ঢাকা মেট্রোতে এক হাজার ৫৬৮টি কারখানার মধ্যে মাত্র ৬৪৭টি ইউডি নেয় এবং তাদের নিজেদের নামে রপ্তানি করে। বাকি আরও ৫০০টি দ্বিতীয়/তৃতীয় সারিতে ফেলা যেতে পারে। ঢাকা মেট্রো ও চট্টমেট্রোতেই প্রথম থেকেই অপরিকল্পিতভাবে অনেক শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। এর সমাধান করতে হলে প্রয়োজন বোঝা-কী লাগবে, কত লাগবে। একটি শার্ট অথবা নিট গার্মেন্টস কারখানা তৈরির আনুমানিক ধারণা দিচ্ছি।

একজন শ্রমিকের জন্য ৫০ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। ৫০০ শ্রমিকের একটি কারখানার জন্য লাগে ২৫ হাজার বর্গফুট। একটি নতুন কমপ্লায়েন্ট কারখানা তৈরির হিসাবের খতিয়ান নিচে দেওয়া হলো। ছয়টি তালায়, ছয়টি কারখানার জন্য তিন বিঘা জমি ১ দশমিক ৫০ কোটি; প্রতি কারখানা ২৫ লাখ, কনস্ট্রাকশন এক হাজার ৩০০ টাকা প্রতি বর্গফুট মোট ৩ দশমিক ২৫ কোটি, মেশিনারি ৩ দশমিক ৫০ কোটি, ফার্নিচার, ইলেকট্রো মেকানিক্যাল, অগ্নিনির্বাপণ ২ দশমিক ৮০ কোটি, মোট ৯ দশমিক ৮০ কোটি। এর অর্থ হলো ২৫ হাজার বর্গফুটের একটি কারখানার জন্য খরচ হয় আনুমানিক ১০ কোটি টাকা। একজন মালিক চাইলে একাধিক কারখানা তৈরির ব্যবস্থা নিতে পারেন।

তৃতীয় সারিতে যদি এক হাজার কারখানা থেকে থাকে, তবে মোট জায়গা লাগবে ৫০০ বিঘা। দুটি ভিন্ন স্থানে এ পল্লি গড়া সুবিধাজনক। প্রতি ছয়তলা ভবনে, ছয়টি কারখানার জন্য বরাদ্দ করতে হবে তিন বিঘা। ঢাকা ও চট্টগ্রামের আশপাশে সরকারের খাসজমি থেকে বরাদ্দ দিতে হবে এই পোশাকপল্লিকে। প্রথম ৭০০-কে সরিয়ে নিতে হবে। ক্রমান্বয়ে বাকি ৩০০টিকেও একইভাবে ঢাকা/চট্টগ্রামের কাছে একই পদ্ধতিতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন। শ্রমিকের সুবিধার জন্য ঢাকা/চট্টগ্রামের ৫০-৬০ কিলোমিটারের মধ্যে এ রকম জমি প্রয়োজন ও পাওয়া সম্ভব। গ্যাস, বিদ্যুতের ব্যবস্থা সরকারকে করতেই হবে।

এই এক হাজার কারখানাকে সরাতে প্রায় ১০,০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন, যার প্রথমাংশের বরাদ্দ আনুমানিক তিন হাজার কোটি টাকা বর্তমান বাজেটে রাখার বিনীত প্রস্তাব রাখছি। (এর বেশ কিছু অংশে মালিকেরাও অর্থসংস্থান করতে পারেন) এই ছোট এক হাজার কারখানা নিজেরাই তাদের রপ্তানি আয় থেকে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য, এই প্রক্রিয়া চলাকালে আরও বহু নতুন চাহিদা দেখা দিতে পারে। সবাই আন্তরিকভাবে কাজ করলে তিন-চার বছরের মধ্যে এ কাজ সম্পাদন সম্ভব। এটিই হবে নিরাপদ শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট কার্যকর দীর্ঘমেয়াদি সমাধান।

এবার ন্যূনতম মজুরি প্রসঙ্গে আসা যাক। ন্যূনতম মজুরি বাড়ানো প্রয়োজন, তা স্বীকার করছি। প্রথমেই বলি, ১মে থেকেই মজুরি বৃদ্ধি করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সময় দিয়ে বিক্রেতাদের ক্রেতার সঙ্গে আলোচনার সুযোগ দিয়ে, তারপর স্থির করতে হবে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের তারিখ। কারণ, ক্রেতারা আদৌ বেশি দামে কিনবেন কি না, আদৌ তাঁদের ভোক্তারা বর্ধিত দামে কিনতে রাজি হবেন কি না, তা বুঝতে হবে সবার আগে। অন্যথায়, ক্রেতাদের বিকল্প বাজারের দিকে ঠেলে দেওয়া যৌক্তিক হবে না। বিক্রেতাদের ধৈর্য্যসহ বোঝাতে হবে কেন আমরা সস্তা শ্রমের বিপক্ষে। আর একই সঙ্গে ন্যূনতম মজুরিকে শ্রমিকের উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সংযোগ করতেই হবে। তাতে শ্রমিকের উৎপাদন দায়িত্ব পালনের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যাবে।

অন্যদিকে, কারখানার দালান পরীক্ষা ও অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কিছু বড় ব্যান্ড একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যাতে তারা তৃতীয় পক্ষের সহায়তা নিয়ে একজন নিরপেক্ষ চেয়ার নিয়োগ করে দুই পাশে তিনজন কারখানামালিক ও তিনজন শ্রমিকনেতার সমন্বয়ে একটি 'স্টিয়ারিং কমিটি' গঠন করছে। এই চুক্তি অনুযায়ী তারা ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলোকে পাঁচ বছরে ২৫ লাখ ডলার দেবে। কিন্তু দেশের সার্বিক প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দ করা টাকার পরিমাণ অত্যল্প। এই ব্র্যান্ডগুলো তাদের নিজেদের সরবরাহকারী কারখানাগুলোর জন্য এই বিশেষ পদক্ষেপগুলো নিয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আশা করি, আরও ক্রেতা সংগঠন এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। একটি ছোট/মাঝারি আকারের কারখানাকে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় শক্তিশালী করতে হলে লাগে নয় লাখ ৩৬ হাজার টাকা, যার প্রায় সাত লাখ টাকা ব্যয় হবে যন্ত্রপাতি কিনতে আর প্রশিক্ষণে। পাশাপাশি দুই লাখ খরচ হবে কেবল পিএ (পাবলিক অ্যাড্রেস) সিস্টেম কিনতে। কাজেই যদি এই

কারখানাগুলোকে স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে, অর্থ সহায়তা দিয়ে, তৃতীয় সারি থেকে প্রথম/দ্বিতীয় সারিতে নেওয়া যায়, তাহলে স্বল্পমেয়াদি সমাধান হিসেবে এ পদক্ষেপটি অত্যন্ত ফলপ্রদ হবে বলে আশা করি।

একই সঙ্গে শ্রমিককল্যাণ ট্রাস্টের কথাও ইতোমধ্যে উঠেছে। এই ট্রাস্টটিকে শিগগিরই কার্যকর করতে হলে, ক্রেতা এফওবি মূল্যের শতকরা ১ ভাগ আর সরবরাহকারী কারখানা মূল্য সংযোজনের শতকরা ১ ভাগ দিয়ে যৌথ তহবিল গঠনের উদ্যোগ নিতে পারে। এটি শ্রমিকের শতকরা ৫ শতাংশ মুনাফা দেওয়ার বিকল্প ও স্বচ্ছতর পদ্ধতি হিসেবে গঠন করা যেতে পারে। তবে বিতরণে স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে।

এসব কিছু করতে হলে বিজিএমইএ ক্রেতা, কারখানা, সরকার, এনজিও, শ্রমিকনেতাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। শিল্পের খাতিরে, এই ৪০ লাখ শ্রমিকের কথা ভেবে, কোনো সাংঘর্ষিক অবস্থান নেওয়া হবে স্বার্থপরতার শামিল।

রুবানা হকঃ *ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মোহাম্মদী গ্রুপ*

আনিসুল হকঃ *সাবেক সভাপতি, বিজিএমইএ, এফবিসিসিআই, সার্ক চেম্বার*

সূত্রঃ প্রথম আলো, ২০ মে ২০১৩

মালিকের জন্য দায়মুক্তি, জাতির জন্য শোক!

ফারুক ওয়াসিফ

শান্তি: সাভারে যাঁরা মরেছেন, তাঁরা 'আমাদের' কেউ নন। তাজরীনের ওরাও 'আমাদের' কেউ নন। তাই তাঁদের লাশ গোনার দরকার কী? সচক্ষে শত মানুষের লাশ দেখার পরও জানার আগ্রহ নেই, উদ্ধারকাজ শেষে সংখ্যাটা কত দাঁড়াবে, তিন শ, পাঁচ শ, হাজার? যখন নিয়মিতভাবে শ্রমিক মারা যান, তখন কোনবার কতজন মারা গেলেন তার থেকে বড় সত্য, মৃত্যুই তাঁদের জন্যবরাদ্দ, জীবন কেবল আমাদের; যারা মধ্য থেকে উচ্চের দিকের মানুষ।

বাংলাদেশে গরিব মানুষের মৃত্যু আর সংখ্যার বিষয় নয়, এটা এক গুণগত মাত্রা অর্জন করে ফেলেছে। তাঁদের হত্যার ধারাবাহিকতার যোগফল বেশুমার। যাঁরা মরে গেছেন, তাঁদের মরে যাওয়ারই কথা অনিরাপদ কারখানায়, নিষ্ঠুর পরিচালন-ায়, শ্রম নিংড়ে নেওয়া মজুরিপনায়, উপেক্ষার ব্যবস্থাপনায়। যাঁরা মরেননি, তাঁরা পরে মরবেন। যাঁরা বিছানায় পিঠ রেখে মরার সৌভাগ্য পাবেন, তাঁদের বেঁচে থাকা প্রাকৃতিক নিয়ম আর অসম্ভব প্রাণশক্তির কুদরত। জীবনের চেয়ে মৃত্যুর শক্তি যেখানে বেপরোয়া, সেখানে মৃতরা কাঠামোগত গণহত্যার হিসাবহীন জনপুঞ্জ, জীবিতরা জিন্দা লাশ।

লাখো জিন্দা লাশের মিছিল সাভারে উপচে পড়ছে। অধিকাংশ গ্রামীণ তরুণ-তরুণী এবং অধিকাংশই অপুষ্টিজাত খাটো খাটো মানুষ। এঁরা আর দেশের কর্তাশক্তি আর তাঁদের ভাইবেরাদর এক জাতি নয়, এক সমাজ নয়, এক শ্রেণী নয়। এখানে জাতির ভেতর জাত, দেশের ভেতর দ্যাশ, মানুষের মধ্যে না-মানুষ। তাঁরা এই নৈরাষ্ট্রের নৈনাগরিক। তাঁদের জন্য শোক ছাড়া আর কী-ই বা দেওয়ার আছে আমাদের?

আমাদের জন্য বেঁচে থাকার শান্তি, তাঁদের জন্য শোক। প্রতীকী নয়, নিরঙ্কুশ, আদি ও অকৃত্রিম স্বজন হারানোর শোক। দুই বোন হারানো যুবক আওলাদ মাটিতে আছাড়ি-পিছাড়ি দিয়ে ডাকছেন, 'ও আল্লাহ, বোন দুইটারে মায়ের বুকে দিয়া যা, আমারে তুই নিয়া যা।' ধামরাইয়ের আওলাদের বোনের নাম তো শিউলি আর সীমাই হবে। শিউলির বিয়ে হয়েছে দুই মাস আগে। এখনো স্বামীর বাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হয়নি।

দেখতে দেখতে বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলি। কার কে মারা গেছেন বা নিখোঁজ আছেন, জানতে ভুলে যাই। বলি, কার কয়জন? বগুড়ার রিজিয়া ডুকরে উঠে বলেন, 'আমার তিনজন: আজিজ, মনিকা, রেহানা।' আজিজ তাঁর স্বামী, রেহানা বোনের মেয়ে, মনিকাও আত্মীয়। মামুন হাসপাতালে ঝোলানো তালিকায় খুঁজছেন চারজনকে: আতাউর, অরপুন, ফরহাদ ও সুজন। ভাতিজা, ভাগিনা, জামাই সম্পর্কের মানুষ তাঁরা। লিটন খুঁজছেন তাঁর ভাবি কল্পনাকে। হায়, কল্পনা! তাজরীনের নিহতের তালিকায় কয়েকজনকে পেয়েছিলাম, যাঁদের নাম কল্পনা।

আটতলা রানা প্লাজার ছাদের পর ছাদ যেন পাউরুটির পর পাউরুটির টুকরার মতো সেঁটে আছে। তারই একটা ফোকর দিয়ে এক মধ্যবিত্ত চেহারার মানুষ চিৎকার করে ডাকছেন, রা-শে-দ, সা-দ্দা-ম, সা-মা-দ, ইক-বা-ল বলে। সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ইকবালের ফোনে অস্পষ্ট কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। এখন আর কারও সাড়া নেই।

রানা প্লাজার মালিকের নাম সোহেল রানা। তাঁর বাবা খালেক কলু নামে পরিচিত। ঘানির তেলের ব্যবসা ছিল তাঁর। জনশ্রুতি আছে, তাঁর পরিবারের মালিকানায় ধসে পড়া রানা প্লাজার মতো চার-পাঁচটি ভবন আছে। ধনী হওয়ার গতির সমান্তরালে রানা নেতাও হয়েছেন। এখন তিনি শহর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক। কিন্তু শ্রমিকেরা তাঁকে নেতা মানতেন না, বলতেন মালিক। এই মালিক আগের দিন শ্রমিকদের বলেছিলেন, ফাটল-টাটল কিছু না। প্লাস্টার খসছে, বিল্ডিংয়ের কিছু হবে না। এই কিছু হবে না তিনি বলতে পেরেছেন কারণ, তিনি তাঁর দলীয় মুরোদ জানতেন। তা-ই প্রমাণ করলেন

সাভারের সাংসদ মুরাদ জং। মুরাদ তাঁকে সশরীরে এসে উদ্ধার করেন। আহত-নিহত শ্রমিকদের স্বজনদের রোষানলে পিষ্ট হওয়ার ভয় থেকে। কিছু হয়নি তাঁর, কিছুই হবে না তাঁর! কিছু হবে না সাভারের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার। তিনি বলেছিলেন, ভবনের ফাটল তেমন কিছু নয়।

নারায়ণগঞ্জের প্যানটেক্স গার্মেন্টের মালিকের কিছু হয়নি। চট্টগ্রামে আগুনে অঙ্গার অজস্র শ্রমিকের মালিকেরও কিছু হয়নি। তাঁরা দেশের মালিক, আইনের মালিক, এমনকি অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের জীবন-মৃত্যুরও মালিক। রাষ্ট্র কেবল এই জীবন-মৃত্যুর মালিকদের ম্যানেজার। তাই মালিকদের কিছু হয় না। কিন্তু মানিকগঞ্জের মুল্লি বেগম ভাঙা হাত নিয়ে বোবা হয়ে যাবেন। যতই বলি, কতজন ছিলেন তখন, ততই তাঁর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ বাড়তে থাকে। এই বোবা যন্ত্রণা আর ক্রোধের ভাষা উদ্ধার করার মতো অত্যাধুনিক যন্ত্র যদি পেতাম! যদি জানতে পারতাম, কত তীব্র ধিক্কার আর বিচারের ফরিয়াদ সেখানে গুমরাচ্ছে! যদি পারতাম, সেই যন্ত্রণার চিৎকার সরাসরি সম্প্রচার করে সারা দেশের মানুষকে শোনাতে!

সাভার থেকে ফেরার পথে পানির জন্য থামি। দোকানের টেলিভিশনে দেখি, সংসদে সরকারের বিভিন্ন সফলতার বয়ান হচ্ছে। বয়ান যিনি দিচ্ছেন, আর যাঁরা শুনছেন, সবার মুখ হাসি হাসি। সব শান্তি আর হাসি তাঁদের মুখে যেন বর্ষিত, আর শ্রমিকদের জীবনের ওপর ধসে পড়ছে ভবন, পুড়ে যাচ্ছে দেহ। তাঁদের মুখে হাসি নেই। গত কয়েক মাসে আগুনে পুড়ে, ভবন ধসে শত শত শ্রমিক পুড়ে মরেছেন। তবু সাভারের রাস্তাজুড়ে লাখ লাখ মানুষ। না, মানুষ নন, শ্রমিক। লাখ লাখ শ্রমিক আর তাঁদের স্বজনেরা সাভারজুড়ে। তাঁরা রাস্তায়, তাঁরা রাস্তার পাশে, তাঁরা সব হাসপাতাল ও ক্লিনিকের ফটকে। তাঁরা যে যা পারেন করছেন। কেউ মানুষকে পানি খাওয়াচ্ছেন। কেউ খাবার দিচ্ছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাস ভর্তি করে ছাত্রছাত্রীরা এসেছেন রক্ত দিতে এনাম হাসপাতালে। এমনকি আশপাশের মাদ্রাসা ছাত্ররাও দাঁড়িয়েছেন রক্তদানের সারিতে, সাহায্যের সারিতে। সাভারে দেখে এলাম, সমাজ যা পারে করছে, কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যর্থ। এবং এই রাষ্ট্রযন্ত্র এমনই এক যন্ত্র, যা বাঁচাতে পারে না, মৃত্যুর বন্দোবস্ত দিতে পারে, দিতে পারে চিরদায়মুক্তি। এমনকি সাভার এলাকায় বেসরকারি এনাম হাসাপাতাল ভিন্ন অন্য কোনো সরকারি হাসাপাতাল পর্যন্ত নেই। যেখানে প্রায়ই গণমৃত্যু হয়, সেখানে নেই উদ্ধারের দক্ষ বাহিনী। অথচ ঠিকই রয়েছে শিল্পাঞ্চল পুলিশ, রয়েছে আলিশান ক্লাব।

উদ্ধারকাজে গতি নেই। যেন তারা জানে না কী করতে হবে। ভাঙা ভবনের ভেতর থেকে একটা টর্চ চেয়ে চিৎকার করে গেলেন একজন অনেকক্ষণ। সেই টর্চ পাওয়া গেল না। ঢাকা থেকে একদল দমকলকর্মী গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু কী করতে হবে জানা নেই। এক কথায়, অনভিজ্ঞতা, অদক্ষতা আর বিশৃঙ্খলা। এক ভবন ধসলে যদি এই হয়, তাহলে ভূমিকম্প হলে কী করব আমরা?

সাভারের লাখ লাখ শ্রমিকের মনের এক সুর: ভয়। নীলফামারীর আলমের মা ফোন করে বলেছেন, বাবা চলে আয়। আলমের 'আর কাজই করতে মন চায় না'। জাহিদের কথা, 'জীবনটা তামা তামা হইল রে ভাই।' তাঁরা যেখানে ফিরে যাচ্ছেন, সেই কারখানা কিংবা সেই বস্তি এখন ভয়ের আখড়া। আগুনে পুড়ে বা ধসে মরতে চান না তাঁরা কেউ। কিন্তু দিন যাবে ভয় কমবে; বাড়বে ক্ষুধার চিন্তা, টাকার চিন্তা। তাঁদের জীবন পেটে বাঁধা, পেটের টানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা কাজ করে যাবেন মৃত্যুর কারখানায়।

কিন্তু মালিকদের জীবন পেটে বাঁধা নয়, তাঁদের জীবন বাঁধা বিত্তবিলাসের খাসলতে। টাকা বানানোর নেশায় সেই খাসলত তাঁদের অমানুষ করে তুলবে। সাভারের সোহেল রানার মতো ছয়তলার ভিতের ওপর তাঁরা দশতলা ভবন বানাবেন। দোকান দেওয়ার উপযোগী ভবনে কারখানা বানিয়ে দু-তিন টন ওজনের অনেক মেশিন বসাবেন। ভবন আপনা-আপনি ধসে না। এসবের ওজনের ভারে, মালিকের মুনাফার ভারে, বিজিএমইএর ভয়াবহ স্বার্থপরতার ভারে, সরকারযন্ত্র আর রাজনীতির রাজা-রানিদের নির্দয়তার ভারে তাঁরা মরে যান। সাধারণ মানুষ কেবল বিপদ এলেই আহা-উহু প্রতিবাদ করবেন, তারপর ভুলে যাবেন। প্রতিকারে কঠোর হবেন না কেউই। চলতে থাকবে মৃত্যুর ম্যানেজারি।

তাঁদের জন্য কেউ হরতাল দেবেন না, তাঁদের জীবন রক্ষার সফলতার বয়ান কেউ সংসদে গর্ব করে জানাবেন না। বরং হাসিমুখে জাতীয় শোক ঘোষণা করবেন। যাবতীয় শোক আর লজ্জা বহন করে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হয়ে উড়বে

বাংলার আকাশে। শোকের দায়, ব্যথার দায়, লজ্জার দায় কেবল পতাকার। বাকি সবার দায়মুক্তি দেওয়া হোক। পোশাকশিল্পে গণহত্যার জন্য দায়ী মালিকেরা আর তাঁদের সংগঠন বিজেএমইএ যে দায়মুক্তির ঐতিহ্য ভোগ করে আসছে, রানা প্লাজার মালিকদেরও সেই দায়মুক্তি প্রাপ্য। এক দেশে দুই নিয়ম চলতে পারে না।

কিন্তু আমাদের যাদের চোখের রেটিনায় যে মাংসপিণ্ডরূপ মানুষের ছবি, আমাদের কী হবে? তাজরীন থেকে ফেরার পর কয়েক দিন নাকে লেগে ছিল পোড়া মাংসের ঘ্রাণ। সাভার থেকে ফেরার পর টের পাচ্ছি মৃত্যুর সোঁদা গন্ধ। এক বন্ধুর প্রশ্ন শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম: 'আপনারা তো সব দেখেছেন, আপনাদের কী হবে?' কীভাবে ভুলব আহত-নিহত-যন্ত্রণার্ত মানুষের মুখ? ভুলে যাওয়াই কি আমাদের দুঃসহ স্মৃতির নিরুপায় উপায়?

ফারুক ওয়াসিফ: *সাংবাদিক ও লেখক*

সূত্র: প্রথম আলো, ২৫ এপ্রিল ২০১৩

বিল্ডিং কোড প্রয়োগের একটি পথনির্দেশনা

মেহেদী আহম্মদ আনসারী

বিল্ডিং কোড মূলত প্রকৌশলগত বিষয়। কোনো বিল্ডিংকে যেকোনো ঝুঁকি সহনীয় করে গড়ে তুলতে এই কোড প্রয়োগ করা হয়। ১৯৯৩ সালে হাউস বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে সকল পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিল্ডিং কোড প্রণীত হয়, যা মাঠপর্যায়ে প্রয়োগের জন্য ২০০৬ সালে আইনগত ভিত্তি পায়। কিন্তু বিল্ডিং কোড প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অদ্যাবধি কোনো প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি।

ঢাকা শহরে প্রতিবছর ৬ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্য শহরে এই বৃদ্ধি প্রায় ৪ শতাংশের মতো। বড় বড় শহরের পাশাপাশি উপজেলা শহর, এমনকি গ্রামগঞ্জের হাটবাজারেও এখন উঁচু ভবন নির্মিত হচ্ছে। আবাসনশিল্প দ্রুত ছোট শহরগুলোতে প্রসারিত হচ্ছে। অথচ ছোট শহর তো দূরের কথা, ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতেও বিল্ডিং কোডের প্রয়োগ সীমিত। কিন্তু কোডের বিধানগুলো অনুসরণ না করলে ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। বিল্ডিং কোডের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে ২০০৪ সালে শাঁখারীবাজার, ২০০৫ সালে স্পেকট্রাম ভবন, ২০০৬ সালে ফিনিক্স ভবন ও ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজার মতো ভবনধসের ঘটনা ঘটেছে।

এমতাবস্থায় বিল্ডিং কোডের প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় সম্প্রতি ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুরে চারটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালাগুলো থেকে পাওয়া সুপারিশগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১.
বিল্ডিং কোড বাস্তবায়নের জন্য দেশব্যাপী একটি ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ গঠন:

দেশব্যাপী বিল্ডিং কোড প্রয়োগ ও অনতিবিলম্বে ভবন নির্মাণ কর্মকাণ্ডের তদারকির জন্য একটি নিয়ন্ত্রক বা নীতিনির্ধারণী (রেগুলেটরি) কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কর্মশালাগুলোয় সবার মাঝে একটি ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয়। প্রস্তাব নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ বিল্ডিং কোড প্রয়োগ ও ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত সব নীতিমালা (কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা, বিধিবিধান ইত্যাদি) প্রণয়ন করবে। এই নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ স্থান ও এখতিয়ারভেদে মাঠপর্যায়ে বিল্ডিং কোড বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নির্বাহী সংস্থাকে দায়িত্ব দিতে পারে, যেমন ঢাকায় রাজউক, অন্যান্য মহানগরে সংশ্লিষ্ট নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং এর বাইরের (জেলা, উপজেলাসহ গ্রামগঞ্জের হাটবাজার) এলাকাগুলোতে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ সোজাসুজি তদারকের কাজ করবে।

২.
বিল্ডিং কোড বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের (OUTSOURCED CONSULTANCY FIRM) সম্পৃক্ততা ও Occupancy Certificate প্রদান:

এসব নিবন্ধনকৃত বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ভবন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি সয়েল টেস্ট রিপোর্ট এবং ভবনের ভিত্তি ও কাঠামোগত ডিজাইন তৈরি/পরীক্ষা করাতে পারে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে নির্মিত ভবনের গুণগত মান পর্যবেক্ষণের জন্য তদারকির কাজও করানো যেতে পারে।

যে কোম্পানি কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন করবে, তারাই ভবনের নির্মাণ সুপারভিশনের দায়িত্ব নেবে। তাদের দাখিল করা রিপোর্টের ভিত্তিতে, রাজউক এবং অন্যান্য নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ Occupancy Certificate প্রদান করবে।

৩.
ঝুঁকি সন্নিবেশিত পরিকল্পিত নগরায়ণ:

প্রত্যেক বড় শহরের দুর্যোগ-ঝুঁকি নিরূপণ করা। অতঃপর দুর্যোগ-ঝুঁকি ভৌত পরিকল্পনার সঙ্গে সন্নিবেশ করে ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের জন্য পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি এবং এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৪.
কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা:

সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সব প্রকৌশলীকে বিল্ডিং কোডের কারিগরি বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া। উপরন্তু রডমিস্ত্রি ও রাজমিস্ত্রিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে সনদ প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের তালিকাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসা। এই বিষয়ে দেশের সব ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোয় সার্টিফিকেট কোর্স চালু করা যেতে পারে। নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমপর্যায়ে প্রশিক্ষিত রড-রাজমিস্ত্রির অংশগ্রহণে ভবন নির্মাণ নিশ্চিত করা।

৫.
গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা:

বিল্ডিং কোড প্রয়োগের বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট, পোস্টার, বিলবোর্ড স্থাপন করা। সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানো।

৬.
নির্মাণসামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিত করা:

নির্মাণসামগ্রীর গুণগত মান উৎসস্থলে নিয়ন্ত্রণ করা। এ বিষয়ে বিএসটিআইয়ের দক্ষতা, লোকবল ও ক্ষমতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।

৭.
বিল্ডিং কোডকে আইনে পরিণত করা এবং কোড অমান্যকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে বর্তমান আইনকানুনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা।

মেহেদী আহম্মদ আনসারী: *অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়*

সূত্র: প্রথম আলো, ২৬ এপ্রিল ২০১৩

নূপুর পরা নিথর 'পা' যা বলে গেল

কাবেরী গায়েন

নূপুর পরা নিথর 'পা' আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

ভেঙে পড়া দালানের ধ্বংসস্তুপ থেকে বেরিয়ে এসেছে একটি পা। পায়ে নূপুর ঝুলছে। গোলাপি সালোয়ার পরা আরেকটি পা আটকে আছে ভেতরে। ছবিতে চোখ-মুখ-চুল দেখা যাচ্ছে না। এই পা সবার বড় অস্বস্তি তৈরি করেছে। সস্তার এই নূপুর মনে করিয়ে দেয় মেয়েটির এক টুকরা স্বপ্নের কথা, কোনো অনটন যা নিঃশেষ করতে পারেনি। ভোর হওয়ার আগেই যে মেয়েরা দল বেঁধে কারখানার দিকে এগিয়ে যান দৃঢ় পায়ে, একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, তাঁদের মুখে থাকে কখনো বা হালকা একটু প্রসাধনী, হোক না সে কম দামের। হাতে থাকে একটা ছোট পার্স। এসব সামান্য প্রসাধনী গৃহপরিচারিকার পরিচয় থেকে স্বাধীন জীবিকা অর্জনকারীর একেক টুকরা চিহ্ন, অনেক শ্রমে-ঘামে যা তিনি অর্জন করেছেন।

দেশের অর্থনীতিকেই যে শুধু চাঙা করেছেন তাঁরা সবটুকু শ্রম উজাড় করে দিয়ে এমন নয়, বরং এই অল্প আয়ের মেয়েদের ছোটখাটো ফ্যাশনকে ঘিরেও গড়ে উঠেছে বাজার। সস্তার লিপস্টিক, ছোট একটা আই পেনসিল, মিনিপ্যাক শ্যাম্পু, ১৫ টাকায় কেনা ছোট পার্স, ১০ টাকায় কেনা নূপুর। চোখ ভেসে যায়। নূপুর পরে ছুটে চলে যে জীবন, সে জীবন শুধু ছুটে চলার জন্য নয়, একটু সাধের-শখের ছোঁয়াও বুঝি ধরে রাখতে চায় একঘেয়ে সেলাইজীবনে। সেই জীবনকে জোর করে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। থামিয়ে দিয়েছে আমাদের লোভ, শ্রমিকের প্রতি দায়হীন জাতীয় আয় বৃদ্ধির সীমাহীন নিষ্ঠুরতা। এর নাম নিও লিবারালিজম।

যে করেই হোক, প্রবৃদ্ধি বাড়ল কি না, সেটিই বিবেচ্য। তাঁর নিরাপত্তা দেখার দায় নেই মালিকের। কারণ, রাষ্ট্র আশ্বস্ত যে দেশের প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য পোশাক কারখানার মালিকদের মানুষ মারা অনিয়মগুলো মেনেই নেওয়া যায়। দেয়ালে ফাটল দেখা গেলে একই দালানের অফিস বন্ধ করতে হয়, কিন্তু শ্রমিককে ঝুঁকিপূর্ণ দালানে কাজে ঢুকিয়ে মেরে ফেলা যায়। নূপুর পরা এই নিথর পা বুঝি জবাব দিয়ে যায় আমাদের লোভের, পাপের, উদাসীনতার, জবাবদিহিহীন খুনে রাষ্ট্রকে; আমাদের পোশাকি সভ্যতা আর মুনাফার জয়োল্লাসের মুখে।

২.

দুজন শ্রমিক মা এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই সন্তান জন্ম দিয়েছেন। অর্থাৎ, গরিব দুই মা সন্তান জন্ম দেওয়ার শেষ পর্যায়েও এসেছিলেন কাজে। কতটা অসহায় হলে এই আসন্ন অবস্থায় একজন মা কাজে আসতে বাধ্য হন! অথচ আমাদের আইনে রয়েছে নিরাপদ মাতৃত্বকালীন ছুটি। বহুবার শুনেছি, পোশাক কারখানায় এসব আইনের তোয়াক্কা করা হয় না। প্রসূতি মায়েরা ছুটি চাইলে বিদায় করে দেওয়া হয় কারখানা থেকে।

বিজিএমইএ বা রাষ্ট্র কোনো তদন্ত করেনি এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে, ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক। মানবতার ধ্বজাধারী ক্রেতাদেশগুলো তাদের চুক্তি বাতিল করেনি। কোনো সাচ্চা ট্রেড ইউনিয়ন নেই কারখানায় ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য কাজের পরিবেশ কিংবা প্রসূতি মায়ের ছুটির বিষয়ে একটি কথা বলার জন্য। মালিকপক্ষ সব সময়ই এসব অভিযোগ অতিরঞ্জন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।' রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সন্তান জন্ম দিয়ে দুই নারী শ্রমিক জানিয়ে দিলেন আমাদের, তাঁরা প্রসূতি ছুটি পান না।

আসলে শ্রমিকও হতে পারেননি তাঁরা, কেবল মজুরি-দাস হিসেবেই আটকে আছে তাঁদের জীবন। এসব আসন্ন-প্রসূতি মজুরি-দাস ফাটল দেখে কারখানায় যেতে চাননি, কিন্তু 'বসরা' লাঠি নিয়ে তাড়া করলে তাঁরা ঢুকতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ বক্তব্য চিকিৎসাধীন এক শ্রমিকের।

৩.

হতবাক আমি, যখন স্তব্ধতার আড়মোড়া ভেঙে লিখছি এই লেখা, তখন আমার ফেসবুক সয়লাব উদ্ধারকারীদের সাহায্য চেয়ে পাঠানো জিনিসের তালিকায়। তাঁরা চাইছেন ছোট শাবল, গাঁইতি, পানির ছোট ছোট বোতল, অক্সিজেন মাস্ক, ওষুধ এবং সবচেয়ে বেশি চেয়েছেন ছোট টর্চলাইট। নিজ উদ্যোগে এগিয়ে আসা উদ্ধারকারীরা আরও চাইছেন অক্সিজেন সি-লিন্ডার, হাইড্রোলিক রড কাটার, ড্রিল মেশিন ও সার্জিক্যাল মাস্ক।

৪২ বছরেও নাকি এসব ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আটকে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করার মতো প্রযুক্তি কিংবা দক্ষতা নেই আমাদের দেশে। ওদিকে বিজিএমইএর সাবেক-বর্তমান নেতারা বসেছেন টক শোতে। আর রাষ্ট্র ফের জাতীয় শোক দিবস আর জাতীয় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে এই হত্যাযজ্ঞকে সহনীয় করে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যেমন চালিয়েছিল তাজরীন ফ্যাশনসে সরকারি হিসাবে ১১১ জনের মৃত্যুর পর। উদ্ধারকাজে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা সীমাহীন। ২৪ এপ্রিল সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল, অথচ ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার আর সেনাবাহিনীর সদস্যরা কাজে যোগ দিয়েছেন বেলা দুইটার পর। সাধারণ মানুষ উদ্ধারকাজে নেমেছেন এর আগেই। গণজাগরণ মঞ্চে হাজারো মানুষ জড়ো হয়েছেন রক্ত দিতে। এই মানবিকতার প্রতি ভরসা রেখেই বলি, রাষ্ট্রীয় দায় ও দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। রাষ্ট্র কবে সেই দায়-দক্ষতা অর্জন করবে আর?

৪.

মিরপুরের সারাখা, মাইক্রো, তেজগাঁওয়ের ফিনিক্স, আশুলিয়ার স্পেকট্রাম, তাজরীন, সাভারের রানা প্লাজা-এগুলো একেকটি মৃত্যুকূপের নাম। যে মৃত্যুকূপের মালিকেরা শত শত শ্রমিক হত্যা করে নিরাপদে আছেন। বিল্ডিং কোডকে বুড়ো আঙুল দেখানো শ্রমিক হত্যাকারী এসব মৃত্যুকূপের মালিকদের ইনস্যুরেন্স পাকা। দলনির্বিশেষে সব সরকারই তাঁদের জামিনদার। ইতোমধ্যে বিতর্ক উঠে এসেছে, রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা স্থানীয় যুবলীগের নেতা কি না।

স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সেই বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবিসিকে দিয়েছেন দালান ভেঙে পড়ার হাস্যকর কারণ। এসব শোক প্রকাশ, বিতর্ক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য আসলে ঘটনার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে খুনিকে পালানোর পথ করে দেওয়ার উদ্যোগ। ফাটল ধরা দালানটির মালিককে বাঁচানোর তোড়জোড় চলছে। রাজউক মামলা করেছে ইমারত আইনের ১২ ধারায়, যার সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা।

হায়! এ পর্যন্ত জানা তিন শতাধিক শ্রমিক হত্যাকাণ্ডের শাস্তি কি তবে এতটুকুই? অথচ আমাদের ফৌজদারি কার্যবিধিতে একজনকে খুন করলেই তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। পুলিশের মামলায় হত্যার অভিযোগ বলা হলেও সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো সুনির্দিষ্ট করা হয়নি, বিশেষ করে জমি ও ভবন উভয়েরই মালিক কাগজপত্রে সোহেল রানার বাবা আবদুল খালেক। মামলায় তাঁকে আসামি না করলে মামলা চলাকালে বিজ্ঞ উকিল খুব সহজেই আদালতে প্রমাণ করে দিতে পারবেন, মামলায় গলদ আছে, সোহেল রানা ভবনের মালিক নন, ওই ভবনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই ছিল না। হয়তো পুলিশকে ভর্ৎসনাও করা হবে ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে এত ভয়াবহ এক ট্র্যাজেডির বিচার করা গেল না বলে, যেমন বলা হয়েছিল সিমির আত্মহত্যার রায়ে।

স্পেকট্রামের শাহরিয়ার, ফিনিক্সের দীন মোহাম্মদ, তাজরীন ফ্যাশনসের দেলোয়ার- কারও কিছু হয়নি। পার পেয়ে যাবেন রানা প্লাজায় যে চারটি গার্মেন্টস ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে শ্রমিকদের কাজে ঢুকতে বাধ্য করেছেন, সেই সব মালিক- মাহবুবুর রহমান, বজলুস সামাদ আদনান, মো. আমিনুল ইসলাম ও মো. আনিসুর রহমান।

মৃত শ্রমিকের সংখ্যা ১১১ হোক বা হোক ২৮১ কিংবা ৩০০ বা ৫০০, কেটে ফেলা হোক হাত কিংবা উড়ে যাক পা- বি-জিএমইএ কিংবা মালিকপক্ষ বা রাষ্ট্র কিংবা আমরা কিছুই করিনি কোনো দিন। আসলে সংখ্যা বৈ মানুষ তো মনে করিনি এসব শ্রমিককে আজও। শুধু তাঁদের শ্রমের মুনাফায় স্ফীত আমাদের অর্থনীতি, আমাদের জীবন।

নূপুর পরা নিথর 'পা' আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একমাত্র কার্যকর প্রতিবাদ। আমরা কি এই প্রতিবাদের ভাষা বুঝতে পারছি? রাষ্ট্র কি এবারও এই গণহত্যার বিচার করবে না? না করলে আমরা কী করব, ভেবেছি কি কিছু?

ড. কাবেরী গায়েন: *শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

সূত্র: প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল ২০১৩

ভবনধস এড়াতে যা যা করা দরকার

মো. আলী আকবর মল্লিক

একটি শোক ভুলতে না-ভুলতে ঘটে আরেকটি শোকের ঘটনা। সাভারের রানা প্লাজা ধসের ঘটনায় গোটা দেশ শোকার্ত এখন।

সংবাদমাধ্যম থেকে যতটা জানতে পেরেছি, ওই জমিতে ছয়তলা ভবন নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিল সাভার পৌরসভা। রাজউকের কাছে না পাঠিয়ে সাভার পৌরসভা ভবন নির্মাণের অনুমতি দিয়ে যেমন একটি অন্যায় করেছে, তেমনি ছয়তলা ভবনের অনুমতি পেয়ে মালিক নয়তলা ভবন নির্মাণ করে আরেকটি অন্যায় করেছেন। কিন্তু যেসব প্রশ্ন এখনো তোলা হয়নি তা হলো:

১. ভবনটি নির্মাণের জন্য যে জলাশয়টি ভরাট করা হয়েছিল, তা ভরাট করা কি বৈধ ছিল? ঢাকা ও তার আশপাশসহ দেশের যেকোনো এলাকার যেকোনো জলাশয়, পুকুর, খাল-বিল যে কেউ ইচ্ছা করলেই কি ভরাট করতে পারে? ২. ভবনটির নকশা কি কোনো নির্ভরযোগ্য স্থপতি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল? করা হয়ে থাকলে সেই স্থপতি কি জানতেন যে এই ভবনটি তৈরি পোশাক কারখানার কাজে ব্যবহৃত হবে? ৩. ভবনটির কাঠামোর ডিজাইন নির্ভরযোগ্য কোনো কাঠামো প্রকৌশলীকে দিয়ে করানো হয়েছিল কি? করা হয়ে থাকলে তিনি কি জানতেন যে এই ভবনটি তৈরি পোশাক কারখানার কাজে ব্যবহৃত হবে? সাধারণ শপিংমল আর ফ্যাক্টরির ডিজাইন এক নয়। ৪. ভবনটির নির্মাণকাজে ব্যবহৃত কংক্রিট ও রডের মান নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল কি? আপাতদৃষ্টিতে রানা প্লাজা নির্মাণে ব্যবহৃত কংক্রিট নিম্নমানের মনে হয়েছে। তদন্ত কমিটির উচিত হবে কংক্রিট ও রডের পরীক্ষা করে দেখা। ৫. ভবন নির্মাণে ওয়ার্কিং ড্রয়িং যদি তৈরি করা হয়ে থাকে তবে নির্মাণকাজ (ওয়ার্কম্যানশিপ) সেই ওয়ার্কিং ড্রয়িং অনুসারে করা হয়েছিল কি? ৬. ভবনটির নির্মাণ কোনো প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে হয়েছিল কি? নাকি রাজমিস্ত্রির হাতই ছিল যথেষ্ট (সাধারণত এ দেশে যা হয়ে থাকে)?

রানা প্লাজা ধসে যে স্যান্ডউইচ আকার ধারণ করেছে, তার মধ্যে ওপরের অনেক প্রশ্নের উত্তর আছে। ব্যক্তিমালিকানায় কেউ ভবন নির্মাণ করলে নির্ভরযোগ্য স্থপতি, কাঠামো প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ প্রকৌশলী ও প্লাম্বার বিশেষজ্ঞদের পেছনে মালিকের অর্থ খরচে প্রবল অনীহা। অথচ তাঁদের পরামর্শ নিয়ে এবং সদিচ্ছার সঙ্গে কাজটি করলে অনেক ক্ষেত্রে অর্থের সাশ্রয় করা এবং এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানো সম্ভব। অনেক মালিক মনে করেন, রাজমিস্ত্রিই যথেষ্ট। এর আসল কারণ ভবন নির্মাণে কম অর্থ খরচ করতে চাওয়া। এটি ভবন-মালিকের মারাত্মক ভুল প্রবণতা, যার পরিণাম অনেক ক্ষেত্রে ভয়াবহ হতে পারে।

রানা প্লাজা একবারে ধসে না পড়ে দুই দিন আগেই সংকেত দিয়েছিল পিলারের ফাটলের মধ্য দিয়ে। অন্তত দুর্ঘটনা এড়ানোর মতো নমনীয়তা ভবনের কাঠামো দেখিয়েছে (সারভাইভাল লিমিট)। তখন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীদের দিয়ে সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো এবং তাঁদের পরামর্শমতো ব্যবস্থা নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। সেই সুযোগটি নষ্ট হয়েছে কিছু লোকের বাড়াবাড়ির কারণে এবং ধৈর্যের অভাবে। একজন সুশিক্ষিত মানুষও সব জ্ঞানের মালিক হতে পারেন না। হওয়ার প্রয়োজনও নেই। একজন এমবিবিএস চিকিৎসকের পক্ষেও ওপেন হার্ট সার্জারি সম্পর্কে মত দেওয়া ঠিক নয়, যদি তিনি একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন না হন। না জানা না বোঝা বিষয়ে বিজ্ঞের মতো মতামত দেওয়া বা নাক গলানো যে ঠিক নয় তার একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে এই রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি।

সাভারের স্পেকট্রাম, তেজগাঁও শিল্প এলাকায় ফিনিক্স ভবন এবং সাভারের রানা প্লাজা-এসবই ছিল কংক্রিটের কাঠামোর ওপর তৈরি নতুন ভবন। অথচ ভবনগুলো ধসে পড়তে ভূমিকম্প হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। এগুলোর সবই ঘটেছে ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি, নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার, নির্মাণকালীন অব্যবস্থার ফলে। ভবন তার নিজের ভর এবং ভবনে রাখা জিনিসপত্রের ভর বহন করতে অক্ষমতার কারণে ধসে পড়েছে। এমন কারণে যদি একটি দেশের একটি ভবনও ধসে পড়ে, তবে তা ওই দেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করে।

বাংলাদেশের নির্মাণশিল্পে কোনো জবাবদিহি নেই, যদিও দেশে ইমারত নির্মাণের বিধিমালা ১৯৯৩ তৈরি হয়েছিল এবং ২০০৬ সালে তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ঢাকা ও তার আশপাশ এলাকার ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়াসহ এর অভিভাবকত্ব করার দায়িত্ব রাজউকের। রাজউকের অনুমতি না নিয়ে যদি কেউ ভবন নির্মাণ করে, তাকে ধরার দায়িত্বও রাজউকের। রানা প্লাজা একটিমাত্র অমাবস্যার অন্ধকার রাতে নির্মিত হয়নি। নাকের ডগায় এত বড় একটি ভবন নির্মিত হলো বছরের পর বছর ধরে (নয়তলার নির্মাণকাজ চলমান ছিল) তখন রাজউক কী করেছে? রাজউক বলে থাকে, 'লোকবলের অভাব'। হাজার হাজার কোটি টাকার প্লট, ভবন, ফ্লাইওভার ইত্যাদি নির্মাণ করার কাজ করে যে রাজউক, তার লোকবলের অভাব হয় কেন? স্পেকট্রাম, ফিনিক্স, শাঁখারীবাজার, কলাবাগানসহ আরও এমন ঘটনা থেকে রাজউক কী শিক্ষা নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়ানোর জন্য কী পদক্ষেপ নিয়েছে? রাজউক কি কোনো ভবনের দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে রেট্রোফিটিং করার জন্য মালিককে পরামর্শ দিয়েছে? দরজা খোলা রেখে ঘুমানোর পরিণতি নিশ্চয়ই রাজউকের অজানা নয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের (আইইবি) একটি পুরকৌশল বিভাগ আছে। বিভাগটির উচিত হবে ভবন ধসে পড়া বা গার্ডার ধসে পড়ার মতো পুরকৌশলগত কাঠামোর দুর্ঘটনাগুলোর প্রকৌশলগত কারণ অনুসন্ধান করা। তাদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে কী করলে দুর্ঘটনাটি এড়ানো যেত, সে বিষয়ে প্রকৌশলীদের মধ্যে সচেতনতার লক্ষ্যে তা একটি বিশেষ সংখ্যার নিউজ লেটারের মাধ্যমে আইইবির সদস্যদের জানিয়ে দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে একই কারণে একই দুর্ঘটনা না ঘটে। শুধু রাজউকই নয়, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সদিচ্ছাই পারে এমন মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে।

স্পেকট্রাম, ফিনিক্স, র‍্যাংগস, রানা প্লাজা থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে, বাংলাদেশ ধসে পড়া ভবন থেকে উদ্ধারকাজ চালাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উদ্ধারকাজে ব্যবহার করার মতো প্রয়োজনীয় অনেক যন্ত্রপাতি সরঞ্জামও পর্যাপ্ত নেই। ধসে পড়া একটিমাত্র ভবন সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়। শুধু সরকারের ভাণ্ডারে নয়, সাধারণ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডারেও উদ্ধারকাজের জন্য যন্ত্রপাতি ও টুলস থাকা দরকার। তাই দেশের নেতৃস্থানীয় নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব মেশিন নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে শুল্কমুক্ত আমদানি করার সুযোগ দিলে ভালো হয়। উন্নত অনেক দেশে রিকন্ডিশন্ড মেশিনের বড় বড় নিলাম হয়, যেখান থেকে এ দেশের নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো কম দামে এসব মেশিন কিনতে পারবে। এসব মেশিনের পরিচয় ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোয় লিপিবদ্ধ থাকবে। সরকার কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় যখনই এ মেশিনগুলো প্রয়োজন মনে করবে, তখনই ওই কোম্পানিগুলো তা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

ভবন নির্মাণ বিধিমালা মানা হচ্ছে কি না, তা শুধু ওয়ার্কিং ড্রয়িং দেখে নয়, নির্মাণস্থল পরিদর্শন ছাড়া জানা সম্ভব নয়। নির্মাণস্থলও রাজউকের বিশেষজ্ঞ টিম দ্বারা ঝটিকা সফর করে নিয়ন্ত্রণ হওয়া দরকার। এ ব্যাপারে রাজউক উপযুক্ত পরামর্শক নিয়োগ করতে পারে। অভিভাবক রাজউক কর্তৃক ভবন নির্মাণকাজ নিয়ন্ত্রণই যদি না হয় তবে অদূরদর্শী ভবন-মালিকদের ভবন ধসে সাধারণ মানুষ মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারাবে, যা কারও কাম্য নয়।

ড. মো. আলী আকবর মল্লিক: *কাঠামো প্রকৌশলী, ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ এবং বাংলাদেশ আর্থকোয়েক সোসাইটির সাবেক মহাসচিব*

সূত্র: প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০১৩

আইন না মানার কারণেই এমনটি হয়েছে

মোবাশ্বের হোসেন

সাভার ট্র্যাজেডির আগের দিন ভবনের ক্ষতি চিহ্নিত করা হয়েছিল। হরতাল বা অন্য কোনো কারণে যদিও মালিক বা অন্যরা বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে পারেননি। একটি উল্লেখ করার মতো দিক হলো, যেখানে সাধারণ মানুষ এ ধরনের ঝুঁকির বিষয় আগে অনুধাবন করতেই পারেনি, সেখানে তারা নিজেরাই ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে ভবন থেকে মানুষজন বের করে দিল, যা আমাদের মতো পেশাজীবীদের দারুণ অনুপ্রাণিত করেছিল।

কিন্তু পরদিন সকালে ভবনধসের পর দেখা গেল, সেই ভবনে হাজার হাজার মানুষ ছিল। আগের রাতে যে ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলো, কোনো রকম বিশেষজ্ঞ মতামত না নিয়ে সেখানে হাজার হাজার মানুষকে কীভাবে ঢোকানো হলো? এটি আমাদের মর্মাহত করে।

পেশিভিত্তিক রাজনীতি, কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবাঞ্ছিত জ্ঞানদান দেখা গেল। একজন স্থপতি নিশ্চয় ক্যানসারের চিকিৎসা করতে পারেন না, সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মত দেওয়ার এখতিয়ার। কিন্তু এখানে দেখলাম, ইউএনও ইমারত-বিশেষজ্ঞের মতো মত দিচ্ছেন। এই অভ্যাসটা আমাদের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। কোনো বিষয়ে অজ্ঞ হয়েও সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মত দেওয়া। মূলত ইউএনও, ভবনমালিক বা কারখানার মালিকদের জন্যই এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে।

আমরা অহরহ বিজিএমইকে দোষারোপ করি তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য। কিন্তু সাভারের এ ঘটনায় সংগঠনটি কঠোর ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা সর্তকবার্তা দিয়ে বলেছিল, বুয়েটের বিশেষজ্ঞ মতামত না নিয়ে কারখানা চালু করা যাবে না। মালিকপক্ষ তা মানেনি। বিজিএমইএর তার সদস্যদের নির্দেশ মানানোর ক্ষমতা নেই। হতে পারে, সংগঠনটি সদস্যদের নির্দেশ দেওয়ার আস্থা বা বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি।

কিন্তু আমরা এর মাধ্যমে বিজিএমইএর পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে তাজরীনের ঘটনার পর। যদিও এটি তাদের মানসিক পরিবর্তন নয়। এই পরিবর্তন আনতে তারা বাধ্য হয়েছে নিজেদের বাঁচার স্বার্থেই। দেশে ও দেশের বাইরে নিজেদের ব্যবসা, মুনাফার প্রবাহ বজায় রাখার জন্য শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা জরুরি। সংগঠনটির প্রতি মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে, যার বহিঃপ্রকাশ সাধারণ শ্রমিকেরা বিজিএমইএ ভবনে হামলার মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

আমরা বিজিএমইএর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেছি। তাদের বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন করে আমরা অনেক সুপারিশ দিয়েছি। এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেক হ্রাস করা যেত। কিন্তু সংগঠনটি বাস্তবায়ন করেনি। তাদের তোড়জোড় দেখা যায় হতাহতের পর।

রানা প্লাজার মতো ভবন অহরহ নির্মিত হচ্ছে। আদৌ কি এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন নির্মাণ বন্ধ করা যাবে? কোনো কর্তৃপক্ষ আছে তা নিয়ন্ত্রণে? আজ থেকে ৪০ বছর আগেও বহুতল ভবন বলতে হাসপাতাল, সিনেমা হল, স্কুল বা কলেজের ভবনগুলোকেই দেখা যেত। দোতলার বেশি আবাসিক ভবন চোখে পড়ত না। বিশেষ করে স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। সঙ্গে বেড়ে যেতে থাকে বিশাল এলাকা নিয়ে গড়া বহুতল ভবন।

গার্মেন্টস কারখানা শুরু হয়েছিল আবাসিক এলাকায়, যা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। কারণ, গার্মেন্টসের কাঁচামাল অনেক স্পর্শকাতর বস্তু। **যেকোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে শ্রমিকদের বাঁচানোর ব্যবস্থা এসব ভবনে সাধার-**

ণত থাকে না। আমাদের দেশে এই অনিয়ম দ্রুতগতিতে বেড়ে গেছে। কারণ, গার্মেন্টস-শিল্পটি সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠেনি। শ্রমিক সংগ্রহ ও ব্যবসা যত দ্রুতগতিতে বেড়েছে, অবকাঠামো উন্নয়ন সেই গতিতে হয়নি। এই গতিশীল শিল্পটিতে কী ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তার জন্য কোনো পরিকল্পক, বিশেষজ্ঞ মত নেয়নি সরকার। এটা সরকারের অদূরদর্শিতা।

একটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয় কয়েকজন মানুষের জন্য। কিন্তু সেখানে কারখানা স্থাপন করলে যে সংখ্যায় মেশিন বসে বা শ্রমিক কাজ করেন, তা চিন্তা করে কিন্তু ভবনটি নির্মাণ করা হয়নি। এ ভবনটি তখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। কিছুদিন যেতেই নানা দুর্ঘটনা যখন এই ভবনগুলোয় দেখা গেল, তখন অনেকেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু আধুনিক ভবন নির্মাণ করলেন। কিন্তু আগের ভবনটি থেকে গেল। আমরা এই ভবনগুলো এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। আমরা বলেছি আবাসিক এলাকার বাইরে চলে যেতে। সরকার বা সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আমরা ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়ার কথা বলছি। আমরা সরকারকে অনুরোধ করেছি এই শিল্পগুলোকে বিভিন্ন জেলায় নিয়ে যেতে।

গার্মেন্টস কারখানায় দুর্ঘটনার মাত্রা ভয়াবহ। এটা নিয়ে রাজনীতি না করে উচিত প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া। শ্রমিকদের অগ্নিনির্বাপণের ব্যাপারে সচেতন শুধু নয়, তাদের একেকজনকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা দরকার। শুধু সরকার নয়, মালিকদেরও এ বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত। এভাবে দুর্ঘটনা ঘটতে থাকলে কিছুদিন পর আর গার্মেন্টসের মালিকেরা সমাজে নিজেদের পরিচয় দিতে পারবেন না।

এই ভবনটি যে ভেঙে গেল, তা কীভাবে তৈরি হলো, তার দেখভাল কে করল? ভবন নির্মাণসংক্রান্ত আমাদের কিছু আইন জানা থাকা দরকার। বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ২০১০ সালে ড্যাপের আওতায় ঢাকাসহ নারায়ণগঞ্জ, সাভার, টঙ্গী, গাজীপুর পৌরসভা সেই ক্ষমতা হারায়। এখন এই ক্ষমতা রাজউকের ওপর ন্যস্ত। এ আইন রাজউক বা সংশ্লিষ্ট পৌরসভা জানে, কিন্তু বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়নি। কিছু উপরি টাকা পাওয়ার আশায় অধিকারবহির্ভূতভাবে পৌরসভাগুলো বেআইনি অনুমোদন দিয়েছে। রাজউকের কাছে অনুমোদন নিতে ভোগান্তির অভিযোগ তোলা হয়। অন্যদিকে রাজউকের কথা, তাদের লোকবল নেই। যদি লোকবল না-ই থাকে, তবে কেন তারা এই দায়িত্ব নিল? বিশেষজ্ঞ মত ছাড়া এ ধরনের ভবন নির্মাণ বেআইনি।

এই ভবনটির অনুমোদন দিয়েছে সাভার পৌরসভা। সাভার পৌরসভায় বিশেষজ্ঞ কেউ আছেন বলে জানা নেই। রাজউকের চেয়ারম্যান মারফত জেনেছি, সাভার পৌরসভা পাঁচতলা নির্মাণের অনুমতি দেয়। কিন্তু মালিক দশতলা নির্মাণের ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। যত তলা নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হোক না কেন, সাভার পৌরসভার যেখানে অধিকারই নেই অনুমোদন দেওয়ার, সেখানে তারা কীভাবে এটা দিল? অবশ্যই এটি আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে করা হয়েছে।

আবার একজন প্রকৌশলী হলেই ভবন নির্মাণ করার অধিকার রাখেন না। কারণ, কাঠামো-প্রকৌশলী হতে হলে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে আসতে হয়।

এসব বিষয়ের দেখাশোনার দায়িত্ব এখন রাজউকের। গোড়ায় রাজউকের প্রধান দায়িত্ব ছিল ভবন নির্মাণ ঠিকভাবে হচ্ছে কি না, তার তদারকি করা। সেই সঙ্গে নগরে রাস্তা বা ভবন বানানোর তদারকিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে দেখলাম, জনতা টাওয়ার এরশাদ সাহেব কুক্ষিগত করতে রাজউককে ব্যবহার করেছিলেন। প্লট বা জমি পাওয়ার জন্য সব সরকারই রাজউককে ব্যবহার করছে। রাজউকের প্লট বা আবাসন-সুবিধার প্রকল্প থেকে সুশীল সমাজের অনেকেই সুবিধা নিয়েছেন।

সমস্যা এখানেই যে, একটি ভবনের নকশা বিখ্যাত কোনো প্রকৌশলীকে দিয়ে করানো হলো। কিন্তু নির্মাণের সময় যদি নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়, তখন দুর্ঘটনা নিশ্চিত। এই দায় কিন্তু নকশাকারী প্রকৌশলীর ওপর বর্তায় না। এ জন্য বাজারে প্রচলিত নির্মাণসামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। বাজারে যে রড, সিমেন্ট পাওয়া যায়, তার মান সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কতটুকু জানে? সরকারি মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বিএসটিআই কখনো স্টিল বা রড কারখানায় অভিযান চালিয়েছে বলে শুনিনি।

আবার সঠিক কাঁচামাল পেলেও তা যদি সঠিকভাবে মেশাতে না পারি, তাহলেও কিন্তু সমস্যা থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ ভবন নির্মাণের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ নজরদারি থাকতে হবে। শুধু কিছু অর্থ সাশ্রয়ের জন্য নিশ্চিত ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। সাভারের ভবনে দেখা যায়, বিম বা কলামগুলোর কংক্রিট সঠিকভাবে মেশানো হয়নি। আমার বিশ্বাস, সেখানে কোনো মিক্সচারযন্ত্র ব্যবহার করা হয়নি এবং সঠিক মাত্রায় কাঁচামাল মেশানো হয়নি।

এই কাজগুলো যাতে ভালোভাবে হয়, তার জন্য রাজউকের কাজ করা দরকার। প্রয়োজনে রাজউককে ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বের করে এনে সম্পূর্ণ তদারকি সংস্থা হিসেবে দাঁড় করাতে হবে। অথবা তদারকির কাজ পুরোপুরি নতুন কোনো সংস্থাকে দিতে হবে। তবে সরকারের হস্তক্ষেপ করা চলবে না। রাজউককে একটি স্বতন্ত্র নিয়ামক সংস্থা হিসেবে চলতে দিলেই এ ধরনের বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ সহজ যাবে।

মোবাশ্বের হোসেন: *সভাপতি, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট*

সূত্র: প্রথম আলো, ২৯ এপ্রিল ২০১৩

সাভার ট্র্যাজেডির পর দেশের রাজনীতিতে বিতর্ক ও ধাঁধা

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

৪৩ বছর আগের কথা। পাকিস্তানি জমানার শেষ বছর। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাস। সামনেই সেই ঐতিহাসিক নির্বাচন। শীতের মৌসুম। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাকৃতিক ঝড়-বন্যার কোনো আশঙ্কা নেই এই মৌসুমে। আর তখনই ইসরাফিল ফেরেশতা যেন তাঁর প্রচণ্ড প্রলয়ের বাঁশিটি বাজালেন। ভয়াবহ সাইক্লোন আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলবর্তী জেলাগুলোয় এক রাতে মারা গেল ১০ লাখ মানুষ।

শোকার্ত মানুষের আহাজারিতে সারা দেশের আকাশ-বাতাস ছেয়ে গিয়েছিল। আমি এ সময় ঢাকার অবজারভার হাউসের বাংলা দৈনিক পূর্বদেশে সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি। প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে সারাদেশের লণ্ডভণ্ড চেহারা দেখে 'পূর্বদেশের' **শোকসংখ্যায় একটি কবিতা লিখেছিলাম। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। এত দীর্ঘকাল পর গোটা কবিতা**টি মনে নেই, কিন্তু প্রথম ও শেষের কয়েক লাইন এখনো মনে আছে।

বাঁচতে চাইলে বাঁচবে এমন কথা তো নেই
প্রমাণ পেলে তো হাতে হাতে,
দশ লাখ শিশু-নারী ও পুরুষ আজকে নেই
মরে গেছে তারা এক রাতে।
এই কবিতার শেষের দু লাইন হচ্ছে-
শুধু শোকসভা তারই নাম আজ বাংলাদেশ
হায়রে বাংলা, তোমার শোকের নেইকো শেষ!

৪৩ বছর পর গত বুধবারের (২৪ এপ্রিল) সাভার ট্র্যাজেডির ধ্বংসযজ্ঞ, অগুন্তি মৃতদেহ আর শোকার্ত পরিবার-পরিজনের আহাজারি দেখে নিজের কবিতার কয়েকটি লাইনই আমার মনে পড়েছিল। সেই সঙ্গে মনে এই প্রশ্নটিও জেগেছিল, বাংলাদেশের কপালে নিত্যনিয়ত এত দুর্গতি কেন? প্রকৃতি আর মানুষ একযোগে কেন বাংলাদেশের শত্রুতা করে চলেছে? এই শত্রুতার কি কোনো অবসান নেই?

৪৩ বছর আগে সাইক্লোন আর টাইডাল ওয়েভে এক রাতে ১০ লাখ মানুষ মারা যাওয়ার কয়েক মাস পরই শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদারদের ববর গণহত্যা। তাতে নিহত হয় ৩০ লাখ নর-নারী। তারপর স্বাধীনতার গত ৪২ বছরে প্রকৃতি ও মানুষ দুয়ের হাতেই মানুষ নিধন অব্যাহত রয়েছে। ১৯৭৪ সালে শুধু অসৎ ব্যবসায়ী ও অসাধু রাজনীতিকদের চক্রান্তে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে মারা গেছে সরকারি হিসাবে এক লাখ মানুষ; বেসরকারি হিসাবে ছয় লাখ। মানুষের অবহেলা ও দুর্নীতির জন্য প্রতি বছর লঞ্চ ও সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় কয়েক হাজার মানুষের। রাজনৈতিক সন্ত্রাসে, বিশেষ করে এক সময়ের বামসন্ত্রাস ও পরবর্তীকালে জামায়াত, বাংলাভাই ও অন্য মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়েছে বলে একটি বেসরকারি হিসাবে বলা হয়েছে। এই নিহতদের মধ্যে দেশের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রয়েছেন।

প্রকৃতির হাতে তো বাংলাদেশ নিত্যনিয়ত মার খাচ্ছেই; সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে মানুষের হাতেই দেশের মানুষের অব্যাহত নিগ্রহ ও মৃত্যুবরণ। বিএনপি-জামায়াতের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসের সঙ্গে পুলিশের গুলিবর্ষণ যোগ হয়ে গত কয়েক মাসেও অসংখ্য লোকের মৃত্যু হয়েছে। ধন-সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ একটি বড় যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির সমান। এত মৃত্যু ও ধ্বংসের ধাক্কা না সামলাতেই সাভারের এই মনুষ্য সৃষ্ট ট্র্যাজেডি। যার ক্ষয়ক্ষতি দেশ কত দিনে সামলাবে, তা আমার জানা নেই।

এ পর্যন্ত সাভারের ধ্বংসস্তুপ থেকে প্রায় ৪০০-র মতো মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনো ৭০০-র মতো নর-নারী নিখোঁজ রয়েছে। এত দিনে তাদের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ধরে নেওয়া হলে মৃতের সংখ্যা হাজারে পৌঁছতে পারে। জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে দুই হাজারের বেশি নারী-পুরুষ। তাদের অধিকাংশই শরীরের বিভিন্ন অংশ হারিয়ে জীবন্মৃত। অনেকেই হয়তো মারা যাবে। এত বড় ট্র্যাজেডি ঘটার একটি বড় কারণ রানা প্লাজা নামক বহুতল ভবনটিতে ফাটল ধরায় সেটিকে বিপজ্জনক ঘোষণা করার পরও তাতে বিভিন্ন অফিস ও গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলোতে শ্রমিকদের আপত্তি সত্ত্বেও কাজ চালু রাখা। ফলে মানুষের লোভের বলি হলো কয়েক হাজার মানুষ। যার অধিকাংশই কর্মজীবী নারী। এই অপরাধ যুদ্ধাপরাধের সমতুল্য। একইভাবে এই অপরাধের বিচার ও কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত।

দুর্ঘটনা ঘটার পরপর রানা প্লাজার গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির একাধিক মালিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ভবনের মূল মালিক সোহেল রানা পালিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বয়ং তাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। তা সত্ত্বেও জাতির এত বড় মানবিক বিপর্যয়ের মুহূর্তেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য প্রচার চালানো হয় যে সোহেল রানা আওয়ামী লীগের লোক। প্রধানমন্ত্রী তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। রানাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে বাম মোর্চা, সিপিবি ও বাসদ ২ মে দেশে হরতাল ডেকে বসে। সঙ্গে সঙ্গে বিএনপিও একই দিনে হরতাল ডাকে। 'একেই নাচুনে বুড়ি, তার ওপর ঢোলের বাড়ি!' বিএনপি হয়তো ভেবেছিল, তাদের ডাকে তো হরতাল হয় না, হয় সন্ত্রাস। এবার বাম মোর্চার কাঁধে চেপে একটা সফল হরতালের নজির তারা দেখাবে। বাম মোর্চা ও সিপিবি-বাসদও সমস্যায় পড়ে গিয়েছিল। হরতাল ডেকে বিএনপি-জামায়াতের খপ্পরে তারা পড়ে গিয়েছিল।

এক্ষণে পলাতক সোহেল রানাকে পুলিশ যথাসময়ে গ্রেপ্তার করতে পারায় বাম মোর্চার মুশকিল আসান হয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের আলিঙ্গন তারা এড়াতে পেরেছে। অর্থাৎ হরতাল প্রত্যাহার করে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। তাদের ভুলটা (অন্যায় নয়) হয়েছিল, পলাতক সোহেল রানাকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকারকে সময় না দিয়েই হরতাল ডাকা। এটা একটা ট্র্যাজেডির সময় গোঁদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো। সাভার ট্র্যাজেডি দেশের অর্থনীতির ওপর যে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, তার ওপর তাড়াহুড়া করে হরতাল ডেকে আরো বিপর্যয় সৃষ্টি করা কোনো রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে না। পলাতক অভিযুক্ত বা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে সরকার সক্ষম হয় কি না, তা দেখার জন্য গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে হরতাল ডাকার জন্য বাম মোর্চা তথা সিপিবি-বাসদ দু-একটা দিন অপেক্ষা করলে ভালো করত। বিএনপি-জামায়াত তাহলে জনমতের ভয়ে এত শিগগির হরতাল ডাকার সাহস পেত না।

যা হোক, বামেদের তবু চৈতন্য ফিরেছে, তারা হরতাল প্রত্যাহার করেছে। কিন্তু বিএনপি এখনো (আমার এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত) তাদের হরতালের ডাক প্রত্যাহার করেনি। সম্ভবত করবে না। যদি করে ভালো। নইলে প্রমাণ হবে, বিপন্ন মানবতার প্রতি দরদের জন্য নয়, রাজনৈতিক গরজে এই হরতাল তারা ডেকেছে। তারা ভাবছে, সাভার ট্র্যাজেডিতে ক্ষুব্ধ মানুষ হরতালের ডাকে এবার তো সাড়া দেবেই। যদি না দেয়, দোসর আছে জামায়াত, ভাঙচুরের সন্ত্রাস দ্বারা জনজীবনে আরো দুর্ভোগ সৃষ্টি করা তো যাবেই।

রানা প্লাজার মালিক ধৃত সোহেল রানা আওয়ামী লীগ বা যুবলীগের কোনো নেতা-কর্মী কি না আমার জানা নেই। কিন্তু এটা নিয়ে কেন বিতর্ক সৃষ্টি হলো, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। এক শ্রেণীর মিডিয়া সাভার ট্র্যাজেডির মূল হোতাব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার বদলে তাদের আওয়ামী লীগার হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য কেন গলদঘর্ম হয়ে নেমেছে, তার ব্যাখ্যা কে দেবে? আর আওয়ামী লীগের নেতারাই বা কেন সোহেল রানা যে আওয়ামী লীগার (বা যুবলীগার) নয়, তা প্রমাণ করার জন্য এত সরব, তার কারণই বা কে দর্শাবে?

দেশ-বিদেশের অধিকাংশ বড় রাজনৈতিক দলের মধ্যেই দুর্বৃত্তদের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা চিহ্নিত হলে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। ব্যক্তির অপরাধের জন্য সমষ্টিগতভাবে কেউ কোনো রাজনৈতিক দলকে দায়ী করে না। ব্রিটেনে লেবার পার্টির নেতা ও মন্ত্রী জনস্টোন হাউস ব্যাংকের অর্থ তসরুফ ও নিজের পরিচয় জালিয়াতির যে গুরুতর অপরাধ করেছিলেন, অথবা কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ও মন্ত্রী জন প্রফুমো পতিতা ও বিদেশি গোয়েন্দা চক্রের সঙ্গে জড়িত হওয়ার যে অপরাধ করেছিলেন, তার জন্য লেবার পার্টি ও কনজারভেটিভ পার্টি বা সরকারকে কেউ দোষারোপ করেনি। দুই নেতাকেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর দুদলের সরকারই তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে।

বাংলাদেশে গোলাম আযমসহ যাদের বিচার চলছে, তাদের তো জামায়াত নেতা হিসেবে আটক করা হয়নি। করা হয়েছে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে। কোনো আওয়ামী লীগ নেতাও এই যুদ্ধাপরাধ করে থাকলে তাকেও আওয়ামী লীগার হিসেবে নয়, বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধীদের একই ক্যাটাগরিভুক্ত অপরাধী হিসেবে বিচার করতে হবে। সাভার ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রেও সোহেল রানা একজন আওয়ামী লীগার কি না, সে কথা বড় নয়। বড় হলো, তার মানবতাবিরোধী অপরাধ। এই অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে ও তার সমগোত্রীয় অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

সুতরাং রাজনৈতিক মতলব থেকে যারা তাকে আওয়ামী লীগার বলে প্রচার করতে চাইছে, অর্থাৎ সাভার ট্র্যাজেডির জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করতে চাইছে, তাদের প্রচারণার একটিই জবাব, কেন বিএনপি সরকারের আমলে কি এই ট্র্যাজেডি (হোক ছোট) ঘটেনি? ২০০৫ সালে স্পেকট্রাম নামে যে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির বাড়ি ধসে পড়ায় অসংখ্য শ্রমিকের মৃত্যু হয়, সেটির মালিক কি বিএনপির এক জাঁদরেল নেতার জামাই ছিলেন না? সেই দুর্ঘটনার দায়দায়িত্বও কি তাহলে বিএনপির ছিল?

সোহেল রানার দলীয় পরিচয় নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়া আওয়ামী লীগের মোটেই উচিত হয়নি। তাতে প্রচারণাটিতে তারা আরো সাহায্য জুগিয়েছে। আওয়ামী লীগের তো এই প্রচারণার জবাবে শুধু একটি কথা বলাই যথেষ্ট ছিল, সোহেল রানা আওয়ামী লীগ বা অন্য যেকোনো দলেরই লোক হোক না কেন, তাকে এখন একজন অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই অপরাধের জন্য তার বিচার হবে। এ ক্ষেত্রে তার দলীয় পরিচয় গৌণ।

সোহেল রানার দলীয় পরিচয় নিয়ে বিতর্কই প্রমাণ করে সাভার ট্র্যাজেডির মতো এত বড় জাতীয় দুর্যোগেও দেশের রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সুস্থ মানবিক চেতনাবোধের পরিচয় দেখাতে পারেনি। তাদের তুলনায় সাধারণ মানুষ, পেশা-নির্বিশেষে সব বয়সের নর-নারী ত্রাণকার্যে যে ঐক্য ও মানবতাবোধের পরিচয় দেখিয়েছেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। রক্তদানের জন্য বিপুল মানুষের স্বেচ্ছায় ছুটে আসা, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ তার প্রমাণ।

আমাদের সেনাবাহিনীও এবার এই ট্র্যাজেডি মোকাবিলা করার ব্যাপারে এবং উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে যে সাহস দেখিয়েছে, তা নিয়ে দেশের মানুষ গর্ব করতে পারে। সরকার যেমন এই ট্র্যাজেডি মোকাবিলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, তেমনি ফায়ার ব্রিগেড থেকে শুরু করে উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত বাহিনীগুলোও তাদের আন্তরিকতা ও সাহসের প্রমাণ দিতে দ্বিধা করেনি। প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে আহতদের পরিদর্শন করেছেন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সম্মিলিতভাবে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

লন্ডন, ২৯ এপ্রিল, সোমবার, ২০১৩

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী: *প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক*

সূত্র: কালের কণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল ২০১৩

জিএসপি, টিকফা ও গার্মেন্টস

আনু মুহাম্মদ

তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডে শতাধিক শ্রমিক আগুনে পুড়ে ছাই হওয়ার পর বাংলাদেশের গার্মেন্টস, বিশেষত এখানকার শ্রমিকদের জীবন ও কাজের নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা-সমালোচনা অনেক বৃদ্ধি পায়। এ ঘটনার পাঁচ মাসের মাথায়ই বিশ্বের ইতিহাসে গার্মেন্টস কারখানার সবচেয়ে ভয়ংকর বিপর্যয় যে বাংলাদেশেই ঘটবে, এটা কেউ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কেননা, সবারই ধারণা ছিল, তাজরীনের পর সরকার, বিজিএমইএ, মালিক, বায়ার ও ব্র্যান্ড–সবারই সতর্কতা তৈরি হবে। সবার ধারণা ভুল প্রমাণিত করে সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে, সারা দেশকে কাঁদিয়ে রানা প্লাজার ধস থেকে পাওয়া গেল এক হাজার ১২৭ শ্রমিকের লাশ, যাঁদের অধিকাংশ নারী। এখনো শত শত নিখোঁজ। আহত হাজারের বেশি। তার মধ্যে বহু আছেন অঙ্গ হারিয়ে প্রায় অচল। নিহত ব্যক্তিদের পরিবার ও জখম যাঁরা বেঁচে থাকলেন, তাঁদের জীবন নিষ্ঠুরতার এক নতুন পর্বে প্রবেশ করল। এ রকম মৃত্যুই বাংলাদেশের শ্রমিকদের জীবনের মূল আঘাত নয়। জীবনটা নিষ্ঠুর বলেই মৃত্যু এ রকম ভয়ংকর হয়।

এখন দায়দায়িত্ব, শাস্তি, ক্ষতিপূরণ নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনা হচ্ছে, সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যেই আরও জোরদার হয়েছে বাংলাদেশকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি-সুবিধা প্রত্যাহারের হুমকি, একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের টিকফা (ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্ট) চুক্তি স্বাক্ষরের চাপ। বর্তমান সময়ে এ বিষয়ে সারা দেশে প্রচলিত ও প্রচারিত উদ্বেগের সারকথা হলো, 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে দেওয়া জিএসপি-সুবিধা প্রত্যাহার করলে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে তার গার্মেন্টসের বিশাল বাজার হারাবে। এই বাজার রক্ষা করতে হবে। অতএব যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অতি তাড়াতাড়ি টিকফা চুক্তি সম্পাদন করা উচিত।' প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস হলো, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে অর্থ দেয়, খাদ্য দেয়, নানা রকম সুবিধা দেয়; নইলে বাংলাদেশ ডুবে মরত। তাই তার কথা অমান্য করা যাবে না। কিন্তু এসবের মধ্যে সত্যতা কতটুকু?

মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাণিজ্যবিষয়ক অফিসের ওয়েবসাইটে তাদের জিএসপি-সুবিধা সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: '১২৭টি সুবিধাভোগী দেশের থেকে আমদানি করা প্রায় পাঁচ হাজারটি পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য এই জিএসপি। এর অন্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমদানি করা পণ্যে মার্কিন সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করে মার্কিন নাগরিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।...জিএসপির অধীনে যেসব পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে, তার মধ্যে আছে: বহুরকম রসায়ন দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য, বিল্ডিং স্টোন, জুয়েলারি, বহু রকমের কার্পেট, এবং কিছু কৃষি ও মৎস্যজাত দ্রব্য। যেসব পণ্য জিএসপি শুল্কমুক্ত সুবিধাবহির্ভূত সেগুলোর মধ্যে আছে: বেশির ভাগ বস্ত্র ও পোশাকসামগ্রী, বেশিরভাগ জুতা, হাতব্যাগ ও ব্যাগ'।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস পণ্য সেই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি-সুবিধার বাইরে। বরং সে দেশে গড় আমদানি শুল্ক হার যেখানে শতকরা ১ ভাগের মতো, সেখানে বাংলাদেশের গার্মেন্টসের ওপর শুল্কহার শতকরা গড়ে ১৫ ভাগ, কোনো কোনো পণ্যে আরও বেশি। গত এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের গার্মেন্টস রপ্তানির প্রায় শতকরা ২৩ ভাগ গেছে, সেই হিসাবে এ বছরও বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে শুল্ক বাবদ প্রদান করেছে কমপক্ষে প্রায় পাঁচ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। এটা যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে ঋণ অনুদান নানাভাবে বাংলাদেশে আসে, তার ছয় গুণেরও বেশি। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে নয়, বাংলাদেশই যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থের জোগান দিচ্ছে প্রতিবছর! এবং যুক্তরাষ্ট্রই মুক্তবাজার নীতিমালা ভঙ্গ করে বাংলাদেশের গার্মেন্টসের ওপর বৈষম্যমূলক শুল্ক আরোপ করে রেখেছে!

অর্থাৎ প্রচারণা বা বিশ্বাস যা-ই থাকুক, তথ্য অনুযায়ী প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশে কোনো বিশেষ সুবিধা পায় না, বরং অন্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি শুল্ক দিয়ে বাংলাদেশকে সেখানকার বাজারে

প্রবেশ করতে হয়। নেপালের অভিজ্ঞতাও অভিন্ন। কেননা, নেপালও জিএসপি-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন সংস্থা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলও (আইএমএফ) বলছে, শিল্পায়িত দেশগুলোর বেশির ভাগ আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক কম থাকলেও কৃষি, শ্রমঘন পণ্য যেগুলো গরিব দেশ থেকে আসে, তার অনেকগুলোর ওপরই মার্কিন শুল্কহার অস্বাভাবিক রকম বেশি, গড় শুল্কহারের চেয়ে কখনো কখনো ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি। কাপড় ও জুতার ওপর আমদানি শুল্ক শতকরা ১১ থেকে ৪৮ ভাগ। বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের তুলনা করে আইএমএফই স্বীকার করছে যে, যে বছরে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ২৫০ কোটি মার্কিন ডলার পণ্য আমদানি বাবদ ৩৩ কোটি ডলার আমদানি শুল্ক আয় করল, সেই বছরেই সমপরিমাণ শুল্ক তারা ফ্রান্সের কাছ থেকে আয় করল ১২ গুণ বেশি। অর্থাৎ তিন হাজার কোটি ডলার পণ্য আমদানির জন্য।

অর্থাৎ ধনী দেশের তুলনায় বাংলাদেশকে ১০ থেকে ১২ গুণ বেশি শুল্ক দিতে হচ্ছে। এটাই বিশেষ সুবিধা!

যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন শ্রমিকের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলছে, টিকফা চুক্তির মধ্যেও এই বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশের গার্মেন্টসের ওপর আরোপিত উচ্চহারে শুল্ক কমিয়ে তাদের গড় শুল্কহারেরও সমান করে, তাতে যে পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে, তাতে ৪০ লাখ শ্রমিকের মজুরি তিন মাস অতিরিক্ত শোধ করেও নিরাপত্তাজনিত সব ব্যয় বহন সম্ভব হবে।

বলা হচ্ছে, টিকফা চুক্তি স্বাক্ষর হলে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কের উন্নতি হবে। বাংলাদেশের দিক থেকে এই উন্নতির অর্থ কী? বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চরম বৈষম্যমূলক ও সংরক্ষণবাদী শুল্কনীতি কি যুক্তরাষ্ট্র পরিবর্তন করবে? মার্কিন কোম্পানি শেভরনের কাছে মাগুরছড়ার গ্যাসসম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাংলাদেশের পাওনা ২০ হাজার কোটি টাকা কি শোধ করার ব্যবস্থা করবে? সব সামরিক-বেসামরিক চুক্তি কি জনগণের কাছে প্রকাশ করবে? না, এগুলোর বিষয়ে কোনো কথা নেই। কোনো সরকারের মুখে এই কথাটা কেন আসে না যে আমাদের বিশেষ সুবিধা দিতে হবে না। আন্তর্জাতিক রীতিনীতিবিরোধী বৈষম্যমূলক সংরক্ষণবাদী বাণিজ্য ব্যবস্থা বাতিল করো।

আরও প্রশ্ন হলো, বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থায় যেখানে বহুপক্ষীয় সংস্থা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আছে, সেখানে বিশ্বব্যবস্থার সর্দার যুক্তরাষ্ট্র কেন আলাদা করে চুক্তি করতে চায়? কারণ, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বৈঠকগুলোতে প্রায়ই বিভিন্ন দেশ জোটবদ্ধভাবে কাজ করে, এটা যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ নয়। অবশ্য আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের কোনো সরকারই ন্যায্য প্রশ্নে এমন কোনো শক্ত অবস্থান নেয়নি, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিন্দুমাত্র অস্বস্তি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের করপোরেট স্বার্থরক্ষায় সমর্থন দিতে বাংলাদেশের কোনো সরকার কখনো কার্পণ্য করেনি। তবে টিকফা কেন? কারণ, শক্ত হাতে সবদিক থেকে কোনো দেশকে ধরতে এই চুক্তি ভালো একটি অস্ত্র।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশে মেধা স্বত্বাধিকার প্রয়োগের চাপ থেকে কিছুদিন ছাড় পেয়েছে। ওষুধশিল্প তারই সুবিধাভোগী, কম্পিউটার ও আইটির বিস্তারও আন্তর্জাতিক এই যৌক্তিক বিধিমালার কারণেই ঘটতে পেরেছে। এখন টিকফা স্বাক্ষর হলে, এই চুক্তি যেহেতু অন্য সব আইনবিধির ঊর্ধ্বে, সুতরাং আন্তর্জাতিকভাবে প্রাপ্ত ছাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে মার্কিন কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর চেপে বসতে পারবে। এতে প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত হবে ওষুধশিল্প এবং আইটি বা তথ্যপ্রযুক্তিশিল্প। এ ছাড়া কৃষিক্ষেত্রেও বহুবিধ বিপদের আশঙ্কা। বাংলাদেশ জানে না কত কত বীজ, ফসল, গাছ, ফল, ফুল মেধাস্বত্ব জালে কোন কোন কোম্পানির মালিকানায় চলে গেছে। টিকফা সেই জাল বিস্তারেই আসছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কথা না শুনলে গার্মেন্টস বাজার হারানোর ভয় বহু দিন ধরেই ছড়ানো। আসলে বাংলাদেশের গার্মেন্টসে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ও সরকারের বিপুল পরিমাণ লাভ খেয়াল করলে এটা পরিষ্কার হবে যে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থেই কখনো বাংলাদেশের গার্মেন্টস থেকে সরে যাবে না। কারণ, তাতে মার্কিন বহু ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর বিশাল মুনাফার একটা বড় উৎস, সরকারের শুল্কের একটি ভালো উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। মার্কিন সরকার বা কোনো লবি তাই ইচ্ছা করলেও বাংলাদেশের গার্মেন্টস আমদানি বন্ধ করতে সক্ষম হবে না।

মার্কিন টিভি চ্যানেল সিএনএন 'ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল লেবার অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস'-এর গবেষণা থেকে হিসাব করে দেখিয়েছে, নিউইয়র্কে বাংলাদেশের পোশাক যে দামে বিক্রি হয়, তার শতকরা ৬০ ভাগই পায় সে দেশের বায়ার ও বিখ্যাত ব্র্যান্ড বিক্রেতারা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বাকি ৪০ ভাগের মধ্যে উৎপাদন প্যাকেজ ও পরিবহন খরচ এবং মালিকের মুনাফা অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকের মজুরি একেবারে তলায়, শতকরা ১ ভাগেরও কম।

এই বৈশ্বিক লোভনীয় বাণিজ্যে মুনাফার হার খুবই উঁচু। তারপরও ক্ষুধার শেষ নেই। আরও মুনাফার জন্য দেশের মালিক, বিদেশের ক্রেতা-বিক্রেতা সংস্থা সবাই নিরন্তর চেষ্টায় থাকে। তাদের অর্থ ও ক্ষমতা দুই-ই আছে। দেশের মধ্যে এই মুনাফায় ভাগীদার হয় বড় দল, মন্ত্রী, এমপি, পুলিশসহ অনেকেই। দেশি-বিদেশি সবার খাইয়ের পুরো চাপ পড়ে শ্রমিকদের ওপর। শুধু যে মজুরি নিম্নতম সীমায় চলে যায়, তা-ই নয়, প্রয়োজনীয় খরচ কমানোর কারণে জীবনের দামও তুচ্ছ হয়ে যায়। রানা প্লাজার মতো বাংলাদেশের আপাত জৌলুশ এ রকম চাপা দিয়ে রাখে লাখ লাখ শ্রমিকের বিবর্ণ ও পিষ্ট জীবন। বিশ্বজোড়া ছড়ানো মুনাফার জালেই তাঁরা আটকা। জিএসপি-ভীতি আর টিকফা নিয়ে নানা তৎপরতা সেই জালকে আরও কঠিন বানাতে উদ্যত।

আনু মুহাম্মদ: *অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

সূত্র: প্রথম আলো, ২৩ মে ২০১৩

এত লাশ, এর দায়িত্ব কার

আহমদ রফিক

চারদিকে লাশের গন্ধ, তবু সব লাশ দেখা যাচ্ছে না। মৃত্যুকূপের গহন আঁধার থেকে লাশ তুলে আনা কি সহজ কাজ? তবু দেশের বিবেকবান মানুষ, নানা শ্রেণীর মানুষ নিজের কথা না ভেবে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। 'যদি একটি প্রাণও আমার হাত ধরে বাঁচে, আমি ধন্য'- এমন ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে সাভারে ভবনধসে কয়েক হাজার গার্মেন্টকর্মীর জীবন-মরণ লড়াইয়ে অংশীদার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। মৃতের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে, বাড়ছে মানুষের ক্ষোভ। কাগজ, টিভি চ্যানেল, সভা-সমাবেশ, মিছিল, ব্যক্তিগত আলাপে সর্বত্র শুধু সাভার আর সাভার এবং অপরাধীর শাস্তির কথা।

ঘুরেফিরে দেশে-বিদেশে প্রশ্ন একটাই- এই ভয়াবহ মৃত্যুর দায় কার? এ ঘটনা বিশ্বজুড়ে সচেতন মানুষদের নাড়া দিয়েছে। আপাত রাজনৈতিক বিভেদ-ভিন্নতা কিছুক্ষণের জন্য হলেও মানবিক চেতনাকে ছাপিয়ে উঠছে না। বরং 'জীবন বড় মূল্যবান'- এই সত্যেরই প্রকাশ ঘটছে দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়ায়। বিবিসি, নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাগজে, অনলাইনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয়তে অভিযোগ, পোশাক শিল্প-কারখানার মালিকদের অবহেলার জন্যই এসব দুর্ঘটনা এবং পোশাককর্মীদের মৃত্যু ঘটছে বাংলাদেশে। শ্রমিকদের বেশির ভাগই আবার নারী। এদের জন্য সবচেয়ে জরুরি শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও নিরাপত্তার মান নিশ্চিত করা। প্রসংগত আরো বলা হয়েছে, ইউনিয়ন করতে গেলে এদের নানা ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, কখনো চাকরি হারানোর। এ উপলক্ষে নিহত শ্রমিকনেতা আমিনুল ইসলামের কথাও উল্লেখ করে নিউ ইয়র্ক টাইমস। পরিশেষে সরকারের প্রতি পরামর্শ, যাতে তারা শিল্প-কারখানায় অগ্নিনির্বাপণ ও ভবন নির্মাণবিষয়ক নিয়মাবলি পালনের ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নেয়।

ওয়াশিংটন পোস্ট ও বিবিসির পর্যালোচনা অধিকতর বাস্তবধর্মী। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও অর্থনীতিবিদরা একই সুরে বলছেন, পোশাকশিল্প বাংলাদেশের একটি বড়সড় অর্থনৈতিক স্তম্ভ। এই খাতে আঘাত পড়ার অর্থ দেশের অস্তিত্বর ওপর আঘাত। এ ক্ষেত্রে সরকারপক্ষের যেমন সতর্ক নজরদারি দরকার, তেমনি বিজিএমইএর মতো সংস্থাগুলোর পক্ষে দরকার অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি, কারখানাগুলো যথাযথভাবে নিয়মনীতি রক্ষা করে চলছে কি না, সেসব দেখা। আমাদের প্রশ্ন, সেসব দায়িত্ব তারা কতটা পালন করে থাকে। তারা বরং মালিকদের স্বার্থই দেখে, এমন অভিযোগ শুধু পোশাক শ্রমিকদের নয়, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবীমহলেরও। আমরা অবাক হই এ দেখে যে এ-জাতীয় দুর্ঘটনায় তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মালিকদের কথাই বলে থাকে। যেমন- সাভার দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে বিজিএমইএ সভাপতি গণমাধ্যমের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দুর্ঘটনা, ভবনধসের সচিত্র বিবরণ ফলাও করে প্রকাশ করেছে বলে এবং তাতে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঘটনার ধারবাহিকতা কি এ জন্য দায়ী নয়?

প্রসংগত একটি কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে তাজরীন ফ্যাশনস ও স্পেকট্রাম কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও ধসে মৃত্যুর জন্য দায়ীদের যথাযথ বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা হলে অঘটনের সংখ্যা কমে যেত। মালিকপক্ষ নির্ধারিত নিয়মকানুন মেনে চলতে অনেকটাই বাধ্য হতো। বরং এর উল্টোটিই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের নীতি একটা- সর্বনিম্ন খরচ, সর্বোচ্চ মুনাফা। অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা, কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তাব্যবস্থা, ভবন নির্মাণের নিয়মাবলি সঠিকভাবে পালন- কোনো কিছুই মালিকদের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে হয় না। ফলে একের পর এক দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে।

যাঁরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার 'নোট' রাখেন, তাঁদের মনে থাকার কথা, ২০১২ সালে তাজরীন ফ্যাশনসের অগ্নিকাণ্ডে সরকারি হিসাবে ১১২ জন শ্রমিকের বীভৎস মৃত্যুর ঘটনা এবং ২০০৫ সালে এই সাভারেই স্পেকট্রাম গার্মেন্টের

ভবনধসে মৃতের সংখ্যা ছিল ৭৭। এতগুলো মৃত্যুর কী ক্ষতিপূরণ, কী বিচার হয়েছে- তা আমাদের জানা নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, মালিকের মুনাফার বিনিময়ে পোশাক শ্রমিকরা কি প্রাণ দিতে আসে?

গত বছরে সংঘটিত আশুলিয়ার ঘটনায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। বিদেশে পোশাকশিল্পের ভাবমূর্তি ও সুযোগ-সুবিধার ওপর আঘাত পড়েছিল। এরপরও মালিক বা পোশাক শিল্পসংস্থা- কারোই শিল্পব্যবস্থার আদর্শ মান নিয়ে কোনো মাথাব্যথা দেখা যায়নি। সংস্থার পক্ষে কঠোর পর্যবেক্ষণব্যবস্থা থাকলে কি এভাবে এক এক করে কারখানা ভবনে ধস নামতে পারে? সেই সঙ্গে পোশাকশিল্পের অর্থনীতিই বা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? আর প্রায়শ অগ্নিকাণ্ড?

এবারের পরিস্থিতি তো ভয়াবহ বললে যথেষ্ট নয়, বলতে হয় দুঃস্বপ্ন। ইতোমধ্যে মৃতের সংখ্যা ৪৩১-এ পৌঁছেছে। কে জানে, উদ্ধারকাজ শেষে এই সংখ্যা কত শয়ে পৌঁছবে। আর যাঁরা আহত, মৃত্যুর অববাহিকায় এই মুহূর্তে তাঁদের কথা কারো ভাবার সময় নেই। কারণ লাশের গন্ধে আবহাওয়া প্রেতপুরীর মতো। অথচ এই আহতদের অনেকে হয়তো চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যাবেন, কর্মক্ষম থাকবেন না। তাঁদের পরিবারের তখন কী হবে? কে তাঁদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে? কিছু টাকা যদি ক্ষতিপূরণে মেলে, তাতে কি বাকি জীবন চলবে? সমস্যার এই মানবিক দিকটিতেও আমাদের নজর দেওয়া উচিত। তাঁদের জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে হবে? কে দেবেন? অবশ্যই কারখানার মালিকরা। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থাও।

সাভারে রানা প্লাজার ভবনধস প্রসঙ্গে স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনের মন্তব্য, এটা 'ম্যানমেড দুর্যোগ'। তাই যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে দায়ী ব্যক্তিদের যুক্তিসংগত শাস্তি হওয়া উচিত। তবে দায় কার- এই প্রশ্নের জবাব যথেষ্ট জটিল। ভবনের মালিক, রাজউক বা পৌর প্রশাসন এবং অনুরূপ সংস্থার দায়দায়িত্ব নিয়ে স্বচ্ছতার অভাব ও জটিলতা যত বাড়বে, ন্যায়বিচার ও শাস্তির সম্ভাবনা ততই অনিশ্চিত হতে থাকবে। এমনটাই সাধারণত ঘটে। এবার অন্তত আমরা চাই ঘটনার দ্রুত, স্বচ্ছ, যুক্তিসংগত নিষ্পত্তি। আর একটি ভবনও যেন ধসে না পড়ে, না ঘটায় এমন অসহ্য মৃত্যু।

এসব ঘটনায় একটি বিষয় অন্তত স্পষ্ট দেখা যায় ভবন নির্মাণসহ একাধিক বিষয়ে নিয়মকানুন ও আইন না মানার প্রবণতা। যে জন্য দেখা যায়, চার তলার ভিত্তির ওপর কখনো ছয়-সাত তলা ভবন নির্মাণ আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অন্যদিকে রয়েছে শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে চরম অবহেলা। তাজরীন দুর্ঘটনার পর বহুসূত্রে বলা হয়েছিল, বহুতল ভবনের পোশাক কারখানায় যেন বহির্গমনের জন্য একাধিক সিঁড়ি থাকে। বলা হয়েছিল, অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থা যেন যথাযথ হয়। প্রশ্ন- কতটা কী হয়েছে?

সবচেয়ে বিস্ময়কর যে ভবনে ফাটল দেখা দেওয়ার পর কেমন দুঃসাহসে রানা প্লাজার মালিক সেই মৃত্যুগুহায় কয়েক হাজার শ্রমিককে কাজ করতে আহ্বান জানান এবং নিজেও কিছু সময় সেখানে অবস্থান করেন। এতে নিরাপত্তাবিষয়ক চরম অবহেলার প্রকাশ ঘটেছে। সেই সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানহীনতাও। এ ধরনের বেপরোয়া মানসিকতা, জীবনের প্রতি চরম অশ্রদ্ধাই বুঝি বাংলাদেশে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই প্রতিদিন নানা উপলক্ষে এত খুন, এত নির্যাতন, সেই সঙ্গে অপচয়েরও অদ্ভুত প্রবণতা- শুধু অর্থবিলাসিতায়ই নয়, জীবন নিয়েও।

বাংলাদেশকে এই অবাঞ্ছিত মানসিকতা থেকে পরিচ্ছন্নভাবে বেরিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে সম্পন্ন ও বিত্তবান শ্রেণীর সদস্যদের, যাঁদের হাতের মুঠোয় ধরা আছে কোথাও ক্ষমতা, কোথাও বিত্ত, কোথাও প্রতাপ। যাঁরা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার কথা বলছেন, তাঁরা কী ভেবে দেখেছেন, গত কয়েক দশকে সংঘটিত ঘটনাবলি- জঙ্গিবাদ থেকে কারখানা খাতে সহিংসতা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কতটা নষ্ট করেছে এবং করে চলেছে? বিজিএমইএ কি কখনো জরিপ চালিয়ে দেখেছে, পোশাক কারখানার ভবনগুলো আইনসম্মত মানে তৈরি কি না কিংবা সেগুলোতে কর্মরত লাখ লাখ শ্রমিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ঠিকঠাক আছে কি না?

এ প্রশ্নের জবাব আমরা দায়িত্বশীল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানতে চাই, যদিও জানি তাজরীন ফ্যাশনসের মতো এবারও আবেগের ঢেউ নেমে যাওয়ার পর আবার এই শ্রম পৃথিবী আগের নিয়মেই চলতে থাকবে, আবার ঘটবে ভবনধস বা অগ্নিকাণ্ড, আবারও শোকাবহ মৃত্যু; তারপর যথারীতি আবেগ, শোক ও মানবিক তৎপরতার ঘটনাবলি।

সব কিছু মিলে সময় এসেছে অথবা সময় অতিক্রান্ত হতে চলেছে সরকারপক্ষের কঠোর অবস্থান নেওয়ার। পোশাক খাতের অব্যবস্থাপনা দূর করতে সংকল্পবদ্ধ হওয়া, পোশাকশিল্প সংস্থার ওপর খবরদারি নিশ্চিত করা, যাতে তাদের পক্ষে কাজের কাজ নিশ্চিত হয়। আর দেরি নয়। ইতোমধ্যে রানা প্লাজার মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁকে যেন যুক্তিসংগত বিচারের আওতায় আনা হয়।

এই শোকাবহ ঘটনার একটি বড় ইতিবাচক দিক এ ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের, বিশেষ করে তরুণদের মানবিক সেবায়, উদ্ধারের কাজে অভাবিত, অযাচিত সাড়া, গণজাগরণ মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক দল, সর্বোপরি এনাম হাসপাতালের ইতিবাচক ভূমিকা। বাংলাদেশ এখনো তাহলে 'অমানবিক' পর্যায়ে পৌঁছেনি- এটাই বড় শুভ লক্ষণ।

আহমদ রফিক: *কবি, গবেষক ও ভাষাসংগ্রামী*

সূত্র: কালের কণ্ঠ, ৩ মে ২০১৩

মানুষকে ফুঁসে উঠতে হবে

হাসান ফেরদৌস

'বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের জন্য বেঁচে থাকার পথ খুব বেশি নেই, কিন্তু মরার পথ বিস্তর। বহুতল ভবনধসে জীবন্ত সমাধি তার একটি।' মন্তব্যটি মার্কিন সাংবাদিক মিশেল চেনের। ইন দিজ টাইমস সাপ্তাহিকে সাভারের রানা প্লাজায় ছয় শতাধিক পোশাকশ্রমিকের নির্মম মৃত্যু প্রসঙ্গে তাঁর এই মন্তব্য।

মোটেই ভুল কিছু তিনি বলেননি। বাংলাদেশের গরিব শ্রমিক দুমুঠো অন্ন জুটবে এই আশায় মৃত্যুর সঙ্গে বাজি রেখে এসব পোশাক কারখানায় কাজ নেন। তাঁদের গড়পড়তা আয় মাত্র ৪০ ডলার। যে জামা বা প্যান্ট তাঁদের হাতে তৈরি হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট স্টোরে বিক্রির জন্য আসে, তার প্রতিটির দাম অনেক ক্ষেত্রেই ৪০ ডলারের বেশি বৈ কম নয়। বাংলাদেশ যে এখন মাঝারি আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, তা এই পোশাকশ্রমিকদের দুর্বল কাঁধে বন্দুক ঠেকিয়েই। অথচ তাঁদের জীবনের নিরাপত্তার মতো মৌলিক অধিকারটুকু আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি। পোশাকমালিকদের একটাই লক্ষ্য–আরও বেশি মুনাফা। শ্রমিককে যত কম বেতন দেওয়া যায়, তাঁদের দেখভালে যত কম ব্যয় করা যায়, লাভের বখরা তত বেশি। অন্যদিকে সরকার ভাবছে, শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিস্তর আইন করা হয়েছে। অতএব তাদের দায়দায়িত্ব শেষ।

বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ হাজার পোশাক কারখানা আছে, যার অধিকাংশই কোনো না-কোনোভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন। এই তথ্যটি দিয়েছেন মার্কিন ভাষ্যকার ও নাগরিক অধিকারকর্মী স্কট নোভা। গত সপ্তাহে এ দেশের পাবলিক টেলিভিশন পিবিএসের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে স্কট জানিয়েছেন, এসব পোশাক কারখানা যেকোনো সময় ধসে পড়তে পারে, অগ্নিকাণ্ডসহ ছোট-বড় নানা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। সে কথা জানা সত্ত্বেও বাংলাদেশি পোশাকমালিকেরা বহাল তবিয়তে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার একটা বড় কারণ এখানে শ্রমিক অধিকার রক্ষার কোনো সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ পোশাক কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ। ফলে একজোট হয়ে শ্রমিকেরা তাঁদের নিরাপত্তাহীনতার প্রতিবাদ জানাবেন, তার সুযোগও কার্যত নেই। তা ছাড়া প্রতিবাদ করতে গেলে চাকরি খোয়ানোর ভয় আছে। ভয় আছে গুম-খুনের। আমিনুল ইসলাম নামের এক শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা দুই বছর আগে খুন হয়েছেন, এখন পর্যন্ত এর কোনো সুরাহা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত ঢাকা গিয়ে তার খোঁজখবর নিয়েছেন, তার পরও নয়।

এই পোশাকশিল্প আমাদের সোনার ডিম দেওয়া হাঁস। এ কথা জেনে আমাদের উচিত তাকে আদর-যত্নে লালন করা। কিন্তু ঈশপের গল্পের লোভী কৃষকের মতো আমাদের পোশাক কারখানার মালিকেরা সে হাঁসে ফাঁস বসিয়ে এখনই যতটা সম্ভব মাল হাতড়াতে চান। শ্রমিক মরুক তাতে ক্ষতি নেই, নগদ পাওনা এখনই চাই। তাঁদের সঙ্গে এককাট্টা হয়েছেন বিদেশি আমদানিকারকেরা। সবচেয়ে কম মূল্যে তৈরি পোশাক কেনা যায় বাংলাদেশেই। ফলে চীন, ভিয়েতনাম বা শ্রীলঙ্কা ছেড়ে তাঁরা ভিড় জমিয়েছেন বাংলাদেশে। কে মরল, কে বাঁচল, এ নিয়ে তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই। লাভের বখরা মিললেই হলো।

বিশ্বের প্রধান খুচরা বিক্রেতা ওয়াল-মার্ট। তারা বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের অন্যতম প্রধান আমদানিকারক। ওয়াল-মার্টের বিক্রি করা জামা-জুতায় বিদেশি শ্রমিকদের রক্তের দাগ রয়েছে–এই অভিযোগের মুখে নানারকম নামকাওয়াস্তে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা তারা ঘোষণা করেছে। যেসব কারখানার মালিক শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হবেন, তাঁদের কাছ থেকে কাপড় কেনা বন্ধ করে দেবে, এমন কথাও ওয়াল-মার্ট বলেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি এ দুই ক্ষেত্রে কি অগ্রগতি হয়েছে, তার খতিয়ান চেয়ে শেয়ারহোল্ডাররা দাবি তুললে ওয়াল-মার্ট সে দাবি কোনো আলোচনা ছাড়াই বাতিল করে দেয়। 'আমরা দুর্ঘটনা রোধে নানারকম ব্যবস্থা নিয়েছি, সে জন্য কারখানার মালিকদের বাড়তি অর্থও

ঋণ হিসেবে বরাদ্দ করেছি', এই ছিল ওয়াল-মার্টের যুক্তি। সেসব ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে বাংলাদেশে পোশাকশিল্প খাতে কী পরিবর্তন হয়েছে, তা নিয়ে ওয়াল-মার্টের শেয়ারহোল্ডাররা অতিরিক্ত তথ্য দাবি করে ভোটাভুটির দাবি তুলেছিলেন। ওয়াল-মার্টের ব্যবস্থাপনা পরিষদ সে দাবিও প্রত্যাখ্যান করেছে। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) কাছে অভিযোগ করা হলে তারা ওয়াল-মার্টের দাবিই সমর্থন করেছে। সব রসুনের গোড়াই যে এক জায়গায়!

নামকাওয়াস্তে **কাগুজে ব্যবস্থা গ্রহণের বদলে যা সবচেয়ে বেশি দরকার, তা হলো বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা পোশাক**-সামগ্রীর ক্রয়মূল্য বাড়ানো। অথচ সে পথে ওয়াল-মার্ট বা ওল্ড নেভির মতো প্রধান আমদানিকারকেরা এগোতে নারাজ। তবে যে কাজটিতে তারা টাকা ঢালতে দুই পায়ে খাড়া, তা হলো নিজেদের স্বার্থক্ষায় লবিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগ। উদ্দেশ্য, একদিকে সাধারণ ক্রেতাদের কাছে সত্য-মিথ্যা উগরে দেওয়া, অন্যদিকে আইনপ্রণেতারা যাতে কোনো নেতিবাচক ব্যবস্থা না নেন, তা নিশ্চিত করা। এসব লবিং গ্রুপের একটি হলো ওয়ার্ল্ডওয়াইড রেসপনসিবল অ্যাক্রেডিটেড প্রোডাকশন বা র‍্যাপ। এই সংগঠনের নিজস্ব দাবি অনুসারে তাদের কাজ হলো পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে মালিক ও আমদানিকারকদের কাছে সনদ বা সার্টিফিকেট দেওয়া। বিদেশি আমদানিকারকদের পক্ষ হয়েই তারা এই কাজটি করে থাকে। আগুন লাগলে বা ভবনধসের সম্মুখীন হলে কীভাবে জীবনরক্ষা সম্ভব, সে বিষয়ে আমদানিকারকদের অর্থানুকূল্যে শ্রমিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের কাজও তারা পালন করে থাকে। এই সংগঠনের প্রধান আভেডিস সেফেরিয়ান দাবি করেছেন, তাঁদের চেষ্টার ফলে বাংলাদেশের পোশাকশ্রমিকদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। শ্রমিকেরা এখন জানেন আগুন লাগলে কী করা উচিত, কী করলে তাঁরা বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। রানা প্লাজায় এমন দুর্ঘটনা তাহলে ঘটল কীভাবে–তার ব্যাখ্যায় র‍্যাপ জানিয়েছে, সেখানে যে পাঁচটি পোশাক কারখানা রয়েছে, তার মাত্র একটির জন্য তারা নিরাপত্তা সনদ দিয়েছিল, কিন্তু তার মেয়াদও ইতোমধ্যে ফুরিয়ে গেছে।

পিবিএসের যে অনুষ্ঠানের কথা গোড়াতে উল্লেখ করেছি, সেখানে বিদেশি আমদানিকারকদের পক্ষে ভদ্রলোকের সে সাফাই শুনে স্কট নোভা পাল্টা মন্তব্য করেছেন, মূল ভবনটাই যখন হুমকির সম্মুখীন, তখন আগুন থেকে বাঁচার পথ বাতলালে কী কাজ হবে? আগুন ডিঙিয়ে, ভেঙে পড়া ছাদ এড়িয়ে অক্ষত অবস্থায় হাজার হাজার শ্রমিক নিরাপদে বেরিয়ে আসবেন, তেমন প্রশিক্ষণ সম্ভবত এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

সবাই এ কথা মানেন, বাংলাদেশে ইমারতবিধি (বিল্ডিং কোড) বা শ্রমিক নিরাপত্তা বিষয়ে বিস্তর আইন রয়েছে। কিন্তু সে কেবল কাগুজে আইন। আইন মানতে বাধ্য করা যাঁদের দায়িত্ব, তাঁরা সবাই হয় নিজেরাই মালিক, অথবা মালিকপক্ষের পকেটে। বিদেশিরা সে কথা জানেন। তাই বাংলাদেশ সরকারের ওপর নির্ভর না করে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে বিভিন্ন নাগরিক অধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রচার-আন্দোলন শুরু হয়েছে। এদের মুখ্য দাবি দুটি। এক. শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা এবং ন্যূনতম বেতন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ কারখানা থেকে পণ্য আমদানি স্থগিত রাখতে হবে। দুই. নিরাপত্তা সুরক্ষার প্রশ্নে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও আমদানিকারকদের মধ্যে বর্তমানে যে ঐচ্ছিক চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা রয়েছে, তার জায়গায় আইনত প্রয়োগযোগ্য চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। তাদের এই আন্দোলনের ফলে চারদিকে এ নিয়ে কথা শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এ নিয়ে কথা উঠেছে, বিশেষ শুনানিও অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

এ তো গেল বিদেশের কথা। তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা করবে, আমাদের শ্রমিকদের স্বার্থ নয়। দেশের ভেতর আমরা নিজেরা কী করছি? শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে কারও কোনো মাথাব্যথা আছে কি? রপ্তানিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, এই যুক্তিতে পোশাক কারখানাই শ্রমিক ইউনিয়নের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। যুক্তি দেখানো হয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগ পেতে হলে এ ছাড়া অন্য পথ নেই। রাজনীতিবিদ বলুন, কি শ্রমিকনেতা বলুন, আমরা সবাই ৪০ বছর ধরে বাজার অর্থনীতির সরু রাস্তার মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছি। আমরা এখন চীনকেও টেক্কা দিই, এমন কথা বলে কেউ কেউ বুকে চাপড় দিচ্ছি। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত আগের সব রেকর্ড ভেঙে ফেলছে বলে দেশে-বিদেশে সেমিনার দিয়ে বেড়াচ্ছি। অথচ শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের মতো মৌলিক অধিকার কেড়ে নিয়ে দেশের সবচেয়ে অধিকারবঞ্চিত মানুষদের কার্যত মধ্যযুগীয় দাস বানিয়ে রেখেছি, এ নিয়ে কারও টুঁ শব্দ নেই। রাজনৈতিক দলের নয়, মূলধারার বুদ্ধিজীবীদেরও নয়।

মার্কিন নাগরিক অধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে, রানা প্লাজার ভবনে ফাটল ধরেছে, এ কথা শ্রমিকেরাই প্রথম জানান। তা সত্ত্বেও মালিকপক্ষের চাপের কারণে তাঁদের কাজে যোগ দিতে হয়। সেখানে কোনো শ্রমিক ইউনিয়ন থাকলে তারা এ ব্যাপারে মালিকপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারত। 'কিন্তু তেমন কোনো সংগঠন না থাকায় শ্রমিকেরা তাদের বিপদ ঠেকাতে পারেনি, কেবল সে বিপদের আগাম সংকেতটুকুই জানাতে পেরেছে।'

এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার। শুধু মুখের কথায়, পত্রিকায় কলাম লিখে, মোমবাতি জ্বালিয়ে সে পরিবর্তন হবে না। মানুষকে ফুঁসে উঠতে হবে।

হাসান ফেরদৌস: *প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক*

সূত্র: প্রথম আলো, ০৬ মে ২০১৩

শ্রমিকরা মরণফাঁদে

এ এম এম শওকত আলী

বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মারাত্মক পরিবেশে কাজ করছেন। তাঁদের অধিকাংশই কারখানার ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞাত নন। মালিকরা বিষয়টি হয়তো জানতে পারেন। তবে না-ও জানতে পারেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ এ বিষয়ে গবেষণালব্ধ কিছু তথ্য প্রকাশ করেছে। এ তথ্য অনুযায়ী ২০১২ সালে বিভিন্ন কারখানায় ৯০৬ শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। একই বছরে ১১০৬ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। ২০১০ সালে মৃত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭০৩। ২০১১ সালে এ সংখ্যা ছিল ৮৬৯। এসব পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করা সম্ভব, কর্মস্থলে শ্রমিকদের মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক শিল্পই শ্রমিকদের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এ শিল্প-কারখানায় ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগের (অভ্যন্তরীণ) অগ্নিদুর্ঘটনায় একাধিক কারখানার বহু শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছেন। তাজরীন ফ্যাশনসের ঘটনাটিই ছিল বহুল প্রচারিত। ২০১৩ সালের এপ্রিলে সাভারের রানা প্লাজা ধসের ঘটনা বর্তমানে বহুল আলোচিত। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, এ পর্যন্ত এ প্লাজায় অবস্থিত একাধিক তৈরি পোশাক কারখানায় পাঁচশরও বেশি শ্রমিক মারা গেছেন। আহত হবে হাজারেরও বেশি। নিখোঁজের সংখ্যাও হাজারেরও বেশি। উদ্ধারকাজ এখনো চলছে। রানা প্লাজা ধসের বিষয়ে চলমান বিতর্কের একাধিক বিষয় উল্লেখযোগ্য। এক. রাজনৈতিক, দুই. ভবন নির্মাণসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থার চরম ব্যর্থতা এবং তিন. উদ্ধারকাজের সফলতা। এ বিষয়গুলো আলোচনার দাবি রাখে।

প্রথমোক্ত বিষয়টি রাজনৈতিক বিতর্কের সঙ্গে যুক্ত। এর মূল কারণ কিছু সরকারি নীতিনির্ধারকের অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য, যা প্রধান বিরোধী দলসহ ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন সরকারি নীতিনির্ধারক রানা প্লাজা ধসের জন্য প্রধান বিরোধী জোটের হরতালকারীদের চিহ্নিত করেছেন। বলা হয়েছে, হরতাল সফল করার জন্য এদের কিছু কর্মী ভবনের কলাপসিবল দরজায় ধাক্কা দেওয়ার ফলেই ভবনটি ধসে পরে। উল্লেখ্য, অন্য একজন সরকারি নীতিনির্ধারক এ বক্তব্যকে নেহাত ছেলেমি (Childish) বলেই উক্তি করেছেন। লক্ষ্যণীয়, ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরেই ভবনধসের কারণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিরোধী দলের কিছু নেতা ভবনধসের বাস্তবতাবিবর্জিত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এ ছাড়া তরুণ প্রজন্মের ফেসবুকেও এ বক্তব্যের মুখরোচক সমালোচনাও এখনো অব্যাহত রয়েছে। কিছু পত্রিকায়ও সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিনির্ধারকের বক্তব্য ছিল বহুল সমালোচিত।

রাজনৈতিক বিতর্কের মূল উৎস রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা স্থানীয় যুবলীগের এক নেতা। স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা রানাকে সাভারের অন্যতম সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যের এ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রানা যে যুবদলের নেতা, তা অস্বীকার করে সংসদে বক্তব্য দিয়েছেন। এর বিপরীতে বিরোধী জোটভুক্ত এক দলের নেতা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে অসত্য বলে উল্লেখ করেন ও বক্তব্যটি প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান। তবে ভবনের মালিকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যদের প্রধানমন্ত্রী হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছেন ও গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন। পোশাক কারখানার কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও মূল হোতা সোহেল রানাকে ২৮ এপ্রিল র‍্যাব গ্রেপ্তার করতে সফল হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি ভবন, বিশেষ করে বহুতল ভবন নির্মাণের বিষয়ে সুনিয়ন্ত্রণের প্রচণ্ড অভাব বা চরম ব্যর্থতা। এ জন্য অধিকাংশ বিশ্লেষক রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেছেন। কারণ ঢাকা শহরসহ সাভার, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ এলাকা রাজউকের অধিভুক্ত। রাজউকের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা সার্বিকভাবে পৌরসভাকেই এ বিষয়ে দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে, আইন, বিধি ও বিল্ডিং কোড অনুযায়ী এসব এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কোনো সময়

নির্মাণসংক্রান্ত বিষয়ে রাজউকের দারস্থ না হয়ে নিজেরাই অনুমোদন দিয়ে থাকে। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীও নেই। এ ধরনের সমালোচনার বিরোধিতা করেছে বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট। এ সংস্থার স্থপতি মোবাশ্বের হোসেনের মতে, রাজউকের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ভবন নির্মাণসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা রাজউক পালন না করে জমির প্লট বরাদ্দসহ ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে অধিকতর আগ্রহী। এমনকি ঢাকা শহরের ত্রুটিপূর্ণ বহু ভবনের বিষয়ে রাজউক কার্যকর ভূমিকা পালনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। রাজউক এ বিষয়ে সব সময়ই বলেছে যে তার প্রয়োজনীয় জনবল নেই। রাজউকের ভূমিকা সম্পর্কে অন্যরা বলেছেন, ভবন নির্মাণের কোনো অনুমতি না নিয়ে থাকলে রাজউকের উচিত ছিল সংশ্লিষ্ট ভবন ভেঙে দেওয়া।

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বছর কয়েক আগে হাইকোর্ট একটি দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ নির্দেশনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল একটি পৃথক ভবন নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এ নির্দেশনা কোনো সরকার এ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করেনি; যা সুশাসনের অভাব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ বিষয়ে আরো উল্লেখ করা যায়, সার্বিকভাবে ভবন নির্মাণসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি বা আধাসরকারি সংস্থা ও শহরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনের কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদও ভবন নির্মাণের অনুমতি দিচ্ছে। অথচ তাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল নেই। সিটি করপোরেশন ও রাজউকের অধিক্ষেত্র নিয়েও রয়েছে অস্পষ্টতা। এসব ত্রুটিপূর্ণ আইন ও বিধির সংস্কার না করলে ভবনধসের ঘটনা ভবিষ্যতেও এড়ানো যাবে না। এ বিষয়ে সরকার অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জনস্বার্থ, বিশেষ করে শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একে অপরকে দোষারোপের বিতর্ক বন্ধ করা যাবে না। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে ভবনধসের বিষয়ে অন্যান্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ সংস্থাও দায় এড়াতে পারে না। এর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় প্রশাসন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, প্রধান কারখানা পরিদর্শক। স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ভূমিকা নিয়ে সরকারের এক মন্ত্রীই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। টিভি মিডিয়ায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি উক্তি করেছেন, ভবনে মাত্র দুটি ফাটল তিনি দেখেছেন। এটা যে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তা তিনি বলেননি। প্রধান কারখানা পরিদর্শক বা তাঁর কোনো প্রতিনিধি কখনো ধসে পড়া ভবনটি পরিদর্শন করেছেন কি না কেউ জানে না। এ দুজনসহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের ডিআইজিকে হাইকোর্ট তলব করেছেন। দেশব্যাপী সব ধরনের বহুমুখী নিয়ন্ত্রণ সংস্থার ব্যর্থতার চিত্র মিডিয়ায় বহুল আলোচিত। এর মধ্যে যানচলাচলসহ জনপথে মারাত্মক দুর্ঘটনার বিষয়টিও বহুল সমালোচিত। সড়ক ও জনপথে দুর্ঘটনায় যে বহুসংখ্যক যাত্রী মৃত্যুবরণ করেন তার পরিসংখ্যান ভীতিপ্রদ। অথচ পরিস্থিতির কোনো উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। সার্বিকভাবে বিভিন্ন সরকারি নিয়ন্ত্রণ সংস্থার ব্যর্থতা সুশাসনের অভাবই প্রমাণ করে। পোশাকশিল্পে এর আগে অগ্নিজনিত দুর্ঘটনাই বহুসংখ্যক শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ ছিল। ওসব ঘটনার অব্যবহিত পরেই ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তর সব ধরনের কারখানায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রয়েছে কি না তা পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করার ঘোষণাও দিয়েছিল। কিন্তু এ-সংক্রান্ত তথ্য এখনো কারো জানা নেই। সংসদেও এ বিষয় নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয়নি।

উদ্ধারকাজের সফলতা নিয়ে তেমন কোনো সমালোচনা হয়নি। প্রাথমিকভাবে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী ও স্থানীয় বহুসংখ্যক তরুণই অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে উদ্ধারকাজের অবিরাম প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হন। এর সঙ্গে যুক্ত আহত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও নিহতদের মরদেহ আত্মীয়স্বজনকে হস্তান্তর করা। স্বাস্থ্য পরিচর্যার কাজে স্থানীয় একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও অন্য কর্মীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এ বিষয়ে তাঁরা যে অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছেন, তা সবাই প্রশংসা করেছেন। সরকারি কোনো মেডিক্যাল টিম ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি। তবে এক পর্যায়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সার্বিক মনিটরিংয়ের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে।

স্থানীয়ভাবে মনিটরিংয়ের জন্য পুলিশসহ অন্যরা কাজ করেছেন। মূল কাজ ছিল আহতসহ নিহতদের সঠিক পরিসংখ্যান। এ-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান টিভি মিডিয়া অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে দেশবাসীকে দেখিয়েছে। এসব দৃশ্যের সঙ্গে একটি হৃদয়বিদারক চিত্রও ছিল দৃশ্যমান। শত শত নারী-পুরুষের আহাজারি। সবাই নিখোঁজ শ্রমিকদের ফটো হাতে নিয়ে দেখাচ্ছিলেন। চেষ্টা করছিলেন স্বজনদের যদি কোনো সন্ধান পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ধসে পড়া ভবনে কর্মরত এক হাজারেরও বেশি শ্রমিক বা অন্য কোনো ব্যক্তি এখনো নিখোঁজ। ২৯ এপ্রিলের এক সংবাদ অনুযায়ী উদ্ধারকাজের পঞ্চম দিনে চারজন উদ্ধার প্রক্রিয়ায় আহত হন। উদ্ধার প্রক্রিয়ায় ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার কেন করা হয়নি তা নিয়েও প্রশ্ন ছিল। তবে এর ব্যাখ্যাও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। উদ্ধারকর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জীবিত কিছু

ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁরা যাতে ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে আহত না হন সে জন্যই এগুলো প্রথম কয়েক দিন ব্যবহার করা হয়নি। এ যুক্তি সঠিক।

সরকার তাৎক্ষণিকভাবে আহত ও নিহতদের জন্য কিছু নগদ অনুদান দিলেও বিজিএমইএ থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। আহতদের মধ্যে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করবেন। তাঁদের কী হবে? স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাঁদের বিনামূল্যে যতদিন প্রয়োজন, ততদিন স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের অঙ্গীকার করেছেন। একজন বিরোধীদলীয় নেতা আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে আক্রান্ত সবাইকে ২০ লাখ টাকা করে সাহায্যের কথা বলেছেন। শর্তযুক্ত এ প্রতিশ্রুতি দুঃখজনক।

এ এম এম শওকত আলী: *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা*

সূত্র: কালের কণ্ঠ, ৫ মে ২০১৩

সাভারের ঘটনা গণহত্যার শামিল

সাক্ষাৎকার: জামিলুর রেজা চৌধুরী

সাভারের রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির কারণ খুঁজে বের করতে সরকার গঠিত চারটি তদন্ত কমিটি বিলুপ্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন বুয়েটের সাবেক ভিসি অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। দেশের স্থাপত্য শিক্ষার অন্যতম এই আলোর দিশারি একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাজউকসহ যেসব নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা আছে, রাজনৈতিক প্রভাবে তারা কাজ করতে পারে না। এ ছাড়া টাকা-পয়সার বিনিময়েও ভবন নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়। সাভারের ঘটনাকে গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত করে সারা দেশের ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি একক তদারকি সংস্থা গঠন করার তাগিদ দেন তিনি।

সুষ্ঠু স্থাপত্য স্বপ্নের 'ফেরিওয়ালা' জামিলুর রেজা চৌধুরী গত রবিবার তাঁর বর্তমান কর্মস্থল এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির কার্যালয়ে বসে কালের কণ্ঠকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি সাভারে রানা প্লাজার উদ্ধার অভিযান, উদ্ধারকাজে জাতিসংঘের কাছে সহায়তা চাওয়া, বিধি-বিধান না মানার কারণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

কালের কণ্ঠ : গত কয়েক বছরে অনেক ভবন ধসে পড়েছে। সব ক্ষেত্রেই মালিকের গাফিলতিকেই দায়ী করা হয়। মালিকের সঙ্গে আর কারা দায়ী?

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী : প্রায় ক্ষেত্রে মালিকের গাফিলতি আছে ঠিকই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী বা ঠিকাদাররাও এ ধরনের ভবন ধসের জন্য দায়ী। মালিক হয়তো চেষ্টা করেছেন সঠিকভাবে কাজটা শেষ করার। কিন্তু ডিজাইনারদের জ্ঞানের অভাব অনেক সময় ভবন ধসের জন্য দায়ী হতে পারে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সবচেয়ে আলোচিত ভবন ধস ছিল জগন্নাথ হল ধস। ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর জগন্নাথ হলের অডিটোরিয়াম ধসে পড়ে ৩৯ জন নিহত হয়। এদের প্রায় সবাই ছাত্র ছিল। ঘটনার পর দিনই একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন হয়। আমি সদস্য ছিলাম। কমিশন গঠনের পর দিনই কাজ শুরু করি। কারণ যত সময় যায় তত আলামত নষ্ট হয়। আমরা সেই তদন্তে ঠিকাদারের অবহেলা পেয়েছিলাম। তাকে দায়ী করা হয়েছিল।

কালের কণ্ঠ : 'ইমারত নির্মাণ বিধিমালা' না মানার কারণ কি? এটা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা কোথায়?

অধ্যাপক জামিলুর রেজা : ইমারত নির্মাণ বিধিমালা আইন নয়। আইন হচ্ছে 'ভবন নির্মাণ আইন ১৯৫২'। 'টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট' নামে একটি আইন রয়েছে। বিধিমালায় বলা হয়েছে, সব কিছুই বিল্ডিং কোড অনুযায়ী হবে। সেই বিল্ডিং কোডই কেউ মানে না। আইন না মানার কারণ হলো, আইন অমান্য করলে কোনো শাস্তি হয় না। রাজউকসহ যেসব নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা আছে রাজনৈতিক প্রভাবে তারা কাজ করতে পারে না। এ ছাড়া টাকা-পয়সার বিনিময়েও অনুমোদন দেওয়া হয়। তাহলে কেন মানুষ মানবে?

কালের কণ্ঠ : রাজউকের সমস্যা কোথায়?

জামিলুর রেজা : বিধিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব অনেক সংস্থার। ঢাকার জন্য রাজউক। এসব সংস্থা একটা প্রজ্ঞাপন দিয়ে গঠন করে দেওয়া হয়। কিন্তু সংস্থাগুলোকে দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে গড়ে তোলা হয় না। পর্যাপ্ত জনবল দেওয়া হয় না। যাদের দেওয়া হয় তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শিক্ষা থাকে না। তাই তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব

না। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলো সঠিকভাবে কাজ করলে বিল্ডিংয়ে সমস্যা থাকত না। রাজউকেরও পর্যাপ্ত লোক নেই। অনেক দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে। যদিও তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা আছে। রাজউক যখন ডিআইটি ছিল তখন বিল্ডিং ইন্সপেক্টর নামে একটি পদ ছিল। তাদের শিক্ষাগতযোগ্যতা ছিল ইন্টারমিডিয়েট পাস। সেই সময় একতলা দোতলা ভবন ছিল, সমস্যা হতো না। কিন্তু তাদের দিয়ে এখন আর সম্ভব না। কারণ হরদম হাইরাইজ ভবন হচ্ছে। এসব ভবনের ন্যূনতম কোয়ালিটি বুঝতে হলে যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। আমি যতটুকু জানি, রাজউক হওয়ার পরও তাদের শিক্ষাগতযোগ্যতা এখনো আগেরটাই রয়েছে। এভাবে তো চলে না। ছাড়পত্র দেওয়ার সময় সতর্ক হতে হবে। সরকার এসবে গুরুত্ব দেয় না। যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সেই পূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীকে তো খুব বেশি সক্রিয় দেখা যায়নি সাভারে। দু'একবার গেলেও তাঁর আরো বেশি উপস্থিত হওয়া দরকার ছিল। কারণ এটা তাঁরই কাজ। যার কাজ তাঁকে যোগ্যতার সঙ্গে করতে হবে।

কালের কণ্ঠ: আপনি বলছিলেন মানুষ বিধি মানে না। শতকরা কতজন মানুষ ইমারত নির্মাণ বিধিমালা মানে না বলে আপনার ধারণা?

জামিলুর রেজা: সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশের ৯০ ভাগ মানুষ বিধি না মেনে ভবন তৈরি করে। আমি মনে করি, প্রধানমন্ত্রীর এ মন্তব্য সঠিক। কারণ প্রকৌশলী হিসেবে নানা জায়গায় যাই। এ পেশার সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন জড়িত। আমাদের অনেক সুন্দর বিধি রয়েছে। সেটা মানলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ডিজাইনের সময় কেউ কেউ হয়তো মানেন। কিন্তু নির্মাণের সময় ডিজাইন থেকে সরে আসেন। স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়ার কথা কিন্তু তাঁরা আর যান না। মালিকরা রড কম দেন। ভবন ধসে পড়লে মালিকদের কোনো শাস্তি হয় না। বিধি মানলে দুর্ঘটনা হওয়ার কোনো কারণ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের হায়াত রেজিন্সি হোটেলে এ ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৮১ সালের সেই দুর্ঘটনায় ১১৪ জন মারা যায়। ইঞ্জিনিয়ারের একটা ছোট ভুলের জন্য এ ঘটনা ঘটেছিল।

কালের কণ্ঠ: সাভার পৌরসভা কি রানা প্লাজা নির্মাণের অনুমতি দিতে পারে? দিলেও ছয়তলার পরিকল্পনায় ৯ তলা করার পরও কর্তৃপক্ষ কেন নিশ্চুপ ছিল?

জামিলুর রেজা: ইমারত নির্মাণ বিধি অনুযায়ী পারে না। ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) অনুযায়ী রাজউক অনুমোদন দেবে। বর্তমানে ড্যাপ এলাকায় পুরো নিয়ন্ত্রণ করবে রাজউক। ২০০৮ সালে ড্যাপ হওয়ার পর দায়িত্ব রাজউকের। ড্যাপের আগে ডিএমডিপি ছিল। তাতেও পুরো এলাকার নিয়ন্ত্রণ ছিল রাজউকের হাতে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, যারা অনুমোদন দিয়েছে তাদের দেওয়ার কথা না। রানা প্লাজার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সাভার পৌরসভা থেকে। এক সময় তাদেরও দায়িত্ব ছিল। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড থেকেও অনুমোদন দেওয়া হতো। তাজরীনের অনুমোদন দিয়েছে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। এখন আর দিতে পারে না। এসব যে পৌরসভা বা বোর্ডের কাজ না তা রাজউক প্রচার করে না। তাদের এটা প্রচার করা দরকার। পৌরসভার একজন কর্মকর্তা বলেছেন, তাদের নাকি ডিজাইন দেখার কথা না। লে-আউট নিয়ে যাওয়ার পর তারা অনুমোদন দিয়েছে। তাদের এটা বলার সুযোগ নেই। কারণ ধাপে ধাপে অনুমোদন নিতে হয়। প্রথম ধাপ হচ্ছে মাটি পরীক্ষা। তারপর ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র। ছাড়পত্র দেওয়ার সময় জমি কী কাজে ব্যবহার হবে তা দেখতে হবে। এর পরের ধাপ হচ্ছে ডিজাইন। নির্মাণ শুরু হলে স্ট্রাকচারটি মাটির ওপর উঠে গেলে আবার অনুমোদন নিতে হবে। নির্মাণ শেষে ব্যবহার শুরু করার আগে আবার অনুমোদন নিতে হবে। এটাকে বলে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট। এটা পাওয়ার পরই মালিক ভবন ব্যবহার করতে পারে। এরপর এর শ্রেণী আর পরিবর্তন করা যাবে না। করতে হলে আবার অনুমোদনের প্রশ্ন রয়েছে।

সাভার পৌরসভা একে তো অন্যায়ভাবে অনুমোদন দিয়েছে, তার ওপর দায়িত্ব পালনেও ব্যর্থতা রয়েছে তাদের। কারণ তাদের চোখের সামনে রানা প্লাজা গড়ে উঠেছে সাভারের এমন একটা জায়গায়, তাঁরা যেখানে দিনে কয়েকবার করে গেছেন। তাঁরা ভবনের ভেতরেও গেছেন। তাঁদের চোখের সামনে ছয়তলা ৯ তলা হয়েছে। তাঁরা দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

কালের কণ্ঠ: ঘটনার আগের দিন একজন প্রকৌশলী ভবন দেখে বলেছিলেন, ১০০ বছরেও কিছু হবে না। আর যে প্রকৌশলী এটা নির্মাণের ডিজাইন করেছেন তাঁর দায় কিভাবে নিরূপণ হবে? আপনাদের পেশায় এর শাস্তি কী?

জামিলুর রেজা: সেই প্রকৌশলীর শাস্তি হওয়া উচিত। তাঁকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় শাস্তি বলা আছে। ১০০ বছরেও কিছু হবে না কথাটি ঠিক ছিল না। ভবনটি আগে থেকেই ভঙ্গুর দশায় ছিল। তার ওপর জেনারেটর চালানোর পর থেকে ভাইব্রেশনটা প্রকট হয়েছে। তখনই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে। আর যাঁরা ডিজাইন তৈরি করেছেন তাঁরাও দায় এড়াতে পারেন না। তাঁদের শাস্তিও নির্ধারিত।

কালের কণ্ঠ: ভবনের নকশা বা নির্মাণে কোনো ত্রুটি কি ছিল?

জামিলুর রেজা: নির্মাণসামগ্রীতে ত্রুটি ছিল। কংক্রিটের গুণগতমান নিম্ন ছিল। খোয়াগুলো সিমেন্ট থেকে আলাদা হয়ে গেছে। বিম আর রড অপ্রতুল মনে হয়েছে। মালিক খরচ বাঁচাতে এসব করেছেন।

কালের কণ্ঠ: সাভারে উদ্ধার অভিযানে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে তা কি যথাযথ ছিল? এ ধরনের উদ্ধার অভিযানের জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি কি দেশে আছে?

জামিলুর রেজা: কিছু কিছু জায়গায় যথাযথ যন্ত্রপাতিই ব্যবহার হয়েছে। তারপরও হাতুড়ি, ছেনি ব্যবহার করা উচিত হয়নি। অনেক জিনিস ব্যবহার করা হয়নি। লাইফ লোকেটর কংক্রিটের ভেতর দিয়ে গিয়ে প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে বের করে। ৩০ ফুট দূর থেকে এটা কাজ করে। এটা থাকলে এত প্রাণহানি হতো না। আরো কিছু যন্ত্রপাতি থাকলে ভালো হতো। সব যন্ত্রপাতি কেনা হয়নি। এক মন্ত্রীর আত্মীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের টেন্ডার পাননি বলে ঝামেলা হয়েছে। আর তখনই বলা হয়েছিল একবারে না কিনে দুই পর্বে বা তিন পর্বে কেনার।

কালের কণ্ঠ: একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এটা কি সহায়তা করবে না ঝামেলার সৃষ্টি করবে?

জামিলুর রেজা: চারটি তদন্ত দল গঠনের দরকার ছিল না। এখানে সরকারের সমন্বয়হীনতা রয়েছে। এসব কমিটি আসল ঘটনা খুঁজে পেতে সমস্যার সৃষ্টি করবে। ঘটনার সাক্ষী ঘুরেফিরে একই মুখ। তাঁরা সাক্ষী দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। বিরক্ত হয়ে পড়বেন। সব তদন্ত কমিটি বিলুপ্ত করে একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন করা উচিত, যেখানে কারিগরি জ্ঞানসমৃদ্ধরা থাকবেন। এভাবে করা হলেই তদন্তদল কাজে আসবে। অন্যথায় নয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে মূল তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়।

কালের কণ্ঠ: একটা বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনই কি যথেষ্ট? যদি সেই কমিশনের প্রতিবেদন আমলে না নেওয়া হয়? আপনি জগন্নাথ হল ট্র্যাজেডি কমিশনের কথা বলেছেন। সেই কমিশনের প্রতিবেদন কি প্রকাশ করা হয়েছিল বা কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?

জামিলুর রেজা: কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিবেদন গোপন করা আমাদের দেশের একটা খুব খারাপ সংস্কৃতি। এখানে গোপন করে কোনো লাভ হয় না। মানুষকে জানালে তারাও সতর্ক হতে পারে। কিন্তু সরকার উল্টো কাজটাই করে সব সময়। প্রতিবেদনটি লুকিয়ে ফেলা হয়।

জগন্নাথ হল ধসে পড়ার পর তৎকালীন রাষ্ট্রপতির নির্দেশে যে কমিশন গঠন করা হয় তার প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয়নি। কমিশনের প্রতিবেদন সরকারি প্রেসে ছাপা হয়েছে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ঘটনার সময় বিদেশে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি কমিশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির আগ্রহে যে কমিশন গঠন করা হয়েছিল তার প্রতিবেদনও আলোর মুখ দেখেনি। এই প্রতিবেদনের আলোকে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। খুবই দুঃখজনক।

কালের কণ্ঠ: রাজধানীতেই বিল্ডিং কোড মানা হয় না। জেলা, উপজেলা বা আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে কী হচ্ছে?

জামিলুর রেজা: ঢাকার বাইরের পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। বিদেশে কাজের সুবাদে দেশে অনেক টাকা আসছে। এখন গ্রামেও চার-পাঁচতলা ভবন দেখা যায়। এগুলোর কোনো অনুমোদন নেওয়া হয় না। এসব ভবনের তদারকি নেই।

কালের কণ্ঠ: এ অবস্থায় সরকার কী করতে পারে?

জামিলুর রেজা: সরকারের সামনে বিকল্প হলো আলাদা একটা একক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যে সংস্থা সারাদেশে তদারকি করবে। মহানগর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন- সব জায়গার ভবন তদারকি করবে। সেখানে যারা কাজ করবে তাদের যথ াযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে হবে। এতে সরকারের বেশি খরচ হবে না। কারণ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ফি পাওয়া যাবে। এটা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে করা যেতে পারে। এর চেয়ে বড় কথা হলো, মানুষের আইন মানার প্রবণতা থাকতে হবে। আইন না মানলে কোনো কিছুই হবে না।

কালের কণ্ঠ: সাভারের ঘটনার দিন শ্রমিকদের জোর করে ভবনে ঢোকানো হয়েছিল। এটা কিভাবে দেখছেন?

জামিলুর রেজা: এটা গণহত্যার শামিল। তারা ডেকে এনে জীবন কেড়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। মানুষকে জোর করে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেসব ঘটনার মিল রয়েছে। একটা খারাপ অবস্থার ভবনে ঢুকে কাজ করতে বাধ্য করা অত্যন্ত অমানবিক কাজ। এ ঘটনা তাদের জীবন কেড়ে নিয়েছে। এই গণহত্যার নায়কেরা ধরা পড়লেও আইনগত দুর্বলতার কারণে তারা বের হয়ে আসবে। ভবন মালিক রানা স্থানীয় এমপির আশীর্বাদপুষ্ট। তাদের কত দিন আর ধরে রাখা যাবে? কিছুদিন পর ঠিকই বের হয়ে আসবে।

কালের কণ্ঠ: বাংলাদেশ জাতিসংঘের সহায়তা নিতে পারত কি?

জামিলুর রেজা: অবশ্যই নিতে পারত। যেকোনো দুর্যোগে সহায়তা করার জন্য জাতিসংঘের একটি সংস্থা রয়েছে। সংস্থাটির নাম হচ্ছে-'ইন্টারন্যাশনাল সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অ্যাডভাইজরি গ্রুপ (আইএনএসএআরএজি)'। তারা সদস্য দেশে গিয়ে দুর্যোগের সময়ে উদ্ধার অভিযান চালায়। বাংলাদেশ এ সংস্থার সদস্য। বর্তমান সরকারের সময়েই এ সংস্থার সদস্য হয়েছে দেশ। সাভারে যেভাবে স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তা নেওয়া হয়েছে তাতে করে সময় বেশি লেগেছে। আইএন-এসএআরএজির সহায়তা নিলে এত সময় লাগত না। তাদের এসব উদ্ধার তৎপরতায় অনেক দক্ষতা রয়েছে। কলকাতায় তাদের একটি ইউনিট রয়েছে। তাদের সহায়তা নেওয়া দরকার ছিল। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর মাথায় আসেনি কেন বুঝলাম না। কয়েক ঘণ্টার নোটিশে তারা এসে উদ্ধার অভিযানে অংশ নিতে পারত। হয়তো অনেক আগেই উদ্ধার অভিযান শেষ হতো। খাদ্যমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক যখন দুর্যোগের দায়িত্বে ছিলেন তখন তিনি এ সংস্থার নানা বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। সংস্থাটিতে দেশের অনেক লোকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রয়োজনের সময় সেই সংস্থাটির কথা আমরা মনে রাখতে পারিনি।

ভবন নির্মাণের পাশাপাশি অগ্নি সার্ভিসের সার্টিফিকেট নিতে হবে। সাভারের তাজরীন ফ্যাশনসের স্ট্রাকচার ঠিক ছিল। ফায়ার সিস্টেম ঠিক ছিল না। বসুন্ধরার গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফায়ার নিয়ন্ত্রণের যে সুযোগ-সুবিধা থাকার কথা ছিল তা পাওয়া যায়নি। প্রতিটি ভবনের ফায়ার এটি ঠিক আছে কি না তা দেখতে হবে।

সাভারের ঘটনায় সবার দয়িত্ব নিরূপণ করা দরকার। ইউএনও, ভবন মালিক, স্থানীয় এমপি প্রত্যেকের কী করা উচিত ছিল, আর কী করেছেন তা বের করা দরকার। ঘটনাটি প্রশাসনিকভাবেও খতিয়ে দেখা উচিত।

সূত্র: কালের কণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল, ২০১৩

সাভারের ভবনধস 'ম্যান-মেড' দুর্যোগ

সাক্ষাৎকার : স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন

সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর নাগরিক নিরাপত্তার বিষয়টিই এখন প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। রানা প্লাজা ধসে যাওয়া ও রাজধানীর দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে কালের কণ্ঠের মুখোমুখি হয়েছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টের সভাপতি স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আলী হাবিব

কালের কণ্ঠ: সাভারের রানা প্লাজা ধসের ঘটনা ঘটল কেন? স্থপতি হিসেবে আপনার কী মনে হয়?

মোবাশ্বের হোসেন: এ ধরনের ধস তো আরো অনেক বেশি ঘটার কথা। আমি একজন স্থপতি হিসেবে মনে করি, এ ধরনের ধস অনেক কমই ঘটেছে। প্রকৃতি বোধহয় আমাদের অনেক বেশি করুণা করেছে। রেহাই দিয়েছে। আমাদের সে জন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই ধস শব্দটা এসেছে, এর কারণ একটি বড় ভবন ভেঙে পড়েছে। একটি একতলা কিংবা দোতলা ভবন ভেঙে পড়লে সেটাকে ধস বলা হতো না।

স্বাধীনতা আমাদের যে স্বপ্নের দুয়ার খুলে দিয়েছে, ওপরে ওঠার সিঁড়ি দিয়েছে, সেই সিঁড়িটাকে আমরা যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারি, তাহলে যে দুর্ঘটনা ঘটার কথা, তাই ঘটেছে। একটি উন্নয়নশীল দেশ যখন উন্নতির দিকে খুব দ্রুতগতিতে ধাবিত হয়, তখন তার অনেক ভুলভ্রান্তি হয়। কিন্তু ওসব দেশ ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নেয়। আজকে একটি ভুল হলে পরবর্তীকালে কোনো অবস্থায়ই ওই সব দেশে দ্বিতীয়বার ওই ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের এখানে যেকোনো ভুলভ্রান্তিকে সরকার তাদের ভুল মনে করে না। তা সে যে সরকারই হোক না কেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের এখানে সরকারের প্রথম কাজটি হচ্ছে, 'এই ভুল আমরা করি নাই'- এটা প্রমাণ করা। 'ভূত করেছে, পেত্নি করেছে', বিরোধী দল করেছে কিংবা অজানা কেউ করেছে- কিন্তু এই ভুলভ্রান্তি শুধরানোর জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা না নিয়ে আমরা দায় চাপানোর যুদ্ধ শুরু করি। আমরা যদি দেশের প্রধান দুই দলের গত কয়েক দিনের বক্তব্য দেখি, তাহলে কী দেখব? সবাই প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, এটা তার দোষ নয়। সরকার যেমন বলতে চাইছে, এটা তার দোষ নয়, বিরোধী দলের দোষ। বিরোধী দল বলছে, এই ধসকে কাজে লাগিয়ে দেশে অন্য কাণ্ডকারখানা করতে যাচ্ছে সরকারি দল। অর্থাৎ দুই পক্ষেরই টার্গেট হচ্ছে রিলে রেসে ফার্স্ট হয়ে গদি রক্ষা করা কিংবা গদিতে পৌঁছানো। এ কারণেই কিন্তু আমরা এসব ধস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। সাভারের যে ভবনধস, এটা 'ম্যান-মেড' দুর্যোগ। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যেখানে 'ম্যান-মেড' ডিজাস্টার হয়নি। কিন্তু প্রতিটি দেশ এই ডিজাস্টার থেকে লার্নিং প্রসেসে যায়। আমরা এই লার্নিং প্রসেসটা নিতে পারিনি। স্পেকট্রাম গার্মেন্ট ভাঙল, প্রমাণ করার চেষ্টা হলো অন্য। সাভারে এই ভবনটি ধসে পড়ল, ইউএনও নাকি আগের দিন 'ঝুঁকি নেই' এমন কথা বলে এসেছিলেন! প্রথম দিন তো আমার অত্যন্ত ভালো লাগার একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমার নিয়মিত অনলাইনে চেক করি। অনলাইনে পেলাম যে সাভারে একটি ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভবনটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে শ্রমিকদের বের করে আনা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের মান কোন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তা ভেবে স্থাপত্য ইনস্টিটিউটে বসে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। যে সচেতনতার জন্য আমরা এত দিন ধরে যুদ্ধ করছিলাম, আমরা সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। মানুষের বিবেক, চিন্তাশক্তির অসাধারণ উন্নতি হয়েছে, এটা ভেবে আনন্দিত হয়েছিলাম। আমরা জেনেছিলাম, ফাটল দেখা দেওয়ার পর ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞ মতামত না নিয়ে ফ্যাক্টরি চালু করা হবে না, এমনই ভেবেছিলাম আমরা। বাংলাদেশের জন্য এটা ছিল একটি অসাধারণ উদাহরণ। আমরা বিষয়টিকে এভাবেই হাইলাইট করেছি। রাতের

বেলা কী এমন ঘটনা ঘটে গেল যে সকালবেলা তিন হাজার লোককে ওই পরিত্যক্ত ভবনে ঢোকানো হলো? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গত চার-পাঁচ বছরে, ফায়ার ব্রিগেডের হিসাব অনুযায়ী, এ ধরনের পাঁচটি ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো ভবন দেবে যাওয়া, কোনো ভবন কাত হয়ে যাওয়া। ফায়ার সার্ভিস পুরো ভবন খালি করে, ঘেরাও করে এগুলোকে সঠিক অবস্থায় নিয়ে এসেছে অথবা ভেঙে ফেলার প্রয়োজন পড়লে ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু এই ভবনটির ব্যাপারে ফায়ার সার্ভিস কেন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি? কেন সরকার থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি?

ফায়ার সার্ভিস হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে। আর এই যে দুর্ঘটনাগুলো ঘটে, এগুলো দেখভাল করার দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের। যদি দুর্যোগমুক্ত করতে হয়, ফায়ার সার্ভিসকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে হবে। কথাটা আমি সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী রাজ্জাক সাহেবকে অনেক আগেই বলেছি। তিনি চেষ্টাও করেছিলেন। পারেননি। চার বছর চলে গেছে। তাঁর মন্ত্রণালয় বদল হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস আগের জায়গাতেই আছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে থেকে ফায়ার সার্ভিসকে দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনলে প্রতিষ্ঠানটি কী কী সুবিধা পেত? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সভা-সেমিনার-প্রশিক্ষণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে স্কলারশিপ আসে। সেগুলো ব্যবহার করেন কারা? ফায়ার ব্রিগেডের কেউ সেটা ব্যবহার করতে পারেন না। কিন্তু এগুলো ফায়ার ব্রিগেডের সদস্যদের প্রাপ্য। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্কলারশিপ এলে পুলিশ কিংবা র‍্যাব সদস্যদের পাঠানো হয়।

কালের কণ্ঠ: নির্মাণ ত্রুটির কথা সবাই বলছেন। কী কী ত্রুটি ছিল বলে মনে করেন?

মোবাশ্বের হোসেন: রাজউকের চেয়ারম্যান বলেছেন, এই ভবনটি পৌরসভা পাঁচতলা বা ছয়তলার জন্য অনুমোদন দিয়েছিল। শুরুতে আমাকে জানানো হয়েছিল, এটা একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার অনুমোদন দিয়েছেন। যদি এটা সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এটা আরেকটা অপরাধ। প্রশ্ন হচ্ছে বিল্ডিংটি নির্মাণের সময় রাজউক কোনো ব্যবস্থা নিল না কেন?

কালের কণ্ঠ: ত্রুটিপূর্ণ এই ভবন নির্মাণের দায় আসলে কার?

মোবাশ্বের হোসেন: দেখুন, এলজিইডি মন্ত্রণালয়ের একটি সার্কুলারে বলা হয়েছে, দেশের প্রতিটি পৌরসভার একটি অধিকার আছে, তারা ভবন নির্মাণের অনুমোদন দিতে পারবে। এর পেছনেও একটি কারণ আছে। বাংলাদেশে আগে দোতলা-তিনতলা বিল্ডিং বানানো হতো। কিন্তু গত ২০ বছরের মধ্যে মানুষ ২০ তলা বিল্ডিং বানাচ্ছে। এখন অনেক মফস্বল শহরেও আপনি ১০-১২ তলা বিল্ডিং দেখতে পাবেন। কিন্তু গ্রেটার ঢাকা যেদিন করা হলো, যখন রাজউককে গ্রেটার ঢাকার দায়িত্ব দেওয়া হলো, যখন এ ব্যাপারে প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো, তখন থেকেই এই গ্রেটার এলাকায় যত সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা আছে, আইনত তাদের বিল্ডিং অনুমোদন করার অধিকার খর্ব হয়ে যায়। তখন যেকোনো ভবন নির্মাণের, এমনকি একটি অস্থায়ী ঘরও যদি বানাতে চান, রাজউকের কাছ থেকে অনুমোদন লাগবে।

পৃথিবীতে টেকনোলজি ও মানুষের জানাশোনা এত বেড়ে গেছে যে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওঠার আগেই এর গতি তার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। তাহলে আমাদের সরকার বা নীতিনির্ধারকদের তার চেয়ে বেশি গতিতে এগোতে হবে। এটা রাজউকেরই আইন। কিন্তু এত বড় ঢাকাকে মনিটর করার মতো ক্ষমতা কি রাজউকের আছে? রাজউকের চেয়ারম্যান বলেছেন, তাঁদের লোকবল নেই।

কালের কণ্ঠ: ১৯৯৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত রাজধানীতে অর্ধশতেরও বেশি ভবন ধসে বা হেলে পড়ার ঘটনার হিসাব আছে রাজউকের কাছে। এর মধ্যে প্রাণহানি হয়েছে এমন বড় দুর্ঘটনা রয়েছে আটটি। কিন্তু এর কোনোটির জন্য কারো শাস্তি হওয়ার নজির নেই। এমন কেন ঘটে?

মোবাশ্বের হোসেন: না, এমন কোনো নজির নেই। বিল্ডিং ডিফেকটিভ করার অপরাধে কোনো স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান ও প্রকৌশল সংস্থার বিচার হয়েছে এমন কোনো নজির নেই। আমরা একটি মনিটরিং সেল করেছি। আজ পর্যন্ত যে কটি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে, রাজউক সেগুলোর ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

কালের কণ্ঠ: কোন ভবন বাণিজ্যিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হবে বা কোন ভবন শিল্প হিসেবে ব্যবহৃত হবে, তা কিভাবে নির্ধারণ করা হয়? এমন কোনো নীতিমালা কি আছে?

মোবাশ্বের হোসেন: এ জন্য জোন ভাগ করা আছে। কোথায় কী হবে, তা বলা আছে। বাস্তবায়ন নেই।

কালের কণ্ঠ: ভবন হেলে পড়লে, ধসে পড়লে, ভেঙে পড়লে তারা তদন্ত আর মামলা করে। কিন্তু মামলা তদারকির দিকেও নজর থাকে না, এমন অভিযোগও কিন্তু আছে।

মোবাশ্বের হোসেন: এ জাতীয় ঘটনায় রাজউক প্রথম যে কাজটি করে, সেটা হচ্ছে মামলা। সাভারের ঘটনার পরও সেটা করেছে।

কালের কণ্ঠ: রাজধানী ঢাকা রয়েছে ভূমিকম্প-ঝুঁকির মধ্যে। এই ঝুঁকি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কী?

মোবাশ্বের হোসেন: এ বিষয়টি নিয়ে আমরা অসংখ্য আলোচনা করেছি। ভূমিকম্পের বড় দুর্যোগ কিন্তু ভবন ভেঙে পড়া নয়। শহরে যদি ভূমিকম্প হয়, সেখানে আগুন লাগে। ধসের ঘটনা ঘটলে ২৭-২৮ দিন সেখানে জীবিত মানুষ পাওয়া সম্ভব। যদি সেখানে বাতাস ও তরল খাবার পাঠাতে পারেন। ঢাকা শহরে যদি কোনো দিন ভূমিকম্প হয়, বিল্ডিং চাপা পড়ে মারা যাবে ১০ শতাংশ মানুষ। ৯০ শতাংশ মারা যাবে আগুনে পুড়ে। এখানে মাটির নিচে জালের মতো যে গ্যাসের লাইন আছে, তার কোনো নকশা নেই।

কালের কণ্ঠ: ঝুঁকিপূর্ণ যে ভবনগুলো রয়েছে, সেই ভবনগুলোকে ঝুঁকিমুক্ত করার উপায় কী?

মোবাশ্বের হোসেন: যে ভবনগুলো দুর্যোগের কেন্দ্রস্থল হবে, সেই বিল্ডিংগুলো ভূমিকম্প সহ্য করার মতো শক্ত বানানোর কথা। তিন বছর আগে সে কথা হয়েছে; সরকারের যাওয়ার সময় হয়ে গেল কিন্তু কাজের কাজ হয়নি।

কালের কণ্ঠ: বড় ধরনের কোনো ভূমিকম্প হলে যে দুর্যোগ দেখা দেবে, সেই দুর্যোগ মোকাবিলার সক্ষমতা আমাদের কি আছে?

মোবাশ্বের হোসেন: আজই আমাকে একটি টেলিভিশন চ্যানেলে টক শোর জন্য ডাকা হয়েছিল। বলা হয় আমার সঙ্গে থাকবেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী। আমি না করে দিয়েছি। বলেছি, আই অ্যাম দ্য লাস্ট পার্সন টু টক উইথ হিম। বড় বড় দুর্যোগ মোকাবিলার দায়িত্ব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের। যে দুর্যোগ মোকাবিলা করতে গিয়ে জনগণের কাছে হ্যাকসো বেল্ড চাওয়া হয়, টর্চ চাওয়া হয়, পানির বোতল চাওয়া হয়। এই একটি ভবনের জন্য যদি এই ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে যখন শত শত ভবন ভেঙে পড়বে, তখন টর্চ-পানি-লোহা কাটার ব্লেড কে সাপ্লাই দেবে? কী প্রস্তুতি আছে? ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের জন্য কী ইকুইপমেন্ট কিনতে হবে- কত টাকার ইকুইপমেন্ট কিনতে হবে, তার একটা তালিকা করে দিয়েছিলেন জামিলুর রেজা চৌধুরী। তার একটি অংশ কেনা হয়েছে। আমরা শুনে আসছি, আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের জন্য অনেক ইকুইপমেন্ট কেনা হয়েছে। ঢাকা শহরে নাকি ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে। আপনি কি একজন স্বেচ্ছাসেবককে চেনেন? আপনি স্বেচ্ছাসেবক যদি তৈরি করেন তাঁর আইডেনটিটি কী? স্বেচ্ছাসেবক তৈরির উদাহরণ তো বাংলাদেশে আছে। আমাদের কোস্টাল বেল্টে রেড ক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রত্যেকের নিজস্ব পোশাক রয়েছে। তাঁদের পরিচয়পত্র রয়েছে। তাঁদের ভিএইচএফ রেডিও সিগন্যাল রয়েছে। ঢাকার এই ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের কোনো পরিচয়পত্র আছে? তাঁর কাছে কি একটি টর্চ আছে? কোনো ইকুইপমেন্ট আছে? তাঁর কি হেলমেট আছে, হ্যাকসো আছে? অনেকের বাড়িতেই একটা ফার্স্ট এইড বক্স আছে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের কি তা দেওয়া হয়েছে? কী নিয়ে তিনি দুর্যোগ মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়বেন?

কালের কণ্ঠঃ রানা প্লাজা ধসে পড়ার পর যে উদ্ধারকাজ এখন পর্যন্ত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

মোবাশ্বের হোসেনঃ আমি কয়েক দিন ধরেই এ বিষয়টির ভীষণভাবে প্রশংসা করে আসছি। আমাদের অনেক কিছু নেই, কিন্তু একটি বড় অন্তর রয়েছে। মানুষের প্রতি সহানুভূতি রয়েছে। এটা অপরিসীম। আপনারা যদি রোজ টেলিভিশন দেখেন, কী দেখবেন? যাঁরা এখানে কাজ করছেন, তাঁরা কিন্তু যেকোনো সময় মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারেন। তাঁরা মৃত্যুভয়কে জয় করে, মৃত্যুর আশঙ্কা জেনে সেখানে গেছেন, উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছেন। এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অন্তর যে কত বড়, এই ঘটনাটি তার প্রমাণ। আর সে কারণেই এই দেশটিকে নিয়ে আমি অসম্ভব রকম আশাবাদী। শুধু একটু নেতৃত্ব প্রয়োজন।

সূত্রঃ কালের কণ্ঠ, ২৮ এপ্রিল ২০১৩

তৈরি পোশাক খাত : এগোনোর পথ

ফাহমিদা খাতুন

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ শিল্পজাত পণ্য আমরা বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে এই তৈরি পোশাক খাত থেকে। মোট দেশজ আয়ের ১৬ দশমিক ৫ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। সেখানে কারা কাজ করছেন? শ্রমিকশ্রেণী। তাঁদের মধ্যে আবার ৮০ শতাংশ হলেন নারী শ্রমিক। সেখানকার চ্যালেঞ্জগুলো ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। নব্বইয়ের দশকের দিকে পোশাক কারখানার জন্য শ্রমিকদের শ্রমঘণ্টা, কাজের পরিবেশ, কারখানার পরিবেশ, শিশুশ্রম ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা আমাদের ওপর এসেছে পশ্চিমা ক্রেতাদের কাছ থেকে।

আমরা দেখছি, আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের পক্ষ থেকে ২০০০ সালের পর থেকে কমপ্লায়েন্স মানার দাবি আরও শক্তিশালী হয়েছে। ২০১৩ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে এখনো বড় ধরনের ত্রুটি রয়েছে। সে কারণেই রানা প্লাজা ধস, তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে। দুর্ঘটনাজনিত ভয়াবহতার মাত্রা যেন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এর কারণ হলো, দুর্বল শাসনব্যবস্থা, আইনের শাসন বাস্তবায়িত না হওয়া। উপরন্তু রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাধ ও দুর্নীতি সংঘটিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক স্বার্থ আর রাজনৈতিক স্বার্থ মিলেমিশে সমাজকে কলুষিত করে তুলেছে। ফলে আমরা দেখছি, সমাজের দুর্বল অংশের ওপর শোষণের এবং অত্যাচারের কোনো বিচার হচ্ছে না। অপরাধীরা রয়ে যাচ্ছে আইনের ঊর্ধ্বে।

সরকার যে নীতিমালা তৈরি করে, সেগুলো সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়নকাজ করছে কি না, তা সঠিকভাবে তদারক করার ক্ষেত্রে গাফিলতি রয়েছে। কারখানার কমপ্লায়েন্সের জন্য যেসব দায়িত্বশীল বিভাগ রয়েছে, যেমন শ্রম অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কারখানা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ, অগ্নিনির্বাপণ কর্তৃপক্ষ, ভবন নির্মাণ কর্তৃপক্ষ—তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা করছে। পোশাকশিল্পের মালিকদের সংস্থা বিজিএমইএ যেভাবে কারখানার কমপ্লায়েন্স তদারক করছে, তাতেও ত্রুটি রয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত পোশাক কারখানাগুলোর বেশিরভাগই বিজিএমইএর সদস্য। কিন্তু প্রায়ই দুর্ঘটনার পর তারা দোষীদের চিহ্নিত করে না, তাদের সদস্যপদ বাতিল করে না। দেখা যাচ্ছে, যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের অনেকে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং অবহেলাজনিত দুর্ঘটনা ঘটার পরও পার পেয়ে যাওয়া তাঁদের জন্য বেশ সহজ।

উন্নত বিশ্বে এখন অনেক ধরনের প্রচারণা বা ক্যাম্পেইন চলছে। যেমন 'ক্লিন ক্লোথ ক্যাম্পেইন', 'এথিকাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ', 'লেবার বিহাইন্ড দ্য লেভেল' ইত্যাদি। অর্থাৎ যে কাপড়টা তাদের দেশের ভোক্তারা পরছে, সেটি কি উপায়ে তৈরি হয়েছে। পোশাক প্রস্তুতকারী কারখানায় শ্রমিক কী পরিবেশে কাজ করেছেন? বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তাঁরা ন্যায্যভাবে পেয়েছেন কি না? যে পরিমাণ শ্রমঘণ্টায় তাঁদের কাজ করার কথা, তা-ই করার সুযোগ পেয়েছেন কি না? আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শ্রম আইনগুলো মেনে পোশাকটি তৈরি করা হয়েছে কি না?

এ ধরনের অনেক প্রচারণা চলার পাশাপাশি আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের পক্ষ থেকেও একধরনের অবহেলা রয়েছে। তাই আমাদের তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের ভূমিকা নিয়েও কথা রয়েছে। বলা হয় তারা জেনেশুনেই কমপ্লায়েন্ট নয়, এমন কারখানার পোশাকও কেনে শুধু সস্তায় পাওয়ার জন্য। কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার পর একদিকে সরকার ও বিজিএমইএ বলে এটি একটি নাশকতামূলক ঘটনা। আর ক্রেতারা বলে, কারখানাটি যে কমপ্লায়েন্ট নয়, সেটি কারখানা পরিদর্শনকারী দল তাঁদের জানায়নি। আসলে আন্তর্জাতিক ক্রেতা সংস্থাগুলো

যেখান থেকে সস্তায় পোশাক পাওয়া যায়, সেখান থেকেই কিনছে। বাংলাদেশ থেকে সস্তায় পোশাক পাওয়া যায়। কারণ, এখানে শ্রমের মজুরি কম।

আর পশ্চিমা ক্রেতাসংস্থাগুলোর পোশাকের দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে অনীহার কারণেও আমাদের দেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পুরোপুরি কমপ্লায়েন্ট হয়ে উঠতে পারছে না। বাড়তি খরচের দায়টুকু তারা নিলে তাদের মুনাফা কমে যাবে, এমনকি উৎপাদন খরচও উঠবে না বলে আমরা শুনে থাকি। পশ্চিমা বিশ্বের ক্রেতাদের কমপ্লায়েন্স উন্নত করার আশ্বাস দিলে তারা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী হবে। তা ছাড়া কারখানাগুলোকে কমপ্লায়েন্ট করার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, তা আন্তর্জাতিক ক্রেতারা নিজেরাও ভাগাভাগি করে দিতে পারে। তাদের নিজেদের দেশের সচেতন ক্রেতাদের কথা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি মাথায় রেখে এই বাড়তি ব্যয়টুকুর ভার তারা নিতেই পারে, যেটি সম্ভবত তাদের মুনাফার সামান্যই হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, দুর্ঘটনার পর মালিকদের পক্ষ থেকে সভা, সংবাদ সম্মেলন করা হয়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়া হয়। কিন্তু শ্রমিকেরা অসংগঠিত। তাই আমরা দেখি, একদিকে তাঁরা স্বজন হারানোর বেদনায় বিষণ্ন, অন্যদিকে অসংগঠিতভাবে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেরা কয়েকজন রাস্তায় নেমে গাড়ি, ভবন ইত্যাদি ভাঙচুর করছেন, যা এ শিল্পটির ও প্রকারান্তরে নিজেদেরই ক্ষতি করছেন। তাঁদের এই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করার জন্য এখন শিল্পপুলিশ হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের দাবিদাওয়া, অধিকার আদায়ের ব্যাপারটি সংগঠিতভাবে আসছে না। ট্রেড ইউনিয়নের যে প্রভাব বাংলাদেশে ষাট ও সত্তরের দশকে ছিল, নানা কারণে সেই ঐতিহ্যটি আজ হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকনেতাদের রাজনৈতিক বা মালিকপক্ষের লেজুড়বৃত্তি করতে দেখা গেছে। ফলে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁদের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেছে।

বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক ইউনিয়ন করার জন্য দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে চাপ রয়েছে। শ্রম অধিকার সুরক্ষা এবং কারখানার কমপ্লায়েন্স উন্নত করার জন্য শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব কতখানি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একের পর এক এ ধরনের মানবসৃষ্ট দুর্ঘটনার হাত থেকে শ্রমিক ও পুরো শিল্প খাতটিকে রক্ষা করতে হলে শ্রমিকদের পক্ষে সুশৃঙ্খল ও কার্যকরী ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা কোনো অংশেই কম প্রয়োজনীয় নয়।

আমরা জানি, যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা এখন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। শ্রম অধিকার-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়সহ অন্যান্য কিছু বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বাংলাদেশের কাছে সঠিক জবাব চেয়েছে। তাদের প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারলে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পণ্য প্রবেশের সুযোগ হারাব।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার যদি আমরা হারাই, তবে আমাদের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হবে, তা হলো, বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। অন্য দেশগুলোও তখন চিন্তা করবে, বাংলাদেশ থেকে তারা তৈরি পোশাক কিনবে কি কিনবে না। রানা প্লাজা ধসের পর ইতোমধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছেন, এ ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে একটা প্রভাব ফেলবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানায়, ইউরোপের বাজারেও এর প্রভাব পড়বে। এই সংকেতগুলো আমাদের জন্য ভালো নয়।

আমাদের দেশে তৈরি পোশাক খাতটি দ্রুত বিকশিত করার ক্ষেত্রে আমরা আশির দশকে বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিলাম। একদিকে যেমন ছিল উদ্যমী ব্যক্তি খাত ও সরকারি সহযোগিতা, অন্যদিকে ছিল আন্তর্জাতিক বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশসুবিধা। এর পাশাপাশি প্রতিযোগী দেশগুলোর বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা ছিল। যেমন, শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধ চলছিল। তাদের বাজারটা আমরা পেয়েছিলাম। অন্যদিকে চীন, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার বাজারে শ্রমিকের মূল্য বেশি। কিন্তু সেটা কত দিন? ক্রমেই যদি আমরা এ রকম দুর্ঘটনাকবলিত হতে থাকি, তাহলে পশ্চিমা ক্রেতারা কি আমাদের ওপর নির্ভর করতেই থাকবে? ইতোমধ্যেই আমরা বিশ্বব্যাপী সমালোচনার মুখে পড়েছি। দু-একটি ক্রেতা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক আর কিনবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

এখন বিদেশে অনেক জায়গায় প্রচারণা চলছে বাংলাদেশের রক্তমাখানো কাপড় না পরতে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো আক্রমণাত্মক আচরণ করছে। আমরা অপমানিত হচ্ছি, অস্বস্তিতে ভুগছি। কোনো কোনো ক্রেতা মিয়ানমারে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। সেখানে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশি উদ্যোক্তারা সেখানে যাচ্ছেন বিনিয়োগের জন্য। পশ্চিমা ক্রেতারা এমনকি চলে যেতে পারে ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ায়। আমাদের জন্য এটি হবে একটি বিপর্যয়, যার ধাক্কা সজোরে এসে লাগবে অর্থনীতিতে। কেননা, তৈরি পোশাক খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪০ লাখ লোক কাজ করেন। এ খাতটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাঁদের আমরা কোথায় কর্মসংস্থান দেব? শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী, আমাদের বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ৫ শতাংশ, আর অর্ধবেকারত্বের হার প্রায় ২০ শতাংশ। তার ওপর প্রতিবছর শ্রমবাজারে নতুন করে ঢুকছে প্রায় ১৮ লাখ শ্রমশক্তি। অথচ আমাদের অর্থনীতির আকার সেই তুলনায় ছোট। মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ২০১২ অর্থবছরে ১১২ বিলিয়ন ডলার ছিল। আর বেসরকারি খাতই কর্মসংস্থানের মূলক্ষেত্র।

তাই তৈরি পোশাকশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে কর্মসংস্থানের অভাবে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিই হবে না, সামাজিকভাবেও এর মূল্য দিতে হবে। সরকার, কারখানামালিক, শ্রমিক ও ক্রেতা–সব পক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এই শিল্পটিকে ইতিবাচক দিকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। একদিকে আইনের যথাযথ প্রয়োগ, অন্যায়ের শাস্তি বিধান এবং পর্যাপ্ত সম্পদ ও জনবলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিভাগগুলোর দক্ষতা বাড়াতে হবে। অন্যদিকে সরকার, মালিক ও ক্রেতাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়ানোর মাধ্যমে শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষা ও জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। শ্রমিক ও কারখানাসংক্রান্ত কমপ্লায়েন্সগুলো সঠিকভাবে মানতে পারলে তৈরি পোশাকশিল্প খাতটিকে আমরা সামনের দিনগুলোয়ও শুধু যে ধরেই রাখতে পারব, তা নয়, বিশ্ব রপ্তানিতে আমাদের অংশও বাড়াতে পারব।

ড. ফাহমিদা খাতুন: *গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ*

সূত্র: প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৩

সাভার ট্র্যাজেডি ও আমাদের সাংবাদিকতা

শাইখ সিরাজ

একজন সাংবাদিকের জন্য একেকটি বড় দুর্ঘটনা আসে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার নতুন এক শিক্ষা হয়ে। সাভার ট্র্যাজেডিও ঠিক তাই। আমাদের ক্রমবিকাশমান টেলিভিশন সাংবাদিকদের জন্য আকস্মিক দুর্যোগ রিপোর্টিংয়ের এক সুযোগ হিসেবে উপস্থিত হলো। এই দুর্যোগ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের সাংবাদিকেরা রেখেছেন বড় ভূমিকা। টানা কয়েক দিন টেলিভিশন জুড়ে ছিল ভূরি ভূরি সরাসরি সংবাদ, সংগৃহীত সংবাদ, এক্সক্লুসিভ সংবাদ। মানুষ টেলিভিশনের সামনে থেকে যেন চোখ সরাতে পারেনি। এ দেশের ২৪টি টেলিভিশনের কমপক্ষে শতাধিক রিপোর্টার, শতাধিক ক্যামেরাম্যান পালাক্রমে ঘটনাস্থলে থেকে কঠিন পরিশ্রম করে রিপোর্টিং করেছেন। সবাই যাঁর যাঁর অবস্থানে থেকে চেষ্টা করেছেন কৃতিত্বপূর্ণ সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের। সাভারের ভয়াবহ ট্র্যাজেডির পর উদ্ধার অভিযানে যে সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে, তার পেছনে টেলিভিশন সাংবাদিকদের বিরামহীন সাংবাদিকতার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে।

আমাদের গণমাধ্যমে, বিশেষ করে টেলিভিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালা না থাকার কারণে পর্দায় অনেক কিছু দেখানো হয়, যা গ্রহণযোগ্য নয়। সংবাদের ক্ষেত্রে এখনো প্রধানত আত্মনিয়ন্ত্রণ কাজ করে। সে ক্ষেত্রে একজন প্রতিবেদক, ক্যামেরাম্যান, বার্তা সম্পাদক কিংবা টেলিভিশন মালিক ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে মনে করেন যে বীভৎস ওই ছবিটি প্রচার হতে পারে ৩০ সেকেন্ড, এক মিনিট, দুই মিনিট কিংবা তারও অধিক সময় ধরে। এটি তাঁর ব্যক্তি অবস্থান থেকে সেলফ সেন্সরশিপ। এখানে তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে সেলফ সেন্সরশিপ কাজ করছে। পাশাপাশি অন্য একজন সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান, বার্তা সম্পাদক কিংবা টেলিভিশন মালিক মনে করছেন, দৃশ্যটি প্রচার করা উচিত নয় বা করলেও খুব সীমিত সময়ের জন্য। এটিও ওই ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অবস্থান থেকে সেলফ সেন্সরশিপ। দুটি অবস্থানই নেতিবাচক। এখানে প্রয়োজন গাইডলাইন।

গণমাধ্যমের সেন্সরশিপ কিংবা সাংবাদিকদের নিজস্ব সেন্সরশিপ যেমন উপেক্ষিত হয়েছে, একইভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংবাদিক সর্বোচ্চ সাহসিকতার সঙ্গে টেলিভিশনের দর্শকদের ধ্বংসস্তূপের বহু নিচে চাপা পড়া একজন মানুষের কাছে নিয়ে গেছেন। একেকজন সাংবাদিক নিজেই উদ্ধারকর্মীর ভূমিকা পালন করেছেন। দর্শক কোনো কোনো ঘটনায় চরম বিরক্তও হয়েছে। ৫০ ঘণ্টা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকা একজন অর্ধমৃত মানুষের কাছে টিভি সাংবাদিক যখন তাঁর বুম এগিয়ে নিয়ে জানতে চান তাঁর অনুভূতি, আর সেটি যখন সরাসরি প্রচার হয়ে যায়, তখন দর্শকের বিরক্তি মোটেই অসম্ভব নয়। সরাসরি সম্প্রচার বলে কথা। এমনও দেখা গেছে, হাসপাতালের বিছানায় অঙ্গহীন একজন যখন কাতরাচ্ছেন, তখন তাঁর কাছে সাংবাদিক গিয়ে জানতে চাইছেন তাঁর অনুভূতি। এ কোন সাংবাদিকতা? পরিস্থিতি যদি সাংবাদিককে তাঁর পেশাগত দায়িত্বের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ও সচেতন না রাখতে পারে, তাহলে তো আর সংবাদের উদ্দেশ্য থাকে না। এবার সুস্পষ্টভাবেই দেখা গেছে, যখন সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে, তখন ক্যামেরাম্যানের নিজস্ব সেন্সর-শিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর চারদিকে যখন ভবনের নিচে চাপা পড়া ক্ষতবিক্ষত মানুষ, তখন তাঁকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এর কতখানি টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো সমীচীন। এ বিষয়ে মনে পড়ছে, চ্যানেল আই সংবাদের শুরুর দিকে মেঘনায় লঞ্চডুবির পর দু-একটি টেলিভিশন দেদার বিকৃত বীভৎস লাশের ছবি দেখাচ্ছে। চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরা সব ছবি ধারণ করার পরও পরিমিতভাবে তা প্রচার করছে। অবশেষে দর্শকেরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোন পর্যন্ত করে বসলেন, আমরা কেন লাশের ছবি ব্যাপকভাবে দেখাচ্ছি না। আমরা কি ছবি সংগ্রহেই ব্যর্থ হয়েছি? দেখলাম, ওই বিকৃত বীভৎস ছবি কারও কারও দৃষ্টিতে টানছে। না বুঝেই তিনি দেখতে চাইছেন ওই বীভৎস দৃশ্য। অবশেষে আমরা ছবি দেখালাম, কিন্তু ছবির ওপরে একটি অস্বচ্ছ ভিডিও লেয়ার দিয়ে। নিচে লিখে দেওয়া হলো, 'বীভৎস দৃশ্য দেখানো থেকে বিরত থাকা হলো।'

এটিও চ্যানেল আইয়ের সম্পাদকীয় অবস্থান থেকে সেলফ সেন্সরশিপ। একই ঘটনা ঘটেছে দেশে বিভিন্ন এলাকায় যখন ব্যাপক জঙ্গি তৎপরতা। একসঙ্গে ৬৩ জেলায় সিরিজ বোমা হামলা হলো। গাজীপুর, বরিশালসহ বিভিন্ন স্থানে আদালত প্রাঙ্গণে বোমা হামলায় ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটল। তখন একটি ভবনের দরজার তালার ওপর একতাল মাংস ঝুলছে, কিংবা বরিশালে বোমা হামলার পর গাছের ডালে একজনের দেহের ছেঁড়া অংশ ঝুলছে, এমন দৃশ্যও আমাদের টেলিভিশনে দেখতে হয়েছে। ড্রইংরুম মিডিয়া হিসেবে পরিবারের সব বয়সী ও পর্যায়ের সদস্য যখন একসঙ্গে বসে টিভি দেখে, তখন এ ধরনের দৃশ্য নেতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে। কিন্তু দিনের পর দিন এই বীভৎস ও বিকৃত কিছু দেখানোর এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে আমাদের গণমাধ্যমে। সাধারণ দর্শকও ওই দৃশ্যগুলো দেখতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও– এগুলোই যেন টেলিভিশনের আদর্শ দৃশ্যপট হয়ে উঠছে। সাভার ট্র্যাজেডির ভেতরও এ বিষয়গুলো লক্ষ করা গেছে। অথচ এ বিষয়টি দেশের সব সাংবাদিকেরই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকবে, যুক্তরাষ্ট্রে টুইন টাওয়ার হামলার ঘটনায় ক্ষতবিক্ষত ও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া ক্ষতবিক্ষত কোনো মানুষকেই আন্তর্জাতিক টেলিভিশনগুলো দেখানো থেকে বিরত থাকে। গত বছরের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটে স্কুলে সন্ত্রাসী হামলায় ২০টি শিশুসহ প্রায় ২৬ জন মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায়। কিন্তু কোনো গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ কোনো টেলিভিশনই দেখায়নি। একইভাবে সাম্প্রতিক সময়ে বোস্টনে বোমা হামলার ঘটনাটির কথাও বলা যায়। একেই বলে পজিটিভ মিডিয়া সেন্সরশিপ। এটি খুব প্রয়োজন।

২৪ এপ্রিল ট্র্যাজেডির শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত ঘটনাস্থলে উদ্ধারকর্মীদের মতোই তৎপর হয়ে কাজ করছে মিডিয়াগুলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত পেশাদারিত্বের কি কোনো উন্নয়ন লক্ষ করা যাচ্ছে? এখনো একই গতিতে সাংবাদিকেরা উদ্ধার অভিযান নিয়ে তথ্য দিয়ে চলেছেন। মানুষ তথ্য পাচ্ছে এ কথা যেমন ঠিক, আবার একইভাবে বারবার একই তথ্যের পুনরুচ্চারণ, একেক সাংবাদিকের একেক রকমের ভাষাগত ব্যাখ্যায় অনেক সময় জনগণ বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছে। দুর্যোগে উদ্ধার অভিযান পরিচালনার সময় ব্যবহারের জন্য বিষয়ভিত্তিক শব্দ ও পরিভাষা রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে ধারণা না থাকা বা কম ধারণার কারণে সাংবাদিক সঠিকভাবে একটি তথ্য তুলে ধরতে পারছেন না। উদ্ধার অভিযানের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, পদ্ধতি ও প্রযুক্তির পৃথক পৃথক নাম ও বিশেষণ রয়েছে, এগুলো প্রকাশ করার জন্য রয়েছে কারিগরি কিছু পরিভাষা। দৃশ্যত তা সাধারণ জনগণের কাছে অপরিচিত হতে পারে, সে ক্ষেত্রে একটি সঠিক পরিভাষা ব্যবহার করে তার অর্থও জনগণের স্বার্থে টেলিভিশনে স্পষ্ট করা হলে এর মধ্য দিয়ে সাধারণ দর্শকদের অনেক কিছুই জানা ও বোঝার সুযোগ সৃষ্টি হতো।

মনে পড়ছে, এখন থেকে ২৭ বছর আগে সিঙ্গাপুরের ব্রডওয়ে হোটেল ধসে পড়ার সেই ঘটনা দেখেছিলাম। দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকর্মী, প্রশাসন সবার দায়িত্ব পালনের সঠিক পরিভাষাগুলো সাংবাদিকদের মুখ থেকে উঠে আসার কারণে জনগণ সহজে পৌঁছতে পেরেছিল ঘটনার গভীরে। আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে সাংবাদিকের নিজস্ব নিরাপত্তা বা সাবধানতা ও পোশাক। একটি বিশাল বিপর্যয়কর দুর্ঘটনার সময়ও সাংবাদিকদের দিশেহারা হয়ে পড়ার সুযোগ নেই। তাঁর পূর্ব সতর্কতা, পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার মতো কারিগরি প্রস্তুতি–সবই থাকা প্রয়োজন। এবার দেখেছি, অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে সাংবাদিক সরাসরি রিপোর্টিং করছেন, আবার এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনার ভেতর সাংবাদিকের যে ধরনের পোশাক কাঙ্ক্ষিত নয়, সে ধরনের পোশাক পরেই চলছে রিপোর্টিং। সব মিলিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, খুব বেশি প্রতিযোগিতামুখী চিন্তার কারণে সবকিছু গুছিয়ে উঠতে পারছে না টেলিভিশনগুলো। আমি বা আমরাও এর ব্যতিক্রম নই। এত কিছুর পরও গণমাধ্যমের অপলক দৃষ্টি ও অতন্দ্র ভূমিকার কারণে সাভার ট্র্যাজেডির এই ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে প্রায় দুই হাজার ৪৩৭ জন জীবিত এবং প্রায় সাড়ে ৪০০ মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই হচ্ছে গণমাধ্যম আর তার শক্তি।

শাইখ সিরাজ: *পরিচালক ও বার্তাপ্রধান, চ্যানেল আই*

সূত্র: প্রথম আলো, ০৪ মে ২০১৩

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও রাজনীতি

বদিউল আলম মজুমদার

সাভারে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি যখন ঘটে, আমি তখন মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটোরে। সেখানে ১৫০ দেশের সমন্বয়ে গঠিত 'কমিউনিটি অব ডেমোক্রেসি' আয়োজিত সপ্তম মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্সে আমি অংশ নিচ্ছিলাম। কনফারেন্সে সারা পৃথিবী থেকে কয়েক শ ব্যক্তি অংশ নেন, যার মধ্যে ছিলেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অং সান সু চি ও তাওয়াক্কল কারমান এবং একাধিক দেশের প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রদূত। এ ছাড়া এতে অংশ নেন পার্লামেন্টারিয়ান, সিভিল সোসাইটি, ব্যবসায়ী, নারী ও তরুণদের প্রতিনিধিরা।

বাংলাদেশ থেকে আমিই একমাত্র এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলাম, যদিও চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এতে আমাদের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির ব্যাপকতা সম্পর্কে জানাজানি হতে থাকলে কনফারেন্সে অংশ-গ্রহণকারী ব্যক্তিদের অনেকেই আমাকে সমবেদনা জানাতে এগিয়ে আসেন। অনেকেই বলেন, হোটেল রুমে থেকে সিএনএন ও বিবিসি চ্যানেলে দুর্ঘটনার উদ্ধার কার্যক্রম দেখে তাঁরা চরমভাবে ব্যথিত। সমবেদনা জ্ঞাপনকারী ব্যক্তিদের প্রায় সবাই বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ভোক্তা এবং যে অমানবিক পরিবেশে এগুলো তৈরি হয় জেনে তাঁরা মর্মাহত। একজন তো হতাশার সুরে বলেই ফেললেন, তাঁর গায়ের জামাটি যে মেয়েগুলো বানিয়েছে, তারাও হয়তো মৃত বা নিখোঁজ! কয়েকজন আমার কাছে জানতে চান দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং এ ধরনের বিপর্যয় রোধে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন: কেন সরকার উদ্ধারকাজে ব্রিটিশ সহায়তা নিল না? দায়ী ব্যক্তিরা কি চিহ্নিত হবেন? শাস্তি পাবেন? মৃত ব্যক্তিদের পরিবার-পরিজন ও আহত ব্যক্তিদের দায়ভার কে নেবে? ইত্যাদি।

সম্মেলনে একজন আমেরিকানের সঙ্গে আমার কথা হয়, যিনি বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের অনেকের চেয়ে অনেক বেশি খোঁজখবর রাখেন, তিনি আমাকে বলেন, গত নভেম্বরের তাজরীন ফ্যাশনসের অগ্নিকাণ্ডের পর তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে এ পর্যন্ত ছোট-বড় ৪৭টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে, যাতে বেশ কয়েকজন হতাহতও হয়েছে। পোশাকশিল্পে দুর্ঘটনাজনিত হতাহতের মূল কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তালা দেওয়া কলাপসিবল গেট এবং হুড়োহুড়িতে শ্রমিকদের পায়ের তলায় পিষ্ট হওয়া। তাঁর আফসোস, বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ হাজার তৈরি পোশাকশিল্পে ৪৫ লাখ শ্রমিক কাজ করলেও, যা মঙ্গোলিয়ার মোট জনসংখ্যার দেড় গুণ, সরকার শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে অনাগ্রহী। বরং কোনো দুর্ঘটনা ঘটলেই দেশি-বিদেশি চক্রান্তের অভিযোগ তোলা হয়। তাজরীন অগ্নিকাণ্ডের সময় অনেকে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছিলেন। তবে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবার কেউ বিদেশি ষড়যন্ত্রের ধুয়া তোলেনি।

তিনি অভিযোগ করেন, বাংলাদেশ সরকার অর্থ ব্যয় করে শিল্প পুলিশ নিয়োগ দিয়েছে শ্রমিকদের পেটানোর জন্য। কিন্তু সারাদেশের শিল্পকারখানাগুলো নজরদারির জন্য মাত্র যে ১৫০টি ইন্সপেক্টরের পদ রয়েছে, তার প্রায় অর্ধেকই শূন্য। এ ব্যাপারে সরকার অর্থ ব্যয় করছে না। তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য যে ১০০ কোটি ডলার ব্যয় করে বাংলাদেশ অস্ত্র কিনতে পারে, কিন্তু দুর্যোগকালীন উদ্ধারকাজে ব্যবহারের জন্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী প্রস্তাবিত ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার টাকা সরকারের নেই! তাঁর আরও অভিযোগ, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তৈরি পোশাকশিল্পে শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলতে দিচ্ছেন না এবং এ প্রচেষ্টায় রত শ্রমিকনেতা আমিনুল ইসলামের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, যদিও সরকার জানে কারা খুনি।

ভদ্রলোকের দাবি, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের আমেরিকান ভোক্তারা শ্রমিকদের বারবার প্রাণহানিতে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ। কিন্তু ক্রেতা কোম্পানিগুলো এর দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। কোম্পানিগুলোর বক্তব্য, তাঁরা কারখানাগুলোর মালিক নন এবং বাংলাদেশি মালিকদের ওপর কারখানার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য চাপ দিলেও মালিকেরা কিছু না করলে এবং সরকার এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করলে তাঁদের তেমন কিছু করার থাকে না। আর কোম্পানিগুলো তৈরি পোশাকের জন্য বেশি দাম দিতে চাইলেও তাতে শ্রমিকেরা লাভবান হবে বলে তাঁরা আশাবাদী নন। কারণ, মালিকদের স্বার্থপরতা এবং শ্রমিকদের বঞ্চনার কথা তাঁদের জানা। মালিকেরা শুধু পণ্য বিক্রি করে লাভবান হচ্ছেন তা-ই নয়, তাঁরা বিভিন্নভাবে আন্ডার ও ওভার ইনভয়েসিং করেও ঐশ্বর্যশালী হচ্ছেন, কিন্তু শ্রমিকেরা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছেন। মালিকেরা একটার পর একটা কারখানা গড়ে তুলছেন এবং সম্পদের অশ্লীল প্রদর্শনী দেখাচ্ছেন, কিন্তু যাদের রক্তের বিনিময়ে তাঁরা তা করছেন, সেই শ্রমিকেরা খেতে পায় না।

ভদ্রলোক বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর চরম শঙ্কার কথা আমাকে জানান। বিদেশি ক্রেতাদের বাংলাদেশি কারখানায় কোনো মালিকানা নেই বলে তাঁরা যেকোনো সময় পণ্য কেনার জন্য অন্য দেশে পাড়ি জমাতে পারেন, যার উদ্যোগ ইতোমধ্যে অনেকেই নিচ্ছেন। ক্রমাগত রাজনৈতিক হানাহানি ও সহিংসতা তা আরও ত্বরান্বিত করবে। এ ছাড়া শ্রমিকদের যে অবিশ্বাস্য পরিমাণের কম মজুরি দেওয়া হয়, তাতে তাদের জীবন নির্বাহ হয় না, ফলে পুরো শিল্পে এক ভয়াবহ ধরনের অসন্তোষ ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। বস্তুত, তাঁর মতে, বাংলাদেশের পোশাকশিল্প অনেকটা বারুদের স্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে, যেকোনো সময় এর বিস্ফোরণ ঘটতে বাধ্য।

কনফারেন্সে অংশহণকারীদের প্রশ্নবাণের যখন মুখোমুখি হই এবং আমেরিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলি, তখন বি-জিএমইএর সভাপতির সাম্প্রতিক বক্তব্য আমার সামনে ভেসে ওঠে। দেশের ভাবমূর্তি রক্ষার খাতিরে তিনি রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির প্রচারণা বন্ধের আহ্বান জানান। উলানবাটোরে একদল বিদেশি 'অপিনিয়নমেকারের' সঙ্গে আলাপের অভিজ্ঞতা থেকে আমার কাছে এটি সুস্পষ্ট, বিজিএমইএর সভাপতি চাইলেও এবং আমাদের সরকার তার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেও এ ধরনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া যাবে না। আন্তর্জাতিক মিডিয়া এগুলো প্রচার করবেই। তৈরি পোশাকের ভোক্তারা এবং ক্রেতারা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলবেনই। মানুষ হিসেবে ভোক্তারা এ ব্যাপারে একধরনের ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব অনুভব করেন। সভাপতি ও সরকারের এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করা। ভবিষ্যতে এ ধরনের মানবসৃষ্ট ট্র্যাজেডির পুনরাবৃত্তি না ঘটলেই বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে, যা হওয়াও অত্যন্ত জরুরি।

ইতিহাস থেকে দেখা যায়, অনেক দেশেই প্রথমদিকে শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে শ্রমিকদের ত্যাগের বিনিময়ে। কিন্তু একপর্যায়ে এসে উৎপাদকেরা নিজেদের স্বার্থেই শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। ব্যবসার স্বার্থেই তাঁরা কিছু নিয়মকানুন গড়ে তুলেছেন এবং মেনেছেন। সরকারও তাদের করণীয় করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে সে লক্ষণ এখনো দেখা যায় না, কারণ আমাদের দেশে ব্যবসায়ের 'রাজনীতিকীকরণ' হয়েছে–আমাদের ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, রাজনীতিবিদেরা হয়ে পড়েছেন ব্যবসায়ী, ফলে রাজনীতি আজ লাভজনক 'ব্যবসায়ে' পরিণত হয়েছে। আমাদের সংসদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ব্যবসায়ী, তাই রাজনীতি এখন পরিচালিত হয় বহুলাংশে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে। এসব কারণে স্বল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যবসা ভালো চলছে না, রাজনীতিও হয়ে পড়েছে রাজনীতিবিদ-ব্যবসায়ী-আমলাদের যোগসাজশে নষ্ট ও দুর্বৃত্তায়িত।

আমাদের নষ্ট রাজনীতির মূলে রয়েছে ক্ষমতাধরদের ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতিতে যুক্ত হওয়া এবং এর আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া। বস্তুত, বাংলাদেশের দুর্নীতির একটি অন্যতম বাহন হলো ফায়দাবাজি ও দলবাজি। সোহেল রানার কথাই ধরা যাক। মিডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, জনৈক রবীন্দ্র সাহার জমি ও খাল দখল করে রানা প্লাজা গড়ে তোলা হয়। রবীন্দ্র সাহা মামলা করেও গত সরকারের আমলে প্রতিকার পাননি, কারণ রানার পরিবার বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা হিসেবে বর্তমান সরকারের ফায়দা পেয়ে রানা অন্যায়ভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন এবং এমপি ও প্রশাসনের সহায়তায় তা রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ গত এবং বর্তমান সরকারের নগ্ন ফায়দা ও দলতন্ত্রচর্চার কারণে রানা অন্যায় সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন এবং আইন ও নিয়মনীতি অমান্য এবং অপরাধ করে পার পেয়ে

গেছেন। বলাবাহুল্য, আমাদের নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট ছোবলের ফলে গত দুই দশকে এ ধরনের অসংখ্য রানা আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছেন, যাঁরা এবং যাঁদের ক্ষমতাধর গডফাদাররা সারা দেশে আজ একধরনের অরাজক পরিস্থিতি গড়ে তুলছেন। প্রসঙ্গত, গত সরকারের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ দুর্নীতি পরিহার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারের ভিত্তিতে বর্তমান মহাজোট সরকারকে গত নির্বাচনে মহাবিজয় উপহার দিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অরাজক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন তো ঘটেনিই, বরং অনেক ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছে।

পরিশেষে, মানব উন্নয়নের সূচকে বাংলাদেশের সফলতা অনেককে তাক লাগিয়েছে। পোশাকশিল্পে আমাদের সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতি অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে এখন মনে করেন যে অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের সামনে একটি অভাবনীয় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, দ্রুত ফায়দাতন্ত্র-দলতন্ত্র তথা দুর্নীতির অবসান ঘটাতে এবং ন্যায়পরায়ণতা ও আইনের শাসন তথা সুশাসন কায়েম করতে না পারলে, মানব উন্নয়নে আমাদের সফলতা অব্যাহত থাকবে না। আমরা তৈরি পোশাকশিল্পকে বাঁচাতে পারব না এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বাস্তবে রূপায়িতও হবে না। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত অঘটন এড়াতে হলে জরুরি ভিত্তিতে আজ প্রয়োজন আমাদের বিরাজমান অপরাজনীতির অবসান এবং এর গুণগত মানে ব্যাপক পরিবর্তন।

বদিউল আলম মজুমদার: *সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)।*

সূত্র: প্রথম আলো, ১৩ মে ২০১৩

শুরু করতে হবে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কাজ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প, এ দেশের মহাসড়কগুলোর মতোই, দুর্ঘটনাপ্রবণ এবং বেশিরভাগ দুর্ঘটনার পেছনে আছে মানুষের হাত। আমাদের বাস-ট্রাকচালকেরা যথাযথ প্রশিক্ষণ পেলে, তাঁদের ভেতর মানবিক গুণগুলো বড় হয়ে দেখা দিলে, আমাদের আইনের হাত শক্ত হলে, যানবাহনের চলাচলযোগ্যতা সর্বোচ্চ মানের হলে প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষকে অকালে বিদায় নিতে হতো না, আবার সারা জীবন দুর্ঘটনার অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হতো না। একইভাবে আমাদের তৈরি পোশাকশিল্পের পেছনেও আছে শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রতি মালিকপক্ষের উদাসীনতা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরম অবহেলা এবং লোভের হিসাব ও আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা। সারা বছরই ছোটখাটো কিন্তু প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার কথা আমরা শুনি, যেগুলোর সামান্য আন্তরিকতা থাকলেই রোধ করা যেত। বড় বড় দুর্ঘটনা, যেমন স্পেকট্রাম অথবা তাজরীন ফ্যাশনস অথবা সাভারে রানা প্লাজার ভয়াবহ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে একই সূত্র ধরে এবং তা হচ্ছে বিপদ জেনেও যেকোনো মূল্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার মালিকপক্ষের সিদ্ধান্তে। সাভারের বিপর্যয়ে সারা দেশ এখন কাঁদছে, কিন্তু এই কান্না অনেক পরিবারের জন্য চিরস্থায়ী অভিশাপ হিসেবে থেকে যাবে। এই এত কান্নার কোনো প্রয়োজন হতো না, যদি বুধবার সকালে রানা প্লাজার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হতো।

বড় বড় তিনটি দুর্ঘটনার মধ্যে আরেকটি মিল দেখা যাচ্ছে– দোষী মালিকদের সুরক্ষা দিতে প্রভাবশালী মহলগুলোর এগিয়ে আসা। স্পেকট্রামের মালিককে ধরা হয়েছিল, তিনি শুনেছি ছয় মাসের মতো কারাভোগ করেছেন। তাজরীনের মালিককে অবশ্য কোনো দুর্ভোগই পোহাতে হয়নি। রানা প্লাজার সোহেল রানাও প্রায় হাওয়া হয়ে যাচ্ছিলেন এবং প্রভাবশালীদের সহায়তাতেই। কাগজে পড়েছি, দুর্ঘটনার পর তাঁকে প্রভাবশালীরা বলেছিলেন, 'তোমার কিছু হবে না, তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও।' র‍্যাবের গোয়েন্দা দল রানার খোঁজ পেয়েছে এক প্রভাবশালীর মোবাইল ফোনের কললিস্ট ঘেঁটে। সাভারে প্রাণহানি এত ব্যাপক না হলে, সারা দেশের বিবেককে তা এমনভাবে নাড়া না দিলে এবং এই বছরটি নির্বাচনী বছর না হলে রানাসহ অন্যান্য মালিক নিশ্চয়ই নাকে তেল দিয়েই ঘুমাতেন।

আমাদের মহাসড়কের বাস-ট্রাকচালকেরা সেই তুলনায় অনেক অভাজন। প্রভাবশালীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই, কিন্তু তাঁদের আছে পরিবহন শ্রমিক সংগঠন। এই সংগঠনের ভয়ে সরকার চালকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদেরও একাধিক সংগঠন আছে এবং সেগুলোও দোষী মালিকদের বিরুদ্ধে শক্ত কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের ওপর এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকারের ওপর দোষ চাপিয়ে দায়মুক্ত হয়। সাভার বিপর্যয়ের পরও নিজেদের দায় স্বীকার না করে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক সংগঠন বিজিএমইএর নেতারা মিডিয়াকে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য দুষলেন। ব্যাপারটা আমাকে তাজ্জব করেছে। প্রতিবছর এতগুলো প্রাণ ঝরে পড়বে সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য দুর্ঘটনার কারণে এবং সেসব দুর্ঘটনার সংবাদ বিদেশে প্রচারিত হলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে না, অথচ সাভারের মতো এক অকল্পনীয় বিপর্যয়ের ছবি টিভিতে একবার দেখিয়ে অথবা কাগজে একবার লিখে বন্ধ করে দিলেই সেই ভাবমূর্তি উদ্ধার হয়ে যাবে? বিজিএমইএর নেতারা নিশ্চয়ই জানেন, সাভার বিপর্যয়ে পড়া মানুষগুলোর জন্য অনেক রাত পর্যন্ত টিভির সামনে বসে অসংখ্য মানুষ প্রার্থনা করেছে, কেঁদেছে, উদ্ধারকর্মীদের আশা ও উদ্বেগ ভাগ করেছে। আমাদের মিডিয়া বরং যে ভাবমূর্তি তৈরি করেছে, তা হচ্ছে মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসার, সমবেদনার ও অদম্য জীবনশক্তির। টিভির পর্দায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ রেখে আমি মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম প্রকাশগুলোও দেখেছি এবং আমার আবার আশা জেগেছে, এই দেশটি ঘুমিয়ে পড়েনি, এই দেশটি জেগে আছে। বিদেশে কোনো ক্রেতা-ভোক্তা এখন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, সেই দুর্ভাবনাকে ছাপিয়ে গেছে মানুষের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতার বিষয়টি। বিশ্বে বাংলাদেশের যে 'সুনাম'

আছে সস্তা শ্রমের দেশ হিসেবে, যে জন্য তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ চীন-ভিয়েতনাম থেকে এগিয়ে আছে, সেটি এখন দুর্নামে পরিণত হওয়ার পেছনে দায়ী কিছু পোশাকশিল্প মালিকের দায়িত্বহীনতা ও লোভ। এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছে। এই অসন্তোষের পেছনে বিদেশিদের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার না করে কারখানাগুলো শ্রমিকবান্ধব করলে, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলে, শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাড়ালে প্রকৃত সুনাম বাড়তে দেরি হবে না। আমরা জানি, কাজটি সহজ নয় এবং এ জন্য বিজিএমইএ থেকে নিয়ে সরকার, সবারই সক্রিয় এবং সনিষ্ঠ অংশগ্রহণ দরকার। এ জন্য পোশাকশিল্পের মালিকদের ত্যাগ স্বীকারের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শ্রমিকদের সহযোগিতাও। শ্রমিকেরা এ ব্যাপারে অনেক এগিয়ে আছেন, এখন তাঁদের দিকে একটা পা বাড়ালেই সমাধান সম্ভব। সাভারের ভয়াবহ প্রাণসংহারী বিপর্যয় আমাদের বিধ্বস্ত করেছে, কিন্তু উদ্বেলিতও করেছে, যখন দেখেছি অসংখ্য মানুষ স্বেচ্ছাশ্রমে অত্যন্ত বিপজ্জনক উদ্ধারকাজে নেমে পড়েছে। সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস এবং অন্যান্য সংস্থার প্রশিক্ষিত লোকজনের পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণহীন কিন্তু মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই মানুষগুলো সম্মিলিতভাবে যে নিঃস্বার্থ সেবার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, তা ভবিষ্যতে এ রকম দুর্ঘটনা না ঘটার আশঙ্কাকে শক্তিশালী করবে, কিন্তু তা থেকেও যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোয় উৎসাহিত করবে।

যেসব অসহায় শ্রমিক মারা গেলেন, পঙ্গু হলেন, তাঁরা দেশটাকে একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর সংগ্রামের সম্মুখযোদ্ধা। তাঁদের প্রতি আমাদের ভালোবাসার পাশাপাশি কৃতজ্ঞতাও থাকতে হবে। দায়বদ্ধতাও। আমরা দেখেছি, যেকোনো ধরনের মানবিক বিপর্যয়ের সময় দেশ যেভাবে জাগে, বিপর্যয় কেটে গেলে যেখান থেকে অনেকটাই দূরে চলে যায়। সিডর অথবা আইলার ক্ষয়ক্ষতি ছিল ভয়াবহ। ঘূর্ণিঝড় দুটির পর পর যে পরিমাণ সাহায্য-সহায়তা দুর্গত মানুষেরা পেয়েছিলেন, এক বছর পর তার প্রায় কিছুই তাঁরা পাননি। দুর্গতরা যত দিন মিডিয়ার ফোকাসে থাকেন, তত দিন তাঁদের দিকে সহায়তার হাত প্রসারিত হয়, মিডিয়া থেকে হারিয়ে গেলে তাঁরাও হারিয়ে যান দেশবাসীর মনোযোগ থেকে। এই চর্চা থেকে আমাদের বেরোতে হবে। এ জন্য মিডিয়ার সাহায্য প্রয়োজন, কিন্তু বেশি প্রয়োজন আমাদের ভেতর মানবিকতার বোধগুলো স্থায়ী করা। সাভার আমাদের একটা নাড়া দিয়েছে, এখন কিছু সময় পর আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে নিজেদের কাছেই আমরা অপরাধী হয়ে পড়ব। আমাদের জেগে থাকার কোনো বিকল্প নেই এবং আমরা জেগে থাকলে সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলগুলোর দায়িত্বশীলতাও ঘুমিয়ে পড়তে পারবে না।

এক টিভি চ্যানেলে তাজরীন ফ্যাশনসের দুর্ঘটনার চার-পাঁচ মাস পার হওয়ার পর কিছু হতাহতের পরিবারের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হলো। খুব কষ্ট নিয়ে দেখলাম, কীভাবে প্রাথমিক কিছু সাহায্য-সহায়তার পর এই মানুষগুলো এখন হয় নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন, অথবা ভবিষ্যতের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছেন। এদের দুর্দশা আমাকে মনে করিয়ে দিল আমাদের সমৃদ্ধির যে তিন রূপকার–কৃষিতে, তৈরি পোশাকশিল্পে এবং বিদেশে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে নিয়োজিত শ্রমিক, তাঁদের প্রতি জীবিত অবস্থাতেই আমরা কী নিদারুণ অবহেলা দেখাই। আমাদের বিমানবন্দরগুলোতে অভিবাসী শ্রমিকদের পারলে আমরা সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পথে বসিয়ে দিই, পোশাকশ্রমিকদের যত কম বেতনে সম্ভব কাজ করিয়ে নিই। আমাদের কৃষকদের কথা না হয় না-ই বললাম।

একটি কাগজ লিখেছে, 'তৈরি পোশাকশিল্পের ব্যবসায়ীরা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এক পয়সাও খরচ করেন না। শ্রম আইন মেনে মুনাফার ৫ শতাংশ অর্থও শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় করেন না। তাঁরা নিতান্ত বাধ্য হয়ে শ্রম আইন, ২০০৬ মেনে নিহত শ্রমিকপ্রতি এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেন জেল-জরিমানার ভয়ে।' ইত্যাদি। আমি নিশ্চিত, এটি পোশাকশিল্পের মালিকদের সার্বিক পরিচিতি নয়; তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকে আছেন, যাঁরা দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিজ থেকেই অনুধাবন করেন। এখন তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, আহতদের পুনর্বাসন করা হবে। আশ্বাসের ক্ষেত্রে যা শোনার কথা, আমরা শুনেছি। এখন দেখতে চাই কাজে এর প্রতিফলন ঘটছে।

আমার বিশ্বাস, ক্ষতিপূরণ-পুনর্বাসন বিষয়টি একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্তরা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পান। ক্ষতিপূরণ কথাটা অবশ্য ব্যবহার না করাই ভালো–টাকার অঙ্কে কারও মৃত্যুর বা অঙ্গহানির ক্ষতি কোনো

দিন পূরণ হয় না। আমি নিশ্চিত, এই শব্দের বিকল্প একটি শব্দ আইনের পরিভাষায় পাওয়া যাবে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত হতাহতের পরিবারগুলো যেন কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, শিশুরা শিক্ষা থেকে ঝরে না পরে, পরিবারগুলোর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং ভবিষ্যতের দিকে তাদের ভীতি নিয়ে না তাকাতে হয়। এ ক্ষেত্রে শুধু দায়ী মালিকই নন, বরং বিজিএমইএকে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে হবে; সরকারকেও তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা আয় হচ্ছে যে খাত থেকে, সেই খাতে চার-পাঁচ শ কোটি টাকার একটি তহবিল সৃষ্টি খুব কঠিন কিছু নয়। যদি এটি করার একটি আইনি বাধ্যবাধকতা থাকে এবং সরকারেরও সে তহবিলে অর্থ জোগানের বিধান থাকে, তাহলে ছয় মাসের মধ্যেই সেটি হতে পারে। যদি আমাদের তৈরি পোশাকশিল্পকে তার দুর্নাম ঘুচিয়ে উঠে দাঁড়াতে হয়, তাহলে এ রকম তহবিল তৈরিসহ এই শিল্পের পরিবেশ শ্রমিকবান্ধব করার কোনো বিকল্প নেই। সাভার আমাদের দেখিয়েছে, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কতটা শক্তিশালী একটি বন্ধন তৈরি করতে পারে। কুষ্টিয়ার শাহীনা নামের মেয়েটিকে বাঁচাতে ২৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করেও যখন পারা গেল না, উদ্ধারকর্মীরা বুক ভাসিয়ে কাঁদলেন। বাঙালি চরিত্রের এই শুদ্ধ-সুন্দর দিকটি কেন কিছু লোভের জন্য আমরা বিকশিত হতে দেব না? আগামী দিনে আমাদের পথ দেখানোর কাজে লাগাব না?

প্রথম আলো ট্রাস্টের মতো অনেক উদ্যোগে মানুষ সাড়া দিচ্ছেন। ডাচ্-বাংলা ব্যাংক প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির জন্য এক লাখ টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এ রকম আরও অনেক উদ্যোগ তৈরি হচ্ছে, সেগুলো ওই তহবিল সৃষ্টির প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত করলে অনেক বড় সফলতা পাওয়া যাবে। আমাদের মিডিয়া আমাদের আশান্বিত করেছে–শাহীনাদের আমরা ভুলব না।

এই প্রত্যয়টি এখন যেন কাজের ক্ষেত্রে আমাদের পথ দেখায়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: *কথাসাহিত্যিক। অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

সূত্র: প্রথম আলো, ০৩ মে ২০১৩

বিধ্বস্ত রানা প্লাজার জমিতে বিপণিবিতান!

আলী ইমাম মজুমদার

বিধ্বস্ত রানা প্লাজার বর্তমান পরিত্যক্ত জমিতে একটি নতুন বহুতল বিপণিবিতান নির্মাণ করে সেখানে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে দোকান বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। প্রস্তাবটি দিয়েছে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। খবরটি ঢাকার একটি বাংলা দৈনিকের। খবরে প্রকাশ, বিজিএমইএর নতুন পরিচালনা পরিষদ রেওয়াজ অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে দেখা করতে গিয়ে এ প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী ভবনধসে নিহত শ্রমিকদের পরিবারগুলোকে মাসে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন। এসব পরিবারের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর এই সহমর্মিতা সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য।

তবে কিছু প্রশ্ন থেকে যায় বিজিএমইএর আলোচিত প্রস্তাব এবং এ-জাতীয় ঘটনায় তাদের ভূমিকা নিয়ে। কেননা, তারা রানা প্লাজার জমির কিংবা এখানে যে পোশাক কারখানাগুলো ছিল, সেগুলোর মালিক নন। এই ভবনমালিকের জমির পুরো মালিকানাও প্রশ্নবিদ্ধ বলে অভিযোগ রয়েছে। কিছু বেআইনি দখলকৃত জমিও এর মধ্যে রয়েছে বলে পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়। তবে সেটা হলেও অন্য কেউ সেই অংশের মালিক হবেন আইনি প্রক্রিয়ায়। আর তা সরকার এভাবে ব্যবহার করতে চাইলে অধিগ্রহণ করতে হবে। দিতে হবে বহু টাকা ক্ষতিপূরণ।

উল্লেখ্য, গত ২৪ এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা নামের একটি বহুতল ভবন ধসে পড়ে। এযাবৎ পোশাকশিল্প খাতে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে ওই ধসের ফলে। এমনকি এখনতক অন্য সব পোশাকশিল্পের দুর্ঘটনায় যত লোকের প্রাণহানি হয়েছে, তার প্রায় তিন গুণ বেশি প্রাণহানি এখানে হয়েছে। আহত ব্যক্তিদের অনেকেই জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যাবেন। আগের দিন ভবনটিতে ফাটল ধরলে বন্ধ করে দেওয়া হয় ওই ভবনে অবস্থিত ব্র্যাক ব্যাংকের কার্যক্রম। নিচের দোকানগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বন্ধ হয়নি পোশাক কারখানাগুলো। কোনো বিপদের ঝুঁকি নেই বলে ঘটনার দিন কারখানাগুলোর মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ডেকে এনে কাজে লাগায়। এ ঘটনার মর্মান্তিক দৃশ্যাবলি গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ায় বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

ভবনটির মালিক সাভার যুবলীগের নেতা সোহেল রানা। তিনি অনুমোদিত নকশার বাইরে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করেছেন ভবন নির্মাণসংক্রান্ত নিয়মকানুন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। নিম্নমানের মালামালও ব্যবহৃত হয়েছে ভবন নির্মাণে–এমন অভিযোগও রয়েছে। এর ওপরের তলাগুলো ভাড়া দিয়েছেন পোশাক কারখানাগুলোকে। সেখানে ছিল ভারী যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক জেনারেটর। আর শ্রমঘন শিল্প বলে একত্রে কাজ করতে হয় বহুসংখ্যক শ্রমিককে। তদুপরি এই বহুতল ভবনের ভিতও যথাযথ মানের ছিল না বলে জানা যায়। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। দেশ-বিদেশের গণমাধ্যম প্রকৃত চিত্র ও ঘটনা তুলে ধরেছে। ঘটনায় শঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ দেশের সাধারণ মানুষ। জানা যাচ্ছে, ততোধিক ক্ষুব্ধ রপ্তানিমুখী শিল্পটির প্রধান ক্রেতা দেশগুলোর শ্রমিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো। সেখানকার আমদানিকারকেরাও চাপের মুখে। যেখানে শ্রমিকের নিরাপত্তার মান এই পর্যায়ে, সেখান থেকে তারা তৈরি পোশাক কিনতে এখন সংকোচ বোধ করছে। এ ধরনের ঘটনা অতীতেও ঘটেছে। কিন্তু কোনো দায় নির্ধারণ করে কাউকে দণ্ডিত করা হয়নি। তাই সংশ্লিষ্ট সবাই এই বিচারহীনতার সুযোগটা নিচ্ছে।

ঘটনার কয়েক দিন পর বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর এক যৌথ সাধারণ সভা হয়। সেখানে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা করাসহ ক্ষেত্রমতে তাদের সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্তও হয় বলে জানা গেছে। তবে সভা শেষে তাদের একজন মুখপাত্র দাবি করেছেন, আলোচিত ঘটনায় দায় প্রথমে ভবনমালিক ও প্রকৌশলীর। তৃতীয় পর্যায়ে সেই দায় পোশাক

কারখানার মালিকদের ওপর বর্তায়। আলোচ্য ঘটনাটি অতিরঞ্জিতভাবে প্রচার করে গণমাধ্যম বিদেশে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছে বলেও সেই মুখপাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এরপর আসে পোশাক কারখানার মালিকদের দায়দায়িত্বের অবস্থান নিয়ে। রানা প্লাজার মালিক ও নির্মাণ প্রকৌশলী নিম্নমানের ইমারত তৈরি করে ব্যাপক প্রাণহানির কারণ ঘটিয়েছেন, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এ ধরনের নিম্নমানের ভবনে জেনে বা না জেনে পোশাক কারখানা স্থাপন ও ঝুঁকি দেখা দেওয়ার পরও সেগুলো পরিচালনা করে এর মালিকেরা কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একই কাতারে আসবেন না? তদুপরি শ্রম আইনে কারখানা চলাকালে শ্রমিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব মালিকের। এ ক্ষেত্রে তাঁদের কীভাবে ঘটনার জন্য কম দায়ী বলে তাঁদের সংগঠন দাবি করতে পারে? আর বিদেশে আমাদের পোশাকশিল্পের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারের খোরাক জোগান এ মালিকেরাই; গণমাধ্যম নয়। অবশ্য এসব কলকারখানার অনুমোদন ও তদারকির দায়িত্বে যেসব সরকারি সংস্থা রয়েছে, তার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও যথেষ্ট দায় রয়েছে।

তথ্যমতে, আমাদের তৈরি পোশাক কারখানার সংখ্যা হাজার পাঁচেক। এর একটি বিরাট অংশ কমপ্লায়েন্ট বা মান প্রতিপালনকারী। কমসংখ্যক কারখানাই নন-কমপ্লায়েন্ট। আর সময়ে সময়ে তাদের অতি লোভের বলি হতে হয় দরিদ্র শ্রমিককে। কখনো আগুনে পুড়ে অঙ্গার। আর কখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়ে বিকৃত হয়ে লাশও অচিহ্নিত থাকে। দাফন হন বেওয়ারিশ হিসেবে। খয়রাতি সাহায্যের মতো কিছু ক্ষতিপূরণ পান বটে। তবে তা দরিদ্র পরিবারগুলোর দারিদ্র্য মোচনে ভূমিকাই রাখে না। আবার সেই ক্ষতিপূরণও কারও কারও ওয়ারিশদের ভাগ্যে জোটে না। এ-জাতীয় দুর্ঘটনার পর সরকারের বিভিন্ন সংস্থা উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। সহায়তায় এগিয়ে আসেন স্বেচ্ছাসেবকেরা। রানা প্লাজার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব ও ধ্বংসের ব্যাপকতায় উদ্ধার অভিযান সময় নিয়েছে।

এখন প্রশ্ন, হতাহত ব্যক্তিদের যৌক্তিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণের টাকা দেবে কে? প্রধানমন্ত্রীর অনুভূতি এখানে মর্যাদার দাবি রাখে। রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে এর ব্যবস্থা করা হলেও এটা ভালো কাজে ব্যয় বলেই করদাতা জনগণ মনে করবে। তবে ভবনমালিক ও সংশ্লিষ্ট পোশাক কারখানার মালিকদের এর একটি বড় অংশের শরিকদার হওয়া উচিত। পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন ভবনমালিকের জায়গাটি দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তারা কী করবে, সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো উদ্যোগ লক্ষণীয় হচ্ছে না। এ ধরনের প্রকল্প নেওয়া হলে জমি অধিগ্রহণ এবং পরবর্তী নির্মাণকাজে প্রচুর টাকা লাগবে। হয়তো তারা ছিটেফোঁটা কিছু দিয়ে শৈবালের মতো শির উঁচু করে এক ফোঁটা শিশির দেওয়ার কথা দিঘিকে মনে রাখতে বলবে।

পোশাকশিল্পের মালিকেরা একটি সফল খাতের উদ্যোক্তা শ্রেণী হিসেবে সমাজে পরিচিত। তাঁদের প্রচেষ্টায় আজ প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক এ খাতে সরাসরি কাজ করছেন। আর তাঁদের সিংহভাগই নারী। তাই কর্মসংস্থান ও নারীর ক্ষমতায়নে উদ্যোক্তা শ্রেণীর প্রচেষ্টাকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গেই দেখি। তবে এ সাফল্যের পেছনে মূল অবদান রাখছেন শ্রমিকেরাই। তাই তাঁদের প্রতি মালিকেরা সংবেদনশীল হবেন, এটা আশা করা অন্যায্য নয়। এটাও উল্লেখ করা সমীচীন যে তৈরি পোশাকশিল্প পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোতে আমাদের পরিচিত করতে ভূমিকা রেখেছে। এই শিল্প অন্যান্য অনেক খাতে প্রবৃদ্ধিতেও অবদান রেখেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পোশাকশিল্পের মালিকদের একটি অংশকে আমরা শ্রমিকদের প্রতি সংবেদনশীল হতে দেখি না। নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানাগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত কমপ্লায়েন্ট করাতে না পারলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিজিএমইএ সুপারিশ করতে পারে। জানা যায়, ভোটের রাজনীতি এসব প্রতিষ্ঠানকেই প্রভাবিত করছে। তাই কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কার্যত সংঘবদ্ধভাবে তারা পোশাকশিল্পের মালিকের পক্ষাবলম্বন করে। আজতক এ-জাতীয় ঘটনায় কারও শাস্তি ভোগ করতে হয়নি। শ্রমিকদের বেতনাদি ও স্বার্থের প্রতি তাঁরা আরেকটু সহানুভূতিশীল হতে পারেন। শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার সুযোগ দিতে তাঁদের অনীহা সর্বজনবিদিত। অথচ আইএলও কনভেনশন সেই অধিকার শ্রমিকদের দিয়েছে। আর বাংলাদেশ সেই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। কিন্তু তা করার পরিবেশই ঘটতে দেন না কারখানার মালিকেরা।

দায়িত্বশীল শ্রমিক ইউনিয়ন কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কল্যাণেই ব্যবহৃত হয়। চা-শিল্পে দীর্ঘকাল শ্রমিক ইউনিয়ন সক্রিয় থাকলেও বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া তেমন সমস্যা হয়নি। এটা ঠিক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। নিজেদের সুযোগ-সুবিধাদি নিয়ে দর-কষাকষির চেয়ে ব্যবস্থাপনার দিকেই শ্রমিকনেতারা ঝুঁকে পড়েন। তাঁরা কাজ না করেই বেতন-ভাতাদি নেন। প্রভাব বিস্তার করেন কর্মকর্তাদের পদোন্নতি বদলি ও পদায়নে। কিন্তু একতরফাভাবে এগুলো দেখলে চলবে না। সাম্প্রতিক কালে হল-মার্কসহ ব্যাংক খাতের বড় বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিগুলোর একটিতেও কোনো শ্রমিকনেতা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন–এমন অভিযোগ নেই। যেসব ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে, সেখানে অনুসন্ধানে দেখা যাবে ব্যবস্থাপনার মেরুদণ্ডহীন ও দুর্নীতিপরায়ণ একটি চক্র শ্রমিক ইউনিয়নকে কাজে লাগায়।

পোশাক কারখানার মালিকদের এত বড় মানবিক বিপর্যয়ের পর দ্রুত বড় ধরনের সহায়তা কার্যক্রম নেওয়া আবশ্যক। অন্যের জমি দেখিয়ে আর নিজেদের ভূমিকা অব্যক্ত রেখে তাঁরা সংবেদনশীলতার পরিচয় দিতে সক্ষম হননি। শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য যদি ভবনমালিকের জমি নেওয়া হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট পোশাকশিল্পের মালিকদের কাছ থেকেও সমপরিমাণ জমি বা এর মূল্য আদায় করা যৌক্তিক হবে। কেননা, এখানে তাঁদের অপরাধ কিছুমাত্র কম নয়। পোশাক কারখানার মালিকদের উপলব্ধির সময় এসেছে, কিছু মালিকের অপকর্ম তাঁদের সব অর্জন ব্যর্থ করে দেওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। ক্রেতা দেশগুলোর দায়িত্বশীল মহল এসব কারখানার শ্রমিকদের 'শ্রমদাস' বলে আখ্যায়িত করা আমাদের কারও জন্য গৌরবের বিষয় নয়। আমরা আন্তরিকভাবে এই শিল্পের কোনো ক্ষতি চাই না, বরং চাই এর আরও বিকাশ ও সমৃদ্ধি।

আলী ইমাম মজুমদার: *সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব*

সূত্র: প্রথম আলো, ১৬ মে ২০১৩

ক্ষতিপূরণের ফাঁপা আশ্বাস

এম এম খালেকুজ্জামান

২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের উপকূলে ডিপওয়াটার হরাইজন নামে অফশোর অয়েল রিগে বিস্ফোরণ হয় এবং এতে ১১ জন মারা যায়। বিস্ফোরণের পর সাগরের বিশাল এলাকায় তেল নিঃসরণের কারণে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা যায়। ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম (বিপি) অপারেটর হিসেবে এই প্ল্যান্টের কাজ করছিল। এই ঘটনায় দায়ী করে বিপিকে ইউএস জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার অর্থদণ্ড ও ১১ জনকে হত্যার কারণে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত করে। লক্ষ করার বিষয় হলো, দেওয়ানি মামলার সঙ্গে ফৌজদারি অপরাধের মামলাও চলছে।

যেকোনো মানদণ্ডের বিচারে শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ শিল্প দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা পোশাক আমদানিকারক থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু পোপ ফ্রান্সিসকেও বিচলিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। ক্ষুব্ধতা সংক্ষুব্ধতায় শেষ হলেও হতো, কিন্তু সাভার ট্র্যাজেডির পর কিছু আন্তর্জাতিক পোশাক ব্র্যান্ডের বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক চুকানোর ঘোষণা পুরো শিল্পটিকেই হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

নিয়মিত বিরতি দিয়ে দুর্ঘটনা যেন আমাদের ভবিতব্য হয়ে গেছে। শত শত প্রাণ চলে গেলেও প্রতিটি দুর্ঘটনার পর দোষী ব্যক্তিরা পর্দার আড়ালেই রয়ে যায়। সরকার ও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ও অন্যদের ওপর দায়ভার চাপিয়ে দায়মুক্ত থাকতে ব্যস্ত।

এই প্রসঙ্গে আইন বিশেষজ্ঞরা বলেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশে যদি টর্ট আইনে মামলা (অসাবধানতার জন্য ক্ষতি হলে) হতো, তাহলে দোষী ব্যক্তিদের বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হতো। এ বিষয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী আমীর-উল ইসলাম বলেন, অবশ্যই এখন আদালতে গিয়ে টর্ট আইনে মামলা করতে হবে। এটা করতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের, সরকারের নয়। মামলা না হওয়ার কারণে বারবার দোষী ব্যক্তিরা পার পেয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির (অবহেলাজনিত কারণে এত প্রাণ হারানোর পর এটাকে কী এখন আর দুর্ঘটনা বলে ভাবার কোনো কারণ আছে?) ঘটনার ভয়াবহতার কারণে বিভিন্ন মহল থেকে বিপুল অর্থসাহায্যের তহবিল সংগ্রহ করা হচ্ছে, যা কোনো আইনি কাঠামোর বাধ্যবাধকতার কারণে নয়, মূলত মানবিক দায়ে।

অসাবধানতার জন্য ক্ষতি হলে অবৈধ মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উপার্জনের বর্তমান মূল্য (ডিসকাউন্টেড ভ্যালু অব ফিউচার ফ্লো অব আর্নিংস) পদ্ধতি। এতে মৃত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে বাকি কর্মক্ষম জীবনে যে আয় করতে পারতেন, তার বর্তমান বাজারমূল্যই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

ডিসকাউন্টিং পদ্ধতিতে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর। মৃত ব্যক্তির বয়স, তাঁর ভবিষ্যৎ উপার্জনের ক্ষমতা এবং সুদের হার বা ডিসকাউন্ট রেট। মৃত ব্যক্তির অল্প বয়স হলে তাঁদের বেশি দিন বেঁচে থাকার এবং উপার্জন করার সম্ভাবনা থাকে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, সংশ্লিষ্ট কাজের দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর আয়ক্ষমতা নির্ভর করে। সুদের হার বেশি হলে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আয়ের বর্তমান মূল্য কম হবে। সুদের হার কম হলে ভবিষ্যৎ আয়ের বর্তমান মূল্য বেশি হবে। সুজনের সাধারণ সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদার তাজরীন ফ্যাশনসের অগ্নিকাণ্ডের পর ডিসকাউন্টিং পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ নিরূপণের হিসাব এক নিবন্ধে দেখিয়েছেন।

মৃত শ্রমিকেরা সবাই অল্প বয়সের। বেঁচে থাকলে তাঁরা অনেক দিন কাজ করতে পারতেন। তাই হিসাবে বিনিয়োগের মেয়াদ ৩০ থেকে ৪৫ বছর ধরা হয়েছে। ভবিষ্যৎ কর্মজীবন ৩০ বছর ধরে শতকরা ১০ শতাংশ সুদের হারে ছয় লাখ টাকা বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগকারী বার্ষিক ৫৭ হাজার ৮৬১ টাকা বা মাসে আনুমানিক চার হাজার ৮২২ টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। এ ধরনের বিনিয়োগকে 'অ্যানুইটি' বলা হয়। পশ্চিমা দেশে বিমা কোম্পানিগুলো সাধারণত এ ধরনের অ্যানুইটি বিক্রি করে থাকে। অর্থাৎ একজন মৃত শ্রমিক, যে বেঁচে থাকলে আরও ৩০ বছর কাজ করতে পারতেন, তাঁর পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাঁড়াবে বার্ষিক ৫৭ হাজার ৮৬১ টাকা, মাসিক প্রায় চার হাজার ৮২২ টাকা। অন্যভাবে দেখতে গেলে, একজন শ্রমিক আগামী ৩০ বছর বার্ষিক ৫৭ হাজার ৮৬১ টাকা বা মাসিক চার হাজার ৮২২ টাকা আয় করলে ১০ শতাংশ সুদের হারে তার বর্তমান মূল্য হবে ছয় লাখ টাকা। তাই যে শ্রমিক মাসিক মাত্র চার হাজার ৮২২ টাকা হারে আগামী ৩০ বছর আয় করতে পারতেন, বাজারে ১০ শতাংশ সুদের হার বিরাজ করলে তাঁকে ছয় লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যথার্থ হবে।

তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডের পর টর্ট আইনের প্রয়োগ-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ বলেন, 'আশুলিয়া ও চট্টগ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনায় কেউ টর্ট মামলা করলে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই এ মামলা করতে হবে।' তাজরীন ফ্যাশনস অগ্নিকাণ্ডে যার অবহেলার কারণেই হতাহতের ঘটনা ঘটুক না কেন, এখানে মালিককে 'পরার্থে দায়ী' করে টর্ট মামলা করা যাবে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, না ক্ষতিগ্রস্ত, না সরকার–কোনো পক্ষকেই এই আইনের আশ্রয় নিতে খুব দেখা যায় না।

ল্যাটিন Tortum থেকে এসেছে Tort শব্দটি। Tortum শব্দের অর্থ বাঁকা। যদিও বাংলায় এর কোনো যথার্থ আইনি প্রতিশব্দ ব্যবহার হতে দেখা যায় না। সাধারণত একে 'দেওয়ানি ক্ষতি' বা 'নিমচুক্তি' কখনো ব্যক্তিগত অপকার হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তবে বাংলাতেও টর্ট হিসেবেই বেশি প্রচলিত।

টর্টের কোনো বিধিবদ্ধ আইন নেই। তথাপি পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে এ আইনের প্রয়োগ ও বিস্তার বেশ ব্যাপক। যদিও আমাদের দেশে এ আইনের প্রয়োগ নেই বললেই চলে।

এম এম খালেকুজ্জামান: *আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট*

সূত্র: প্রথম আলো, ০৪ জুন ২০১৩

আইনগুলো সব কেন রানাদের পক্ষে?

ডক্টর তুহিন মালিক

সমগ্র দেশ যখন সাভারের শত শত শ্রমিকের হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবি করছে, তখন রানার বিরুদ্ধে মামলা হলো দণ্ডবিধির ৩০৪(ক) ধারায়, যাতে বেপরোয়া বা অবহেলাজনিত সর্বোচ্চ শাস্তির বিধানই আছে পাঁচ বছরের জেল। শত শত লাশের বিচারপ্রার্থী মানুষের সঙ্গে এ যেন পুলিশের এক নির্মম রসিকতা। জনদাবির ভয়াবহতা ও জনগণের চাপের মুখে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটকেই। তিনি নির্দেশ দিলেন, ৩০৪(ক) ধারা নয়, বরং সংযোজন করতে হবে ৩০৪ ধারাকে। এই ধারায় যে কাজ দ্বারা মৃত্যু সংঘটন হয়, তার সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান আছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় সংশোধিত ধারাগুলোতে আরো সংযোজন করলেন মারাত্মক আঘাতজনিত দণ্ডবিধির ৩২৫, ৩২৬ ধারা এবং হত্যাচেষ্টাজনিত ৩০৭ ধারাটি। এখানেও আইনের প্রয়োগে সমস্যা দেখা দিল। কেননা ৩০৪ ধারা সংযোজিত হলে এই ধারাগুলো আর প্রযোজ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে এই ভুল ধারা সংযোজনের ফলে বিচারকালে তা আসামির পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনাই থেকে যায়। বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে, রানা প্লাজা জায়গাটির প্রকৃত মালিকানা নাকি রানার বাবার নামে। তাহলে তো হতাশার মাত্রা আরো বেশি দৃশ্যমান। অন্যদিকে বিল্ডিং কোড অনুসরণ না করে ত্রুটিপূর্ণ ভবন নির্মাণের দায়ে ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইনের ১২ ধারায় মামলা করা হলেও দুই প্রকৌশলীর কাউকেই মামলার কোনো এজাহারে রাখা হয়নি। তাই ত্রুটিপূর্ণ ভবন নির্মাণের মামলায় ত্রুটিপূর্ণ এজাহারটি শুধু মামলার অসম্পূর্ণতাই নয়, বরং ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় ভবিষ্যতে যে উচ্চ আদালতে কোয়াশ বা বাতিল হবে না তার নিশ্চিয়তা কোথায়? কারণ এই অপরাধে প্রধান দোষী হচ্ছেন নির্মাণ প্রকৌশলীরা। কিন্তু প্রিন্সিপাল অ্যাকিউজড্ বা মূল আসামিদের বাদ দিয়ে সহযোগীর বিচারপ্রক্রিয়াটি আদালতে বড় প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। যদিও মন্দের ভালো এই আইনে তাদের সাত বছরের জেল হতো, বর্তমানে সেটাও কিন্তু ঝুঁকিতে রয়ে গেল।

এখন আসা যাক ক্ষতিপূরণ আদায়ের আইনে। যদিও মানুষের জীবনের ক্ষতি কিছু দিয়েই পূরণ করা সম্ভব নয়, তবু আন্তর্জাতিক আইন থেকে শুরু করে বিশ্বের সব লিগ্যাল সিস্টেমে যতটুকু বেশি ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্তকে দেওয়া সম্ভব, তা নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্টোপথে হাঁটছি শুধু আমরা। কারণ এখানে মানুষের জীবনের মূল্যের চেয়ে হয়তো ডলারের মূল্যকেই আমরা বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। নতুবা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলওর সনদকে আমরা মানতে বাধ্য বলে তাতে স্বাক্ষর করার পরও কেন আমাদের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে তারা ক্ষমতায় গেলে আইএলও সনদ অনুযায়ী দেশের শ্রম আইন সংশোধন করবে? অথচ তারাই আবার ক্ষমতায় এসে আইএলও সনদ বাদ দিয়ে মালিকদের 'সনদ' মতে শ্রম আইন সংশোধন করে। দেশে যেখানে সরকারি কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস নির্ধারিত, সেখানে কয় দিন আগের শ্রম আইনের সংশোধনীতে গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি রাখা হয়েছে মাত্র চার মাস। সেটাও আবার কেউ মানতে নারাজ। না হলে সাভারের ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দুটি শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনা আমাদের করুণভাবে দেখতে হতো না। আসলে যেখানে চার মাস মাতৃত্বকালীন ছুটিতে ২৪ হাজার টাকা মজুরি পরিশোধ না করে বরং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করাটা আইনের বিধান থাকে, সেখানে যেকোনো ব্যবসায়ীর জন্যই জরিমানা আদায় করাটা অধিক লাভজনক। কেননা আইএলও সনদ নিয়ে পাঁচতারা হোটেলে সভা-সেমিনার আর মহান মে দিবসে শ্রমিকদের শোভাযাত্রার মাঝে অনেক আগেই যে হারিয়ে গেছে আমাদের শ্রমিক অধিকারের সনদটি।

১৯৬৫ সালের শ্রম আইনে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ছিল ৩০ হাজার টাকা। তখন মজুরি ছিল ১২৫ টাকা। কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার মান ও দ্রব্যমূল্য আড়াই শ গুণ বাড়লেও ২০০৬ সালের শ্রম আইনে এই ক্ষতিপূরণ এক লাখ টাকা করা হয়,

যা সম্প্রতি মন্ত্রিসভার নতুন শ্রম আইনের খসড়া অনুমোদনের সময় দুই লাখ টাকা করা হয়েছে; যদিও ১৮৫৫ সালের মারাত্মক দুর্ঘটনা আইনে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা হিসাব করে ক্ষতিগ্রস্তের গড় আয়ুর দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিধান রয়েছে। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে এ রকম মারাত্মক অপরাধীর সম্পত্তি ক্রোক করে ট্রাস্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হতে পারে। এমনকি উন্নত দেশগুলোর মতো আমাদেরও একটি ফৌজদারি ক্ষতিপূরণ আইন প্রণয়ন করার দাবি উঠেছে। এ ক্ষেত্রে পৃথক একটি শ্রমিক নিরাপত্তা আইনের বিষয়ও মানুষের দাবিতে এসেছে। আসলে গার্মেন্ট মালিকদের অহরহ বলা কমপ্লায়েন্স শব্দটি মনে হয় বিদেশি ক্রেতাদের সন্তুষ্টির জন্যই বেশি প্রযোজ্য। আমাদের দেশের বিদ্যমান আইনগুলোরও যে কমপ্লায়েন্স মানা বাধ্যতামূলক, সেটা যেন তারা মানতেই নারাজ। ব্যবসা পেতে হলে সব রকম কমপ্লায়েন্সে রাজি মালিকরা, দেশের গরিব শ্রমিকদের জীবনের কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে কেন এতটা উদাসীন হবেন? কারণ আইন যেখানে তৈরি হয়, সেই আইনসভায় বা সংসদে সরাসরি ২৬ জন সদস্য এখন গার্মেন্ট মালিকদের প্রতিনিধি।

আর প্রচ্ছন্নভাবে গার্মেন্ট ব্যবসায় জড়িত আরো অন্তত অর্ধশতাধিক সংসদ সদস্য রয়েছেন, যা দেশের বর্তমান সর্ববৃহৎ বিরোধী দলের আসনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তাই যেখানে মালিকদের পাজেরো-প্রাডো গাড়ির জন্য বীমা করা আছে কোটি টাকার, গাড়ির প্রতিবছর প্রিমিয়াম দিতে হয় লাখ লাখ টাকার, সেখানে শ্রমিকের জন্য নেই কোনো বীমা সুবিধা। হ্যাঁ, আইনে আছে যে গোষ্ঠী বীমার আওতায় বাধ্যতামূলকভাবে ২০ জন শ্রমিকের বীমা সুবিধা রাখতে হবে। ব্যস, এতটুকুই। ২০ জনের জন্য রাখলেই যখন দায়িত্ব সম্পন্ন করা সম্ভব, তখন হাজারো শ্রমিকের জন্য কে অযথা খরচ করতে যাবে। তাও আবার বছরে মাত্র ১৭ হাজার টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে কাজ হলে ১০০ শ্রমিকের জন্য বছরে ৮৫ হাজার টাকা কেন দিতে যাবে। হাজার শ্রমিকের জন্য বছরে সাড়ে আট লাখ টাকা খরচ না করে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ফ্যাশন শো করাটাই বিজিএমইএর কাছে বেশি প্রয়োজনীয়। তা ছাড়া শত শত মানুষ হত্যা করে গণপিটুনিতে মারা যাওয়ার চেয়ে কয়েক দিন জেলে থাকাটা যখন বেশি নিরাপদ, তখন এই আইন কার জন্য- এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় আমাদের এসেছে।

এ ধরনের গণহত্যার পর্যাপ্ত শাস্তির জন্য সংসদের এ অধিবেশনেই একটি 'গণহত্যা অপরাধ আইন' পাস করে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে এসব নরঘাতককে দ্রুত বিচারের আওতায় সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের আইন সংবিধানপরিপন্থী হবে না বলে আমাদের সংবিধানের ৪৭(৩) অনুচ্ছেদে নিশ্চয়তা দেওয়া আছে। সেই সঙ্গে আমাদের সংবিধানের ৪৭-ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই আইনে আগের যেকোনো সময়ের সংঘটিত অপরাধের বিচার রেট্রোস্পেকটিভ ইফেক্টে করা যাবে। এমনকি এসব ঘাতক সংবিধানের অধীনে কোনো প্রতিকারের জন্য উচ্চ আদালতে কোনো ধরনের আবেদন করার যোগ্যতা হারাবে বলে সংবিধানের ৪৭-ক(২) অনুচ্ছেদে নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। তাই শত শত মানুষের গণহত্যাকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদানে 'গণহত্যা অপরাধ আইন' সংসদে এই মুহূর্তে প্রণয়ন করাই হবে জনগণের একমাত্র দাবি। অন্য আরো বিকল্প হয়তো আছে, কিন্তু সেগুলো আগের মতোই অন্ধকারে হারিয়ে যাবে নিশ্চিতভাবে।

ডক্টর তুহিন মালিক: *আইনজ্ঞ ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ*

সূত্র: কালের কণ্ঠ, ৩ মে ২০১৩

শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব

আয়েশা সানিয়া, সৈয়দ গালিব সুলতান, ফাহিম হাসান, নিশা নূর ও রুমানা জেসমিন খান

সাভারের ভবনধসে হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন আরও বেশি। দুর্ঘটনা-পরবর্তী বিভিন্ন আলোচনায় ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের কথা উঠে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশি একজন পোশাকশ্রমিকের জীবনের মূল্য কতখানি? কর্মক্ষম একজন মানুষের মৃত্যু তাঁর পরিবারকে যে আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়, কতটুকু আর্থিক ক্ষতিপূরণ সেই বিপর্যয় সামাল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট? অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এই মূল্যমান যাচাইয়ের কাজটি প্রায় অসম্ভব। তবু ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারগুলোকে যাতে আর্থিকভাবে বঞ্চিত করা না হয়, সে লক্ষ্যে পরিসংখ্যানগত কাঠামোর ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের সর্বনিম্ন অঙ্ক পরিমাপ করা প্রয়োজন।

সরকারি মন্ত্রণালয় ও বস্ত্রশিল্প সমিতিগুলোর নথিপত্র ও ইন্টারনেটের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ওপর নির্ভর করে আমরা এই বিশ্লেষণটি করেছি। একজন শ্রমিক কর্মস্থলে দুর্ঘটনার শিকার হলে, প্রথমে যে ক্ষতিটি আর্থিকভাবে পরিমাপযোগ্য তা হলো দুর্ঘটনার ফলে শ্রমিকটি যে উপার্জন হতে বঞ্চিত হলো, সেই পরিমাণটা। এই অর্থনৈতিক ক্ষতি পরিমাপ করার জন্য প্রথমে আমাদের জানতে হবে দুর্ঘটনার সময় শ্রমিকটির বয়স এবং বাংলাদেশে শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের গড় বয়স। শ্রমিকটি বেঁচে থাকলে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত যত উপার্জন করতেন, সেই উপার্জনকে আমরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিবেচনা করেছি। মোট মজুরির সঙ্গে বর্তমান বাজারদর, মুদ্রাস্ফীতি ও সুদের হারের সামঞ্জস্য রেখে ক্ষতিপূরণের একটি অনুমিত সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে।

সিঙ্গাপুরসহ আরও কিছু উন্নত দেশের মানবসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী, কর্মরত কোনো শ্রমিক দায়িত্ব পালনকালে মারা গেলে তাঁদের বয়সের ওপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই কম বয়স্কদের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বেশি হয়। সাভারের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা হিসাবটি করেছি এভাবে–ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বয়স ২০ বছর বা এর নিচে হলে তাঁর জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হবে ৩০ বছরের হারানো উপার্জনের সমপরিমাণ। ২১-২৫ বছর বয়সীদের জন্য ২৫ বছর, ২৬-৩০ বছর বয়সীদের জন্য ১৫ বছর এবং ৩১-৩৫ বছর বয়সীদের জন্য ১০ বছরের হারানো উপার্জনের সমান ক্ষতিপূরণ ধরা হয়েছে। শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের গড় বয়স ৫০ বছর ধরা হয়েছে, যা অবসর গ্রহণের জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। অনুমান করে নেওয়া হয়েছে অন্তত প্রতি পাঁচ বছরে একবার গ্রেডভিত্তিক পদোন্নতি হবে।

বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, কর্মরত ব্যক্তিরা মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁরা রপ্তানি বস্ত্র প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে জড়িত (শ্রমিক) এবং যাঁরা সরাসরি জড়িত নন (কর্মচারী)। কর্মচারীদের বেতনকাঠামো চারটি গ্রেডে বিভক্ত। শ্রমিকদের বেতনকাঠামো সাতটি গ্রেডে বিভক্ত। যত ওপরের গ্রেডে পদোন্নতি হয়, মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা তত বৃদ্ধি পায়। যেমন গ্রেড-৭-এর অন্তর্ভুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সুইং মেশিন অপারেটর, অ্যাসিস্ট্যান্ট নিটিং মেশিন অপারেটরদের বেতন মাসিক তিন হাজার টাকা। অন্যদিকে গ্রেড-১-এর প্যাটার্ন মাস্টার, চিফ কাটিং মাস্টারদের বেতন মাসিক নয় হাজার ৩০০ টাকা। অদক্ষ ও নতুন শ্রমিকেরা শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার সাধারণত তিন-চার মাস পরে গ্রেড-৭ শ্রমিক হিসেবে পদোন্নতি পান।

তথ্য-উপাত্তের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের কিছু অনুমানের ভিত্তিতে হিসাব করতে হয়েছে। ক্ষতিপূরণ হিসাবের সময় মূল মজুরি গণনা করা হয়েছে। ওভারটাইম, উৎসব বোনাস ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়নি। আমরা অনুমান করেছি যে

নতুন শ্রমবছরের শুরুতে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি হয় গত ২৫ বছরের গড় মুদ্রাস্ফীতির সমান হারে (৬ দশমিক ২৮ শতাংশ, তথ্যসূত্র: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক)। বাস্তবে শ্রমিকদের বেতন বছর বছর বাড়ে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ক্ষতিপূরণ এককালীন দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। এ জন্য আমরা শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ বার্ষিক মজুরির বর্তমান মূল্য (প্রেজেন্ট ডিসকাউন্টেড ভ্যালু) হিসাব করেছি। এই রেট ধরা হয়েছে গত ২৫ বছরের গড় রিয়েল ডিসকাউন্টেড রেটের সমান (২ দশমিক ৭২ শতাংশ, তথ্যসূত্র: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক) হিসেবে।

এই আলোচনা অনুযায়ী আমাদের বিস্তারিত হিসাবটি ইন্টারনেটে রয়েছে (http://savartragedz.wordpress.com)। আমাদের হিসাব অনুযায়ী, ২০ ও ২০ বছরের কম বয়সীদের জন্য ক্ষতিপূরণ সর্বনিম্ন ২৯ লাখ ৩৫ হাজার টাকা (দুর্ঘটনার সময় গ্রেড-৭) এবং সর্বোচ্চ ৫৪ লাখ ৭৪ হাজার টাকা (দুর্ঘটনার সময় গ্রেড-৩)। ২১-২৫ বছর বয়সের শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন ১৮ লাখ ১৩ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ৪৫ লাখ ৮৮ হাজার টাকা। যাঁদের বয়স ২৬-৩০ বছর, তাঁদের জন্য ক্ষতিপূরণ ১২ লাখ ৫৮ হাজার এবং ৩৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। ৩১ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের জন্য ক্ষতিপূরণ নয় লাখ ৭৮ হাজার এবং সর্বোচ্চ ২৩ লাখ ৩৪ হাজার টাকা। যাঁদের বয়স ৩৫ বছরের বেশি, তাঁদের জন্য ক্ষতিপূরণ সর্বনিম্ন আট লাখ ৯৯ হাজার এবং সর্বোচ্চ ১৪ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

এই হিসাব কেবল নিহত শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। আহত শ্রমিকদের জন্য হিসাবের কাঠামো ভিন্ন হবে। আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের খরচও বিবেচনায় আনা প্রয়োজন, যা জটিলতা পরিহার করতে আমাদের হিসাবে ধরা হয়নি। কাঠামোগত কিছু রদবদল করে আমরা বিভিন্ন মাত্রার অঙ্গহানি বা শারীরিক ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের হার হিসাব করতে পারি, যা অন্যান্য উন্নত দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। যাঁরা আহত অবস্থা থেকে অল্প সময়েই সেরে উঠবেন, তাঁদেরও ন্যূনতম দুই-তিন মাসের মজুরি এবং অন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার।

স্বল্পপরিসরে কাজ করার কারণে আমাদের হিসাব-প্রক্রিয়ায় কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, বরং মানসিক ও সামাজিক বিপর্যয়কেও বিবেচনায় আনা উচিত। সমস্যা হলো মানসিক আঘাতের মূল্যমান নিরূপণ করা দুঃসাধ্য একটি কাজ। দুর্ঘটনায় আটকে পড়া শ্রমিকদের অনেকেই বিভিন্ন মাত্রায় মানসিক আঘাত পেয়েছেন এবং তাঁদের জন্য একই কাজের পরিবেশে ফিরে যাওয়া কষ্টকর।

লেখকবৃন্দ: *যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন-সিয়াটল, ইউনিভার্সিটি অব অ্যালবার্টা, সেন্ট লুইস ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় উচ্চশিক্ষারত।*

সূত্র: প্রথম আলো, ২৭ মে ২০১৩

নয়াউদারবাদী টি-শার্ট

পাভেল পার্থ

আমরা কখনোই ন্যায্যতার সাথে আমাদের বস্ত্রইতিহাস ঘাঁটাবাছা করিনি। দেশীয় বস্ত্রকারিগরীকে খুন করে দাবিয়ে রেখে প্রশ্নহীন কায়দায় শুরু হয়েছে কর্পোরেট 'তৈরি পোশাকশিল্প বাণিজ্য'। গ্রামীণ সুঁই-সুতা আর তাঁত উদ্বাস্তু নারীদের শরীর আর মগজ ঘষে ছেনে তৈরি হচ্ছে দুনিয়াজোড়া ফ্যাশনদুরস্ত কাপড়ের ঝকমারি। আর প্রশ্নহীনভাবে ধসে পড়ছে ঝলসে যাচ্ছে একটার পর একটা স্পেকট্রাম, তাজরিন কি রানা প্লাজা। আমাদের কণ্ঠ ও কলিজা অভ্যস্ত হয়ে ওঠছে লাশের পরিসংখ্যানে। একের পর এক লাশের বলিরেখা ও চিহ্নে বারবার ছলকে উঠছে নিম্নবর্গের এক করুণ দ্রোহী ঐতিহাসিক আওয়াজ। কেউ এ আওয়াজ পাত্তা দিচ্ছে না, আড়ালের ঐতিহাসিকতাকে বাহাসে টানতে চাইছে না। কেন একটার পর একটা খুনখারাবির ঘটনা ঘটে চলেছে গার্মেন্ট শিল্পে তার একটি ঔপনিবেশিক ধারাবাহিকতা আছে, আছে নিম্নবর্গের সাথে ক্ষমতাশালীর এক ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিকতা। রাজনৈতিক বিপ্লবের ভেতর দিয়েই এ দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফায়সালা হতে হবে। তা না হলে ধস কি জালিয়াতি চেহারা পাল্টাবে আর মেদবহুল হতে থাকবে লাশের পরিসংখ্যান। আজকের গার্মেন্ট শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে এ প্রশ্নহীন খুনখারাবির জন্য দায়ি নয়াউদারবাদী কর্পোরেট ব্যবস্থা আর ঔপনিবেশিক বাণিজ্য মনস্তত্ত্ব। আজকে যারা কমদামে একটা এডিডাস কি জেসিপেনির টি-শার্ট গায়ে দেয়াকে ফ্যাশন দুরস্ত দুনিয়ায় 'জাতে ওঠা' মনে করে, হয়তো সবাই জানেনা তা তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় দুনিয়ার গরিব নারীর লাশের দামে। দুম করে হুট করে কোনো ছাপ কি ছাপ্পর না রেখে এই নিগ্রহ ও নিপীড়ন কিন্তু শুরু হয়নি। ফ্যাশন দুরস্ত জাতে ওঠার মাপকাঠি হিসেবে কাপড়ে নীল দেয়ার প্রচলনও শুরু হয়েছিল ইউরোপে। সেই নীল তৈরি হয়েছে বাংলার শত সহস্র গরিব কৃষকের লাশের দামেই। বস্ত্রনির্ভর 'আধুনিক ফ্যাশন বাণিজ্যের' ভেতরেই টানটান হয়ে আছে গরিব মানুষের লাশের দীর্ঘ সারি। নীল চাষ না করতে চাইলে চাবুকের ছোবল, মসলিন বুনন ভুলিয়ে দিতে হাত কেটে নেয়া কি আজকের দিনের গার্মেন্ট দালান ধস সবই কিন্তু একই ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্বের মেদ-মাংসে রূপান্তরিত। এক একটা লাশের জমায়েতের পর কিছুটা 'হট্টগোল' হয়, আর আমরা দেখি দুনিয়া কাঁপানো কর্পোরেট গার্মেন্ট কোম্পানিগুলো তার 'কর্পোরেট সোশ্যাল রেস-পনসিবিলিটির' মায়াকান্নার শোরগোল তুলে। তারপর সব নিশ্চুপ, আবার রাষ্ট্র লাশের অপেক্ষা করে। গৃহস্থালি বস্ত্রবুনন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক 'তৈরি পোশাক শিল্প' ঘিরে বিরাজিত আলাপ বাহাসে আমরা বারবার এ রাজনৈতিক ঐতিহ-াসিকতা আর ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব এড়িয়ে যাচ্ছি। নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদের কাছে এ নিগ্রহ 'ক্ষমতার রাজনীতি' আর নারীবাদী তাত্ত্বিকদের কাছে 'পুরুষতান্ত্রিকতা' হিসেবে পাঠ্য হলেও এর আরো গলিঘুপচি আছে। আছে চেপে রাখা করুণ বুদবুদ। কারখানা দালান ধসিয়ে সাভারের সাম্প্রতিক বস্ত্রকারিগর খুনখারাবির টানটান দোহাই থেকে চলতি আলাপটি বস্ত্র ইতিহাসের সেই প্রশ্নহীন নিগ্রহকে বোঝার চেষ্টা করছে।

বলা হয়ে থাকে বিশেষ এক জাতের কাপাস তুলার আদিভূমি মধুপুর গড়। কাপাসের সেই স্মৃতি নিয়ে এখনো বেঁচে আছে ভাওয়াল গড়ের কাপাসিয়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ এশিয়ার এক কেন্দ্রীয় তুলামহল হিসেবে টেনে এনেছিল দুনিয়ার বহিরাগত বিলিতি বণিকদের। বস্ত্রইতিহাসের সুক্ষ্ম বুনন ঐতিহ্য মসলিন জন্ম নিয়েছিল শীতলক্ষ্যা অববাহিকায়। মসলিনের মাকু ধরেই জামদানি বুটি মেলেছে এ অঞ্চলেই। নরসিংদী, টাঙ্গাইল, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মৌলভীবাজার, সিলেট, রাঙামাটি, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর অঞ্চলের মতো বিশেষ বিশেষ তাঁত ঐতিহ্য নিয়েই গড়ে ওঠেছে বাংলার করুণ বস্ত্রআখ্যান। এ আখ্যানের পরতে পরতে আছে রক্ত আর দুঃশাসনের দাগ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশ থেকে আজকের দুনিয়ার করপোরেট কোম্পানি সকলেই কেবলমাত্র বাণিজ্য আর দখলের স্বার্থে টেনেহিঁচড়ে ফালি ফালি করেছে এই বস্ত্রইতিহাস। আদিবাসী কি বাঙালি নিম্নবর্গের বস্ত্রকারিগরীকে মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্র গড়ে

তুলেনি পোশাকের ন্যায্য শিল্প। বরং রাষ্ট্র নয়াউদারবাদী বৈশ্বিক ব্যবস্থায় নিজের মাথা নুইয়ে রেখেছে। আর তাই রাষ্ট্রের গরিব নাগরিকদের তরতাজা লাশের বিনিময়ে তৈরি হচ্ছে একটার পর একটা নয়াউদারবাদী টি-শার্ট। মানুষের অধিকার আর শখের বিন্যাস আটকে যাচ্ছে বহুজাতিক 'পোশাক ব্র্যান্ডিং' বাণিজ্যের ঘেরাটোপে। Reebok, Mothercare, Lee, Wrangler, Eagle, Decathon, Lafuma, JC Penny, Walmart, KMart, OSPIG, Docken, NAB, Tommy Hilfiger, Addidas, Decathon, Phillip Morris এইসব করপোরেট বস্ত্রবণিকেরাই আজ নিয়ন্ত্রণ করছে বস্ত্র বাজার ও বস্ত্রকারিগরী। দেশীয় বস্ত্রপরিসর থেকে উচ্ছেদ হওয়া গরিব নারীর নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ এসব করপোরেট গার্মেন্টসে কাজ করে কারখানা ধসে লাশ হয়ে গুম হয়ে যাওয়া। দেশে সমসাময়িককালে প্রতিটি গার্মেন্ট বিপর্যয়ে আমরা স্থানীয় কারখানা মালিক আর এর সাথে জড়িত জাতীয় রাজনৈতিক দেনদরবারকেই বারবার টেনে আনছি। ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছে করপোরেট বস্ত্র কোম্পানিগুলো। যাদের সীমাহীন বাণিজ্য লাভ ও লোভই আজকে দেশে রানাপ্লাজার রানাদের মতো 'দেশীয়-লুটেরা' তৈরি করছে। দেশীয় গার্মেন্ট কারখানা থেকে যেসব কোম্পানি কাপড় কিনছে এবং যাদের কারখানা বহাল তবিয়তে এখানে ব্যবসা করছে তাদের সকলকেই আজ বিচার প্রক্রিয়ায় আনা জরুরি। এটি কেবলমাত্র রানাপ্লাজায় নিহত হাজার লাশের সারি কি রানা কি কোনো রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতার কাহিনী নয়। একে রাষ্ট্রের উৎপাদন ও জনগণের শ্রমের সম্পর্কের বিজ্ঞান হিসেবে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক চিন্তা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

আদিবাসী মান্দিদের আ.চিক ভাষায় সেলাই ও বুননকে সিকগা বলে। যেমন বারা সিকগা মানে কাপড় সেলাই, গান্না সিকগা মানে গান্না বোনা। মান্দিরা এককালে মধুপুর গড়ে জুমজমিনে খিল(তুলা) আবাদ করতো, জংগলে ছিল রঙের গাছ। মান্দি নারীরা তাঁতে বুনতো রঙবেরঙের দকমান্দা, দকশাড়ি। কিন্তু ১৯৫০ সনে রাষ্ট্র মধুপুরে জুমআবাদ নিষিদ্ধ করে, বন্ধ হয়ে যায় মান্দি নারীর বুনন ঐতিহ্য। হাজং আদিবাসী নারীরা বানা নামের এক তাঁত দিয়েই বুনতো নিজেদের কাপড়। অন্যায় জমিদারি টংকপ্রথার বিরুদ্ধে হাজংরা সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক টংক আন্দোলনে। ১৯৪৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ নেত্রকোনার লেঙ্গুরা বাজারে টংকবিদ্রোহীদের মিছিলে গুলি চালায়। পরবর্তীতে পুলিশ বাহিনী হাজং গ্রামে গ্রামে সাঁড়াশি অভিযান চালায়। যেসব বাড়িতে হাজংদের বানা তাঁত ছিল তাদেরকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনার পর থেকে হাজং এলাকায় বানা তাঁত পুড়ে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়। এখন আর হাজং গ্রামে কেউ বানা তাঁতে কাপড় বানায় না। একই ঘটনা দেখা যায় মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে ভানুবিল আন্দোলনের সময়েও। লীলাবতী সিংহের মতো নারীরা মণিপুরী তাঁতকেই ব্রিটিশ নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে চাবুক আর রক্তপাত সয়ে প্রায় বিনাদামে জুমের তুলা তুলে দিত হতো শাসকের জিম্মায়। কেউ যাতে আর কোনোদিন মসলিনের মতো মিহি কাপড় বুনতে না পারে এজন্য মসলিন কারিগরদের আঙুল কেটে দেয়া হয়েছিল। জামদানি কারিগরদের উপরও নেমে আসে মাত্রাহীন দুঃশাসন। দেশীয় তাঁতীদের উপর কম আক্রমণ হয়নি। পাশাপাশি বাজারে সাথে পাল্লা দিতে যেয়ে গ্রামের পর গ্রাম থেকে তাঁত নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য হয়েছে। দেশীয় বস্ত্র কারখানাগুলো একের পর এক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে চোখের সামনে। বিশ্বব্যাংক কি দাতাসংস্থার চাপে বন্ধ করা হয়েছে আদমজী পাটকলসহ পাটকারখানাগুলো। দেশীয় বস্ত্রশিল্প বিকশিত হোক এটি বাণিজ্য দুনিয়া চায়নি, বাংলাদেশের নিজস্ব বস্ত্রকারিগরী একটি বৈশ্বিক চেহারা ও মর্যাদা পাক এটি নয়াউদারবাদী ব্যবস্থারও কাম্য নয়। আর এই নয়াউদারবাদী ব্যবস্থাকে আগলে থাকা রাষ্ট্র তাই দেশীয় বস্ত্রইতিহাসকে গুম করে টেনে এনেছে করপোরেট গার্মেন্ট বাণিজ্য। যেখানে আমাদের উৎপাদন ও শ্রমের সাথে কোনো ঐতিহাসিক রাজনৈতিক দেনদরবার ও সাংস্কৃতিক টানাপোড়েন নাই। এখানে বাংলাদেশের গরিব মানুষ কেবলি একটি সংখ্যামাত্র, কি জীবিতকালে কি লাশ হলেও।

আমাদের নিজস্ব বস্ত্রবুনন ঐতিহ্য ও কারিগরী আছে। আছে হরেকরকম নকশা ও রঙের বিস্তার। নকশীকাঁথা, পাখা, টাঙ্গাইল শাড়ি, জামদানি, মসলিন, মান্দি তাঁত, মণিপুরী তাঁত, চাকমা তাঁত, কুমিল্লার খাদি, কুষ্টিয়া তাঁত কি পাবনা তাঁত সব কিছুই ভিন্ন ভিন্ন। এগুলো প্রায় সবকটিই আমাদের এক একটি অনন্য ভৌগলিক নির্দেশনা, আমাদের জাতীয় সম্পদ। তুলা থেকে সুতা বানানো থেকে শুরু করে, নানান পদের রঙ বানানো, সুতা রাঙানো এবং নানান নকশা ও রীতিতে নানান মাপের ও ধরনের কাপড় বুনন এক এক অঞ্চল ও জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। গৃহস্থালী শিল্প থেকে শুরু করে গ্রামীণ তাঁত ও দেশীয় বস্ত্রকারখানাগুলোর সাথে আমাদের একধরনের বোঝাপড়া ও দেনদরবার আছে। এখানকার দেনাপাওনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলো আমাদের মুখস্থ। এখানে আমাদের একটি কাপড়ের নকশার সাথে আমাদের চারধারের কাহিনী ও কৃত্য

জড়িত। এখানে আমাদের সবকিছুর একটি নাম পরিচয় আছে। এখানে আমাদের নিয়তি 'কেবলমাত্র একটি সংখ্যা' এবং পরিণতি 'লাশ' নয়। কিন্তু আমরা কখনোই দেশীয় এই বস্ত্রসম্ভাবনাকে রাষ্ট্রের উৎপাদন অর্থনীতির মৌল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করিনি। যে দেশে একসময় সারাদুনিয়ায় কাপড়ের তুলা জোগান দিয়েছে, যে দেশ সারা দুনিয়াকে সূক্ষ্ম বস্ত্রবুনন উপহার দিয়েছে সে দেশের জনগণের আজ পরিণতি হলো কিছু বহুজাতিক গার্মেন্ট কারখানায় লাশ হওয়া। এ অন্যায়। নয়াউদারবাদী এ চরমপন্থী ব্যবস্থাকে মেনে নেয়াটাও অন্যায়। পাহাড় সমতল থেকে ছুটে আসা গরিব মানুষের লাশের উপর দাঁড়িয়ে থাকা নিলর্জ্জ বহুজাতিক ব্র্যান্ডিং বাণিজ্যকে আজ রাজনৈতিক কায়দায় রুখে দাঁড়ানো জরুরি। যে গার্মেন্ট আজ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির শিরদাঁড়া খাড়া রাখছে বলে আমরা তুবড়ি মেরে চিৎপটাং হয়ে থাকছি, প্রশ্নটি করতে হবে আজ অর্থনৈতিক এ ধারাপ্রবাহকেই। আমরা কি বহুজাতিক কোম্পানির দাস হয়ে দেশের প্রবৃদ্ধি খাড়া রাখবো, নাকি আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক খাত বিকশিত করবো নিজেদের জ্ঞান-সম্পদ ও সরবরাহের ভেতর দিয়ে। আমরা কেন আমাদের বস্ত্রসভ্যতার অবস্মিরণীয় আখ্যানকে আজকের নয়াউদারবাদী দুনিয়ায় 'পাল্টা ব্যান্ডিং' হিসেবে হাজির করবো না? বারবার গার্মেন্ট কারখানা বিপর্যয় ও শ্রমিকের মৃত্যুতে কারখানা মালিক ও সংশ্লিষ্টদের বিচার দাবিতে সকলে সোচ্চার হয়। পাশাপাশি কারখানার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কাজের পরিবেশ, শ্রমিকের অধিকার, মজুরী বিতর্ক, সংগঠিত হওয়া ও আইনী বিষয় নিয়ে কিছু ফায়সালাহীন দেনদরবার হয়। কিন্তু জোরদারভাবে বহুজাতিক বস্ত্রকোম্পানিগুলোকে দৃষ্টান্তমূলক বিচার ও নজরদারি ব্যবস্থার ভেতরে আনতে পারিনি আমরা এখনো। সবকিছুর পরও আমরা যেন এসব বহুজাতিক বস্ত্রকোম্পানির উপরই দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির 'সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধি' ছেড়ে দিয়ে বসে থাকছি। আর বলছি, তোমার আরো 'কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবল' হওয়া উচিত। আগুন লাগলে যেন অগ্নিনির্বাপক থাকে, দালান যাতে ভেঙ্গে না পড়ে ভিতটা একটু মজবুত দরকার, সিঁড়িগুলো প্রশস্থ হলে দৌড়ে নামতে সুবিধা, একটু যেন (নিয়ন্ত্রিত) ট্রেড ইউনিয়ন করার জায়গা থাকে, দুর্ঘটনায় মরলে যেন বীমা থাকে, মরলে ক্ষতিপূরণটা যেন হাতে হাতে দেয়া হয়, শিশুদের যেন কাজে নেয়া না হয়, হাত পা কেটে গেলে যেন ফার্স্ট এইড বক্স থাকে, একটু ফ্যানের বাতাস না হলে মেয়েগুলো ঘেমে নেয়ে একসারা হয় ইত্যকার কম নমুনার 'বহুজাতিক সামাজিক দায়বদ্ধতা'। এসব 'দায়বদ্ধতার' ভেতর দিয়ে কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ করা যাচ্ছে না। কারণ নয়াউদারবাদী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক এসব কোম্পানিরাই আজ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি ও ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আজ আমাদের ঠিক এখান থেকেই প্রশ্ন ও প্রণোদনা তৈরি করা জরুরি। কিভাবে আমরা নিজেরাই নিজেদের বস্ত্রখাতকে বৈশ্বিক চেহারা ও মর্যাদায় উন্নীত করবো। বৈশ্বিক বস্ত্রবাণিজ্যের ইতিহাসে 'নয়াউদারবাদী টি-শার্টই' কেবলমাত্র সত্য নয়। দেশীয় রক্তাক্ত পোশাকশিল্পকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই আজ আমাদের এক মৌলিক রাজনৈতিক দায়িত্ব। গার্মেন্ট কারখানা বিপর্যয়ে নিহত আহত গরিব মানুষেরা বারবার এই ব্যাকরণই উচ্চারণ করে চলেছে। রাষ্ট্র কি তা শোনাবোঝার মতো দরদী ও সাহসী? আসুন, নয়াউদারবাদী টি-শার্টটিকে ছুঁড়ে ফেলি। তৈরি করি আমাদের আপন বস্ত্রইতিহাস।

পাভেল পার্থ: গবেষক

সূত্র: সাপ্তাহিক একতা, ১৯ মে ২০১৩

সাভার ট্রাজেডি, পোশাক শিল্পখাত ও ভবিষ্যৎ করণীয়

এম এম আকাশ

ভূমিকা: বাংলাদেশের জনগণ দ্রুত ঘুমিয়ে পরে। পোশাক শিল্প খাত নিয়ে সাভার ট্রাজেডির পর দ্রুত শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীই জেগে উঠেছে। কতদিন এই জাগরণ স্থায়ী হয় এবং এ থেকে যথার্থ শিক্ষা নিয়ে আমরা স্থায়ী কোন সমাধানের দিকে আগাতে পারি কি না-সেটাই এখন জাতির সামনে অগ্নি-পরীক্ষা।

সাভার ট্রাজেডি: গত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সালে সাভারের রানা প্লাজা ধ্বস নামে। ঐ ধ্বসের নিচে চাপা পরেন কর্মরত পোশাক শিল্পের অগণিত শ্রমিক। সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবী জনগণের মিলিত উদ্যোগে উদ্ধার কর্ম অব্যাহত থাকে ১৩ মে পর্যন্ত। শেষ হিসাবানুসারে ধ্বংসস্তুপ থেকে জীবিত উদ্ধার পেয়েছেন ২৪৩৮ জন। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে ১১২৩ টি। উদ্ধার হওয়ার পর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন ১২ জন। সর্বশেষ উদ্ধার পেয়েছেন পোশাক শিল্পের একজন নারী শ্রমিক যার নাম রেশমা। ধ্বংসস্তুপের মধ্যে ১৭ দিন কাটিয়ে জীবিত উদ্ধার পাওয়ার এটি একটি বিশ্ব রেকর্ড। সারা দুনিয়ায় তিনি সংবাদ শিরোনামে পরিণত হয়েছেন। বার হয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি কখনোই কল্পনা করতে পারি নি বের হতে পারব।'

রেশমার মতই আরেকজন নারী শ্রমিককে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন উদ্ধারকর্মী কায়কোবাদ। তাঁকেও জাতীয় বীরের মর্যাদা অভিষিক্ত করা হয়েছে।

বাঙালি সমাজের এইসব অপার মানবিকতার দৃষ্টান্তের পাশাপাশি যদি ামরা তাকাই এই 'ভয়াবহ দুর্ঘটনার' তদন্ত রিপোর্টের দিকে তাহলে আমরা সেখানে দেখতে পাব 'উদাসীনতা লোভ ও সুশাসনের অভাবের' এক সংমিশ্রিত জটিল 'সীনড্রোম'। আমরা সরকারি প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট থেকেই জেনেছি ভবনটির উপরের চারটি তলা নির্মাণের কোন অনুমতি ছিল না, আদিতে ভবনটিতে কোনো পোশাকে কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিল না। 'বিল্ডিং কোড' না মেনেই এই ১১ তলা ভবনটি নির্মিত হয়েছিল ও সেখানে পোশাক কারখানাগুলো স্থাপন করা হয়েছিল। পরীক্ষায় এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে দালানটির নির্মাণ মশলাও (সিমেন্ট এবং রড) ছিল ত্রুটিপূর্ণ ও নিম্নমানের। পরে সেই বিল্ডিং এ পোশাক কারখানা স্থাপন করার পর বিদ্যুতের অভাব পূরণ করার জন্য ভারী যন্ত্রপাতির পাশাপাশি ভারী জেনারেটরও স্থাপন করা হয়। এত কিছুর ভার বহনের ক্ষমতা দালানটির ছিল না। অবশ্য স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন যে বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ বিল্ডিং কোন না কোন ভাবে বিল্ডিং কোড লংঘন করে তৈরি করা হয়। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। সবচেয়ে মারাত্মক যে তথ্যটি তদন্ত রিপোর্টে বার হয়ে এসেছে তা হচ্ছে দুর্ঘটনার একদিন আগেই ভবনটির ফাটল পরিদর্শন করে পরিদর্শক ভবনটি খালি করতে নির্দেশও দিয়েছিলেন এবং ভবনের মধ্যে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সেই নির্দেশ পালনও করেছিলেন। কিন্তু রানা প্লাজার মালিক ও পোশাক কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের নিরাপত্তার আশ্বাস এবং ক্ষেত্র বিশেষে হুমকি দিয়ে পরের দিন ভবনে কাজ করতে বাধ্য করেন। এই জন্যই শ্রমিকরা দুর্ঘটনাটিকে মালিকের উদাসীনতা ও লোভের ফল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং দোষী ব্যক্তির সর্বচ্চ শাস্তি দাবী করেছেন। প্রথম দিকে সরকারের আচরণে মনে হয়েছিল যে সরকার রানা প্লাজার মালিক ও পোশাক কারখানার মালিকদের হয়তো রক্ষা করতে চাইছেন। যাই হোক প্রবল জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে বন্দি করা হয়েছে। যদিও তাদের বিরুদ্ধে ঠিক কি ধরনের মামলা জারি করা উচিত তা নিয়ে বিতর্ক এখনো অব্যাহত আছে। এ নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করা উচিত নয় বলেই মনে করি। পক্ষপাতহীনভাবে

সুষ্ঠু তদন্ত শেষে দোষী ব্যক্তিদের সর্বচ্চো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে অতীতের মতো তারা এক্ষেত্রে গুরু পাপে লঘু দণ্ড বিধানের কুশাসনের ধারার পুনরাবৃত্তি করবেন না।

'ভবন ধ্বসের' এই ট্রাজেডির ফলে বাংলা ভাষায় সম্প্রতি নতুন একটি শব্দ চালু হয়েছে: 'ফাটল আতংক'। আজকের সেমিনারে প্রকৌশলী বিশেজ্ঞরা উপস্থিত আছেন। তারা নিশ্চয় আমাদেরকে বলতে পারবেন কিভাবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে 'আতংক' সৃষ্টি না করে সকল পোশাক কারখানার নির্মাণগত ঝুঁকির পরিমাপ সম্ভব এবং করণীয় নির্ধারণ করা যেতে পারে, যাতে সত্যিকারের ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বাকিগুলো চালু অবস্থাতেই প্রয়োজনীয় মেরামতের ব্যবস্থা করা যায়। এভাবে পোশাক খাতের পোশাক খাতের উৎপাদন অহেতুক ঝামেলাও হবে না আবার শ্রমিক তার নিরাপদ কর্মপরিবেশের মৌলিক অধিকারও সংরক্ষণ করতে পারবেন। অবশ্য এজন্য হয়তো দরকার হবে প্রয়োজনীয় বিপুল সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের শক্তিশালী টিম। এই উদ্যোগ ব্যক্তি মালিকের পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় জরুরি একটি কাজ হিসেবে একে গণ্য করে সরকার, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশলীদের প্রতিষ্ঠান এবং বিজিএমএ-কে যৌথভাবে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি এই সেমিনার থেকে।

পোশাক শিল্প খাত: মাত্র ১২০০০ ডলার বার্ষিক রপ্তানি দিয়ে যেই পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু তা আজ বার্ষিক প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করছে প্রতিবছর। এই শিল্পে কাজ করছে প্রায় ৪০লক্ষ শ্রমিক। তার ৬০ থেকে ৭০ শত-াংশই হচ্ছেন নারী। মোট জিডিপি-তে এই শিল্পের অবদান প্রায় ৫ শতাংশের সমান। ম্যানুফেকচারিং খাতের সংযোজিত মূল্যে এর অংশ প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ। সমগ্র ম্যানুফেকচারিং খাতে এই শিল্পকে ধরা হয় বর্তমানে নেতৃত্বদানকারী শিল্প যেহেতু এর প্রবৃদ্ধির হার উল্কা সদৃশ। বার্ষিক ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ হারে ক্রমাগত এর প্রবৃদ্ধি হয়েছে বহুদিন যাবৎ। সম্প্রতি এত ঝামেলার পরেও এর প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশের আশেপাশে রয়েছে। সমগ্র রপ্তানীতে এর অংশ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ। যদি ধরে নেই এর অর্ধেকও কাঁচামাল কাপড় আমদানীতে ব্যয় হয়ে যায় তাহলেও সমগ্র রপ্তানী আয়ে এর নীট অবদান প্রায় ৪০ শতাংশের সমান হবে। যেহেতু সারা বিশ্বে শ্রমঘন গণ উৎপাদন (Mass production) হিসাবে পোশাকের চাহিদা রযেছে এবং শ্রমের মজুরী উন্নত দেশে আমাদের তুলনায় ৩০-৪০ গুণ বেশি সে জন্য সেসব দেশে আমাদের মত সস্তা মজুরের দেশে তৈরি পোশাক বিক্রয়ের বাজারটি প্রায় অসীম বলেই ধরে নেয়া যায়। গত ৪ মের প্রথম আলোতে প্রকাশিত 'ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল লেবার এন্ড হিউম্যান রাইটস' সূত্রের এক তথ্য থেকে দেখা যায় যে একটি জিনস শার্ট তৈরিতে খরচ পরে ৩.৭২ ডলার। অথচ আমেরিকায় তার খরচ পরে ১৩.২২ ডলার। এই ব্যবধানটি প্রধানত হয় শ্রমিক বাবদ খরচের তারতম্যের জন্য। বাংলাদেশে মজুরী খরচ পরে মাত্র ২২ সেন্ট। আর আমেরিকায় এই একই পণ্য তৈরিতে মজুরী খরচ পরে ৭.৪৭ ডলার– প্রায় ৩৪ গুণ বেশি। তাই শুধু আমেরিকা ইউরোপ নয় চীন, ভারত ও অন্যান্য মধ্যম আয়ের দেশগুলিতেও আমাদের সস্তা ও মানসম্মত গণ উৎপাদনধর্মী পোশাকের বিপুল চাহিদা রয়েছে। সেই দিক থেকে দেখলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সামনে রয়েছে সারা বিশ্ব জয় করার এক বিপুল সম্ভাবনা। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, এ জন্য কি চিরকাল আমাদের শ্রমিকদের শ্রমকে সস্তা করে রাখতে হবে? না, তা নয়। অবিকশিত পুঁজিবাদ এ কথা সত্য হলেও বিকশিত কল্যাণমূলক পুঁজিবাদে তা সত্য নয়।

বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ প্রান্তিক অর্থনীতির বিশেষ একটি সুবিধা হচ্ছে অঢেল মানব সম্পদের উপস্থিতি। স্থুলভাবে দেখলে একে বলা যায় Unskiled Labour এর অঢেল সরবরাহ। বাংলাদেশেরও প্রান্তিক দেশ হিসাবে এই মানব সম্পদ প্রচুর রয়েছে। একে পুঁজি, সামান্য দক্ষতা ও শিক্ষা দিতে পারলে অনানুষ্ঠানিক খাতের নিম্ন উৎপাদনশীল 'টুক-টাকের অর্থনীতি' থেকে একে মুক্ত করে আনুষ্ঠানিক খাত তথা মূলধারার বৃহদায়তন অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব। সরাসরি মানব রপ্তানী এবং শ্রমঘন শিল্প পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে শ্রম রপ্তানী ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই সাফল্যের উল্লেখযোগ্য নজির স্থাপন করেছে। এভাবে প্রাথমিক পুঁজির ঘাটতির সমস্যা কিছুটা মিটেছে বলে অনুমান করা যায়। আমার ধারণা অবাধ পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। কারণ অবাধ পুঁজিবাদ নিষ্ঠুর শ্রমিক শোষণের মাধ্যমে পুঁজি সঞ্চয় করে থাকে ঠিকই কিন্তু শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধক প্রয়োজনীয় আয়, তাকে দেয় না, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তির গবেষণামূলক উন্নয়ন ঘটায় না, দ্রুত মুনাফা প্রত্যাশী বলে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগও করে না এবং ভোগ কম

করে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ঝোঁক তাদের অধিকাংশরই থাকে না। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের 'Captains of Industry' -রা উৎপাদনশীল পুঁজিবাদী বিকাশে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, বাংলাদেশের মত প্রান্তিক দেশে সে ধরনের বুর্জোয়ার সাক্ষাৎ আমরা কমই পাই। বিশেষ করে বৃহৎ ক্ষমতাশালী কর্পোরেট পুঁজির/ফিনান্স পুঁজির মালিকরা রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসাজশে উৎপাদনশীল বিনিয়োগ এবং অনুৎপাদনশীল লুটতরাজ উভয়ই একই সঙ্গে জড়াজড়ি করে চালিয়ে যাচ্ছে বলে দেখা যায়। অভিযোগ আছে পোশাক শিল্পের মালিকদের উচ্চতম স্তরের অংশটি যথেচ্ছা লুটপাট না করলেও বর্তমান বিদেশে বিনিয়োগ করে বিদেশের নাগরিকত্ব ক্রয় করতে শুরু করেছেন। সেখানে কেউ কেউ আবাসস্থলও তৈরি করেছেন এবং অন্যভাবে বললে বলা যায় যে পুঁজিটা তারা শ্রমঘন পণ্য রপ্তানী করে এদেশেই সঞ্চয় করেছেন সেটা এখানে না খাটিয়ে বিদেশে চালান করে দিচ্ছেন। উল্টো দিকে লক্ষ্য করুন এদেশের দরিদ্র লোকেরা, নিজের ভিটে মাটি বিক্রি করে বিদেশে গিয়ে কাজ করে যা আয় করছেন তা খেয়ে না খেয়ে দেশেই পাঠাচ্ছেন। আর তার নীট পরিমাণ বছরে ১৫ বিলিয়ন ডলারের সমান। আর আমি আগেই বলেছি পোশাক শিল্পের মালিকেরা বছরে নীট রপ্তানী আয় করছেন মাত্র ১০ বিলিয়ন ডলার সবটা আবার এদেশেই খরচ হচ্ছে না। পোশাক শিল্পের মালিকদের তাই আমি নিজেদের কৃতিত্ব প্রচারের সময় একটু বিনয়ী হতে অনুরোধ করবো। তবে পোশাক শিল্পের যে মালিকেরা যথার্থ উৎপাদনশীলভাবে ব্যবসা চালাতে চান তাদেরও কিছু ন্যায্য অভিযোগ আছে। যেমন:

ক) রাষ্ট্র আমাকে বিদ্যুৎ ও ভৌত অবকাঠামো (জমি গ্যাস যোগাযোগ) দিচ্ছে না। টাকা দিয়েও পাচ্ছি না।

খ) এলাকায় লুম্পেন সর্বহারা গোষ্ঠী (যেমন: ঝুট ব্যবসায়ী), অসৎ ট্রেড ইউনিয়ন, ঘুষ গ্রহীতা সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার আমলা, চাঁদাবাজ, মাস্তান ইত্যাদিরা আমাকে শান্তিতে ব্যবসা করতে দিচ্ছে না।

গ) আমি প্রাথমিক পুঁজি ব্যাংক থেকে ধার করেছিলাম সেখানে সুদের হার ১২ শতাংশ। আমার এখানে যে মুনাফা অর্জিত হয় তার বিরাট একটি অংশ চলে যায় এই সুদ দিতে দিতে। রাতে দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হয় না।

ঘ) আমেরিকার বাজারের ক্রেতা আমার পণ্যের যে মূল্য দিচ্ছেন তার খুব সামান্য অংশই আমি পাই। (পূর্বোল্লেখিত সূত্রের তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে একটি পোলো শার্টের ক্রেতা প্রদত্ত দাম হচ্ছে ১৪ ডলার, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিক্রেতার এফ.ও.বি. দাম হচ্ছে মাত্র ৫.৬৭ ডলার। অন্য দিকে একটি জিনস শার্টেও জন্য আমেরিকার ক্রেতা যেখানে দিচ্ছেন ১৩.২২ ডলার, সেখানে বাংলাদেশী বিক্রেতা পান মাত্র ৩.৭২ ডলার!)

ঙ) সর্বশেষ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রায়ই আমার 'স্টক লোড' হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বিবিধ রাজনৈতিক কারণে হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বিবিধ রাজনৈতিক কারণে আমি যথাসময়ে ক্রেতার কাছে মাল পৌছাতে ব্যর্থ হই। ফলে ক্রেতার কাছ থেকে অর্থ আসতেও দেরি হয়। একেকটি বৃহৎ কারখানায় মজুরী তহবিল প্রায় ২-৪ কোটি টাকার সমান। সময় মত টাকা না পেলে সময়মত মজুরী পরিশোধও তখন কঠিন হয়ে যায়।

মালিকপক্ষের এসব বক্তব্যেও মধ্যে কিছু যুক্তি রয়েছে এবং রাষ্ট্রের উচিৎ এগুলি সমাধানের রাস্তা খুঁজে বার করা। কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন তারা নিষ্ঠুরভাবে শ্রমিক শোষণ অব্যাহত রাখবেন, শ্রমিকদের কোন সংগঠিত হওয়ার অধিকার দেবেন না এবং নিরাপদ স্থানে তাদের পুঁজি স্থানান্তরিত করবেন– সেটাও সামাজিক ও নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য কোন প্রস্তাব হতে পারে না। তাদেরকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসার অনুরোধ করবো। আমি ড. ইউনুসের মত তাদেরকে social capitalist হওয়ার অনুরোধ করছি না, তাদেরকে আমি উৎপাদনশীল কল্যাণমূলক পুঁজিবাদের অধীনে রাষ্ট্র ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা বাদ দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের নিয়ন্ত্রণের অধীনে কিছুটা সংযম ও সভ্যতা বজায় রেখে চলার প্রস্তাব দিচ্ছি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ৭২-এর সংবিধানের মূল স্পিরিটও কিন্তু সেই দিকেই নির্দেশ করে।

ভবিষ্যৎ করণীয়

পোশাক শিল্পকে আলোকিত পোশাক শিল্পে পরিণত করার জন্য আমাদের স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী অনেকগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে। এসব পদক্ষেপের পক্ষে বিস্তৃত যুক্তি তুলে ধরার অবকাশ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নেই।

এসব সুপারিশের মৌলিক যৌক্তিক ভিত্তিটি পাঠক অবশ্য আগের অধ্যায়গুলির আলোচনাতেই পাবেন। এই অধ্যায়ে শুধু সংক্ষেপে সুপারিশগুলি তুলে ধরা হচ্ছে:

স্বল্প-মেয়াদী সুপারিশসমূহ:

১. দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশের ৫০০০ পোশাক কারখানার নির্মাণ মান পরিমাপ করে ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ ও করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

২. 'ফাটল আতংকের' কারণে অহেতুক উৎপাদন যাতে বন্ধ না হয় সেহেতু উপযুক্ত সার্টিফিকেশান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

৩. পোশাক শিল্পের রপ্তানী কন্টেইনার বা পরিবহনকে হরতালমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. শ্রমিক-মালিক সকল বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য আই.এল.ও-র কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ সংবিধান প্রদত্ত ধারা অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা সুরক্ষা জন্য দেশের আইনকে প্রয়োজনমত সংশোধন করে কার্যকর করতে হবে।

৫. ওয়েজবোর্ডের গঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। ন্যায়সঙ্গত ন্যূনতম মজুরীর মাত্রা কি হওয়া উচিৎ তা নিয়ে অনেক বড় আলোচনার প্রয়োজন। তবে সূত্রপাত হিসাবে নিচে কিছু ইস্যু বন্ধনীর মধ্যে তুলে ধরা হলো।

[বর্তমানে শ্রমিক নেতৃবৃন্দেও ন্যূনতম মজুরী দাবী হচ্ছে মাসিক ৮০০০ টাকা। আমি একজন শ্রমিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার জীবনযাত্রার জন্য ন্যূনতম খরচ কত হওয়া উচিৎ? তার প্রদত্ত হিসাবটি ছিল নিম্নরূপ–

ক) ৩ জন মিলে একটি কক্ষ বাথরুম সুবিধাসহ ভাড়া ৩০০০ টাকা। অর্থাৎ মাথাপিছু ভাড়া	১০০০ টাকা
খ) প্রতিদিন ৩ বেলা খাবার খরচ কমপক্ষে জনপ্রতি ১০০ টাকা হিসাবে মাসিক	৩০০০ টাকা
গ) যাতায়াত খরচ	৫০০ টাকা
ঘ) চিকিৎসা ব্যয়	৫০০ টাকা
ঙ) পকেট খরচ	৫০০ টাকা
সর্বমোট	৫৫০০ টাকা

তবে আমরা সাধারণ ধারণায় দেখি বর্তমানে একজন ক্ষেতমজুরের মজুরি দৈনিক ৩০০ টাকা, সেই হিসাবে মাসিক আয় দাঁড়ায় ৯০০০ টাকা। শহরাঞ্চলে ফ্ল্যাট বাড়িতে অষ্টম শ্রেণি পাশ দারোয়ানের বেতন হচ্ছে মাসিক ৭ হাজার টাকা। গড় করলে ৮ হাজার টাকা ন্যায্য বলেই মনে হয়। তবে মালিকরা দাবী করেন যে এই ৮ হাজার টাকা হচ্ছে 'টেকহোম স্যালারি' আর সবচেয়ে নিচের স্তরে কর্মরত অপারেটরদেরও সব মিলিয়ে টেক হোম স্যালারি ৫ হাজার টাকার হয়ে যায়। এটা সত্য ধরে নিলে ট্রেড ইউনিয়নের দাবীর তাৎপর্য দাঁড়ায় বর্তমান ন্যূনতম বেতনকে আরো ৩০০০ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থাৎ বর্তমান ন্যূনতম মজুরীর ১০০ শতাংশ বৃদ্ধির দাবীটিই এখন সামনে চলে এসেছে। প্রয়োজনের নিরিখে এই দ্বিগুণ মজুরীর দাবিটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক মহলেও স্বীকৃত। ড. ইউনুসের প্রবন্ধেও এই দাবিটি তুলে ধরা হয়েছে। তবে মালিকরা একযোগে নিশ্চয় এইকথাই বলবেন যে এতে কারখানা চালানোয় যাবে না, লাভই থাকবে না। এ কথা কি সত্য বলে মানা যায়? পূর্বোল্লেখিত সূত্রের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, একটি পোলো শার্টের ক্ষেত্রে 'কারখানার মার্জিন' অর্থাৎ মালিকের নীট প্রাপ্তি হচ্ছে যে জায়গায় ০.৫৮ ডলার, সেখানে মজুরী হিসাবে শ্রমিকের প্রাপ্তি হচ্ছে ০.১২ ডলার। এ হিসাব ঠিক হলে মালিকপক্ষ যদি তার ২১ শতাংশ সেক্রিফাইস করতে রাজি হন তাহলেই তাৎক্ষণিকভাবে

শ্রমিকের মজুরী দ্বিগুণ হয়ে যাবে। সুতরাং জিনিসটা নির্ভর করছে মালিকদের Mindset এর উপর। যে সব কারখানার মালিক বিপুল মুনাফা করছেন (ব্যাঙ্ক সাপ্লাই এর মাধ্যমে) তাদের চিন্তা করে দেখতে হবে তারা শ্রমিকদের পোপের ভাষায় বর্তমান 'ক্রীতদাসসুলভ জীবন' আর কতদিন অব্যাহত রাখতে চান তারা। 'বিলস'-এর অর্থায়নে ২০০৯ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় আমি দেখেছিলাম যে মালিকেরা যদি তাদের অর্জিত মুনাফার ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা দিতেন তাহলেই প্রতিবছর সেখানে ৩০০ কোটি টাকা জমা হোত। এ দিয়ে শ্রমিকদের জন্য নতুন নতুন বাসস্থান তৈরি করা যেত। তাছাড়া কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বহুদিন ধরে মালিকদের বলে আসছেন স্বল্পমূল্যে শ্রমিকদের রেশন দেয়া হোক। এসব কল্যাণমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী করলে আর্থিক মজুরী বৃদ্ধির প্রয়োজনও কিছুটা কমে যেত। তবে নবগঠিত ওয়েজবোর্ড এখনও তাদের চুড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করেন নি। যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তাতে জানা যায় যে 'কল্যাণ তহবিলের' প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। কিন্তু তার ৮০ শতাংশই নাকি ব্যয় করা হবে শ্রমিকদের তথাকথিত পার্টিসিপেটরি কমিটির মাধ্যমে। এটা নতুন করে পোষ্য শ্রমিকনেতা তৈরির কৌশল বলেই মনে হচ্ছে। এসব কায়দা কৌশল বাদ দিয়ে সরামরি স্বচ্ছভাবে শ্রমিকদের এ্যাকাউন্টে এই কল্যাণ তহবিল জমা দেয়ার ব্যবস্থা করাটা বাঞ্চনীয় হবে। এছাড়া স্থায়ী ওয়েজ বোর্ড গঠন করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বা অন্যান্য প্রকৃত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিও হিসাবটি নিয়ে আর্থিক মজুরীর নিয়মিত সংশোধনের ব্যবস্থাটি করতে পারলে লাভ হবে। এছাড়াও সময়মত উৎসব ভাতা প্রদান, মজুরী প্রদান, নিয়মানুযায়ী ওভারটাইম প্রদান, উপযুক্ত পীস রেট প্রদান, শ্রমিককে ঠিকমতো সেই পিস রেট আগেই জানিয়ে দেয়া ইত্যাদি অনেকগুলো জটিল ইস্যুও রয়েছে। এগুলি সমাধানের শ্রেষ্ঠ শান্তিপূর্ণ উপায় হচ্ছে স্থায়ী মজুরী বোর্ডের পাশাপাশি কারখানাভিত্তিক স্থায়ী নিবাচিত দর-কষাকষির এজেন্ট তথা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে স্বীকৃতি প্রদান।

দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী করণীয়ঃ

১. পশ্চাদবর্তী ও ঊর্ধ্বমুখী (Backward and Forward) লিংকেজ স্থাপন করার মাধ্যমে সমগ্র বস্ত্র ও পোশাক শিল্প খাতের আধুনিকায়ন করতে হবে।

২. সরকারের কাছে পেশকৃত মালিকদের ন্যায্য দাবিগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. সারাদেশে পোশাক শিল্পের জন্য সুশিক্ষিত কর্মী বাহিনী তৈরির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতাদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে দর কষাকষি অব্যাহত রাখতে হবে। পোশাক বিক্রয়ের বাজারকে বহুমুখি করতে হবে। Compliance এর জন্য বর্ধিত খরচ হলে সেই বর্ধিত খরচের অংশবিশেষ যাতে যাতে ক্রেতারাও বহন করতে রাজী হন সে জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

৫. বর্তমানে যে সাব কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থা রয়েছে তাতে ক্রমশ স্বচ্ছতা ও নজরদারীর উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে।

৬. নতুন সামাজিক উদ্যোক্তারা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে পোশাক শিল্প খাতে শ্রমিকদেরও মালিকানার শেয়ার প্রদান করে পরিচালনা বোর্ডে তাদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে এগুলি চালু করে দেখতে হবে শ্রমিক মালিকানায় বিকেন্দ্রীভুত সামাজিক মালিকানার এই মডেল বাংলাদেশে কতখানি কার্যকরী হয়। পরে এটা সফল হলে এর বিস্তৃতায়ন করা যেতে পারে।

এইভাবেই দীর্ঘমেয়াদী গড়ে উঠতে পারে এক আলোকিত পোশাক শিল্প খাত।

সূত্রঃ ১৭ মে 'শ্রমিক আওয়াজ' পত্রিকা আয়োজিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ হিসেবে লেখাটি পঠিত হয়।

রানা প্লাজা ধস ও পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

রানা প্লাজা ধস বিশ্বের ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদন-শৃঙ্খলের জন্য এক অচিন্তনীয় ঘটনা, শ্রমিকের নিরাপত্তাহীন কর্মপরিবেশের অনন্য উদাহরণ। এ দুর্ঘটনা উৎপাদন-শৃঙ্খলের সুশাসনগত দুর্বলতার বড় নজির। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী উৎপাদন-শৃঙ্খলের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে শ্রমিকের অধিকারসংক্রান্ত সামাজিক কমপ্লায়েন্সের উন্নয়ন না হওয়া ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছিল। সে সময় রানা প্লাজার দুর্ঘটনা কার্যকর সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পোশাকশিল্পের আন্তর্জাতিক উৎপাদন-শৃঙ্খল পুনর্গঠনের বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে।

রানা প্লাজা ধসের পর উৎপাদন-শৃঙ্খলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা নিজেদের অবস্থানগত দুর্বলতা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়েছে দেশি উদ্যোক্তা, সরকার, আমদানিকারক, উন্নয়ন অংশীদার ও আন্তর্জাতিক সংস্থা। গৃহীত ব্যবস্থাদির উল্লেখযোগ্য অংশ বাংলাদেশকেন্দ্রিক। এসব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে কারখানা পর্যায়ে শ্রমিকের কর্মনিরাপত্তা উন্নত করা, উন্নত শিল্প সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং শ্রমিকের জীবনমান উন্নত করা। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাক খাতে যে নানামুখী সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কাজ চলছে, তা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে স্বাক্ষরিত 'কমপ্যাক্ট' চুক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি পুনরুদ্ধারের শর্ত হিসেবে প্রদত্ত কর্মকৌশল, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কারখানা সংস্কার ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিভিন্ন উদ্যোগের অংশবিশেষ। একই সময়ে পোশাক খাত বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। পোশাক খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। এসব প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।

ক. চলমান সংস্কার কি পোশাক খাতের সক্ষমতা বাড়াবে? এক কথায় বললে, এটা বাংলাদেশে পোশাক খাতের শ্রমিক-সম্পর্কিত কাঠামোগত ও সামাজিক কমপ্লায়েন্সের সক্ষমতা বাড়াবে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার আগে সামাজিক কমপ্লায়েন্সে কম সংবেদনশীল পণ্য যেমন স্বল্পমূল্যের নিট ও ওভেন পণ্যে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা নিজেদের দক্ষতা ও সক্ষমতা ধরে রেখেছিল। এমনকি তা বেড়ে কমপ্লায়েন্স-সংবেদনশীল মধ্যম মানের পণ্যে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছিল। রানা প্লাজা ধস এ অগ্রগমন প্রক্রিয়াকে শ্লথ করে দেয়। বর্তমানে গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে সে সক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সুযোগ রয়েছে।

সরকারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু লক্ষণীয় অগ্রগতি। শ্রম আইন ২০০৬ সংস্কার করে সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩ জারি করা হয়েছে। অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের অধীনে কারখানা পর্যায়ে অগ্নি, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা চিহ্নিত করার কাজ চলছে। কারখানার প্রাথমিক তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ চলছে এবং কারখানা পর্যায়ে নতুন নতুন শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধিত হচ্ছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারকে আংশিক অর্থ সহায়তা এবং আহত শ্রমিকদের একাংশকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নতুন কারখানা পরিদর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং আরও নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। মাত্র দেড় বছরে এ কাজ সম্পন্ন হওয়া আপাতভাবে বড় অগ্রগতি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ তিন দশক ধরে অব্যাহত অবহেলার কারণে পুঞ্জীভূত জরুরি অনিষ্পন্ন কাজের দীর্ঘ তালিকা বিবেচনা করলে এই অগ্রগতি যথেষ্ট নয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

তবু সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন রকমের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। অনেকে বলছেন, মাত্র ২ শতাংশ কারখানা ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মনে রাখা দরকার, এই ২ শতাংশ শুধু কাঠামোগত ত্রুটিপূর্ণ ভবনের সংখ্যা। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের

কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার জন্য অধিকতর দায়ী অগ্নি ও বৈদ্যুতিক ত্রুটিযুক্ত কারখানা ৯০ শতাংশের ওপরে। নতুন শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধনের পাশাপাশি কিছু কারখানায় শ্রমিক নেতাদের সংগঠন গড়ার চেষ্টার জন্য নিগৃহীত হতে হচ্ছে। অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সভুক্ত কারখানা পরিদর্শনের কাজ এগোলেও অনেক ছোট বা সাব-কনস্ট্রাকটিং কারখানার পরিদর্শনের কাজ এগোচ্ছে ধীরগতিতে। চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কারখানা পর্যায়ে উদ্যোগে ধীরগতি রয়েছে। তবে এসব সংস্কার সুচারুভাবে সম্পন্ন করা গেলে পোশাক খাতের 'কমপ্লায়েন্স' আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে, যা বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ইমেজ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে। সুতরাং স্বল্প মেয়াদে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকলেও মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে এ সংস্কার কাজ বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়িয়ে নতুন পর্যায়ে উন্নীত করবে।

খ. গৃহীত সংস্কার কতটা ব্যয়বহুল? কারখানা পর্যায়ে চিহ্নিত সমস্যাগুলোর অধিকাংশই অগ্নি ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি, যা শুধু ব্যবস্থাপনাগত সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব। তবে অগ্নি দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কারখানাগুলোকে অগ্নি প্রতিরোধক 'ফায়ার ডোর' স্থাপন এবং দুর্ঘটনাকালে পানি ছিটানোর জন্য 'স্প্রিংকলার' ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে, যা ব্যয়সাপেক্ষ। আশার কথা, এ বাড়তি ব্যয় মেটাতে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করছে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাপানি সংস্থা (জাইকা), আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ করপোরেশন (আইএফসি) ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো। চলতি অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কারখানা পর্যায়ে অগ্নিনির্বাপণে প্রয়োজনীয় পণ্যের কাঁচামাল বিনা শুল্কে আমদানির সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বাড়তি ব্যয় মেটাতে সরকার উদ্যোক্তাদের কর হার উৎপাদিত রপ্তানি মূল্যের ০.৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ০.৩ শতাংশ করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের ঋণসুবিধা বাড়ানো হয়েছে। অপ্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে অর্থ সুবিধা ২ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে বাড়ানো হয়েছে। এসব ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যয়ের বাড়তি চাপ অনেকাংশে কমাতে সহায়তা করছে।

তবে দুশ্চিন্তার বিষয়, ছোট ও সাব-কনস্ট্রাকটিংয়ে নিয়োজিত কারখানাগুলো বাড়তি ব্যয় মিটিয়ে সক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে কি না। বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, সাব-কনস্ট্রাকটিংয়ে নিয়োজিত কারখানাগুলোর নিজস্ব ভবন না থাকলে তারা সেগুলো থেকে পণ্য কেনা কমিয়ে দেবে। কারণ, এসব কারখানায় পর্যাপ্ত অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আবার সরাসরি রপ্তানিকারক নয় বলে এসব কারখানা ওপরে বর্ণিত অনেকগুলো সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে এসব কারখানার জন্য বাড়তি ব্যয়ের চাপ মিটিয়ে ন্যূনতম মুনাফা ধরে রাখা কষ্টকর হতে পারে। তবে বিজিএমইএর বরাত দিয়ে রানা প্লাজা ধসের পর ২০০-এর ওপর কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে তথ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা ভ্রমাত্মক। এসব কারখানার অধিকাংশই রানা প্লাজা ধসের বহু আগে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতায় বন্ধ হয়েছে। তবে সাব-কনস্ট্রাকটিং কারখানায় সংস্কারকাজ সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা প্রয়োজন হতে পারে।

বাংলাদেশের পোশাক খাতকে ভবিষ্যতে 'উচ্চ কমপ্লায়েন্স-উচ্চ মজুরি' এবং 'উচ্চ ব্যয়-উচ্চ আয়' কাঠামোতে পরিচালিত হতে হবে। বাড়তি ব্যয় মেটাতে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কারখানার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্যকাঠামো পরিবর্তন করে উচ্চ ও মধ্যম মানের পণ্য উৎপাদন বাড়ানো বিশেষ প্রয়োজন। উৎপাদন চেইনের সব পর্যায়ে বাড়তি ব্যয় সমন্বয়ের প্রস্তুতি থাকলে ক্ষুদ্র-মাঝারি কারখানা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকার কথা নয়।

গ. কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম কি পোশাক খাতকে অস্থিতিশীল করতে পারে? সংশোধিত শ্রম আইন ২০১৩-এ কারখানা পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন করা সহজতর করা হয়েছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ২২৮টি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন হয়েছে। এ ছাড়া আরও ৭০টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এখন পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ইতিবাচকভাবে এগোচ্ছে। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধে ইউনিয়নগুলো ধীরে হলেও কাজ করছে। কার্যকর ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। একইভাবে উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক এবং সুপারভাইজার পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন-সম্পর্কিত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। উন্নততর শিল্প-সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া পোশাক খাতে স্থিতিশীলতা ধরে রাখা কষ্টকর। আশা করা যায়, কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম জাতীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকবে। নতুবা কারখানায় উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে এবং শ্রমিক হয়রানি বন্ধে আলাদা শিল্প-সম্পর্ক আইন প্রয়োজন হতে পারে।

ঘ. বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা ভবিষ্যতে বহাল থাকবে কি? বিগত দশকগুলোতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অগ্রাধিকারমূলক বাজারসুবিধা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, ভারত, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়াসহ বিভিন্ন বাজারে শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা আছে। রানা প্লাজা ধসের পর যুক্তরাষ্ট্র শুল্কমুক্ত সুবিধা স্থগিত করেছে। তবে তৈরি পোশাক এ সুবিধার আওতা-বহির্ভূত ছিল।

আগামী দিনে প্রধান বাজারগুলোতে বাজারসুবিধা অব্যাহত রাখা বা সুবিধা পুনর্বহালের বিষয় অনেকাংশে নির্ভর করছে বর্তমান সংস্কার কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ওপর। যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া ১৬টি বিষয়সংবলিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কমপ্যাক্টের বাস্তবায়ন কিছুটা ধীরে এগোচ্ছে। শুরুর দিকের তুলনায় বাস্তবায়নের এখন গতি বেশ মন্থর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেতিবাচক কর্মকান্ডও দেখা যাচ্ছে। আবার বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মধ্যম পর্যায়ে এসেই বাজারসুবিধা পুনর্বহাল না হওয়াকে রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এসব ঘটনায় সংশিষ্ট পক্ষগুলোর শ্রম অধিকারসংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু চলমান সংস্কার কাজগুলো থেকে পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই।

ঙ. দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিবেশ উন্নয়ন হবে কি? আশা করা যায়, বর্তমান সংস্কার কার্যক্রম বাংলাদেশের পোশাক খাতকে কাঠামোগত ও সামাজিক কমপ্লায়েন্সে 'এককালীন' সক্ষমতা দেবে। কিন্তু তা অব্যাহত রাখতে সব ধরনের ধারাবাহিক উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ-সম্পর্কিত সক্ষমতা বাড়ানো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রয়োজন। এসব সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা আরও প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিচালিত হওয়া দরকার, যেখানে প্রেসিডেন্ট বা পরিচালকদের ভূমিকা হবে নীতিনির্দেশনামূলক। কারখানা পর্যায়ে করপোরেট কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। শ্রম সংগঠন, শ্রম অধিকার ও উদ্যোক্তা-শ্রমিক পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সবশেষে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রধানদের নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা এ খাতের সব অংশীজনের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: *অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)*

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ৬ নভেম্বর ২০১৪

রানা প্লাজা ট্রাজেডির এক বছর : গার্মেন্টস শ্রমিকের কাজ, নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ এবং আজকের বাস্তবতা

বিগত ৩০ বছর আগে অর্থাৎ আশির দশকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সস্তা শ্রম ও কোটা সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে এ শিল্প আজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বড় বড় দেশে সম্প্রসারিত করেছে এর বাজার এবং পরিণত হয়েছে বর্তমানে দেশের শ্রেষ্ঠ রপ্তানীমুখী শিল্পে। সাফল্য সত্ত্বেও বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে আজ শঙ্কার মুখে। মালিকপক্ষের লোভমত্ত কর্মকাণ্ড আজ শতভাগ রপ্তানীমুখী এ শিল্পকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষ আজ উদ্বিগ্ন। কেননা, অগণিত শ্রমিকের জীবনীশক্তি নিংড়ানো কুশলী হাতের ছোঁয়ায় তৈরি নানা ফ্যাশনের পোশাকের অন্তরালে ক্রমশই জমা হচ্ছে শ্রমিকের রক্তের ছোপ।

দেশের রপ্তানি খাতের বড় একটা অংশই আসে তৈরি পোশাকশিল্প খাত থেকে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে তাজরীন গার্মেন্টেসে অগ্নিকাণ্ড ও রানা প্লাজা ধসে শত শত শ্রমিকের পাণহানির ঘটনায় গোটা পোশাক খাতই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেছে। শ্রমিকরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। মানা হচ্ছে না নির্ধারিত মজুরি কাঠামো। নিশ্চিত হচ্ছেনা শ্রমিকদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ। বিভিন্ন অনিয়ম আর সুযোগের সদব্যবহার করে কারখানাগুলো চালানো হচ্ছে শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়টি বাদ দিয়েই। মানা হচ্ছে না কোন নীতিমালা। ফলে প্রতি বছরই অগ্নিকান্ড বা ভবন ধসের ঘটনা ঘটছে। আর প্রাণহানি হচ্ছে শত শত নিরীহ শ্রমিকের। প্রশ্ন উঠছে শ্রমিকের কাজ ও জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে। তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। সরকারের সফল পদক্ষেপও খুব একটা লক্ষনীয় নয়।

প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ব্যাপক সাফল্যের একমাত্র কারণ হলো সস্তা শ্রমবাজার। ২০১২ সালের ২৫ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমস 'ওয়েজেস ইন বাংলাদেশ ফার বিলো ইন্ডিয়া' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, তৈরি পোশাকের বাজারে বর্তমানে চীনের পর বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শ্রমিকের বেতন একেবারেই কম হওয়ায় রপ্তানির বাজারে কয়েক বছরেই ভারতের স্থান দখল করেছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশের নারী শ্রমিকদের পারদর্শিতা। স্বল্পবেতন সত্ত্বেও তারা জীবিকার প্রয়োজনে সেলাইকাজ চমৎকারভাবে করে যাচ্ছেন। টমি হিল ফিগার, গ্যাপ, ক্যালভিন ক্লাইনের মতো বিশ্বসেরা ব্র্যান্ডের কাপড় মাত্র ৩৭ ডলার মাসিক মজুরিতে তাঁরা তৈরি করেছেন নিপুণ কারিগরের মতো।

পোশাকশিল্প মালিকদের কোটি কোটি টাকার মুনাফা এনে দিয়েছে এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার বড় করেছে যে শিল্প, সেই শিল্পের শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকে কেন এত কম দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে? কেন শ্রমিকদের জীবন আজ ঝুঁকির সম্মুখীন, কেন তাঁদের সম্মিলিতভাবে দাবি আদায়ের সুযোগ দেওয়া হয় না? আন্তর্জাতিক ক্রেতারা আমাদের দেশ থেকে তৈরি পোশাক কেনার সময় অর্থ-সাশ্রয় করতে চাইলে এই দেশের শ্রমিকেরাই কেন শোষিত হন, কেন তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়গুলো বার বার উপেক্ষিত হয়? শ্রমিকের নিরাপত্তার সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো: মজুরি, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, কমপ্লায়েন্স, ট্রেড ইউনিয়ন ও ক্ষতিপূরণ। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

মজুরি ও বেতন কাঠামো

গামেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের সমস্যার মধ্যে প্রথমেই যে বিষয়টি আসে তা হলো মজুরি। এ শ্রমিকদের মজুরির পরিমাণ এতটাই কম যে তার মাধ্যমে বর্তমান বাজারদরে একটি পরিবারের জীবন ধারণ দুঃসাধ্য। আর যখনই শ্রমিকেরা এই দুঃসাধ্য জীবন ধারণ থেকে পরিত্রাণ পেতে মজুরি বাড়ানোর দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে, তখনই বলা হয় একটি মহল ষড়যন্ত্র করে দেশের গামেন্টস শিল্পকে ধ্বংস করতে গামেন্টস অরাজকতা সৃষ্টি করছে। সাধারণ শ্রমিকদের আশঙ্কার সৃষ্টি হয়, আন্দোলন করলে তারা যা পাচ্ছে তা থেকেও বঞ্চিত হবে। এভাবে দেশের গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের অনেকটা ফাঁদে ফেলেই স্বল্প বেতনে কাজ করানো হচ্ছে।

গার্মেন্টস শিল্পের উন্নতির সাথে শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে মালিকদের অবহেলাও বেড়েছে। সরকারকেও সেভাবে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর জীবন ধারণের বাজারদর পরিসংখ্যান করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছিল। সরকারি কর্মীদের জন্য সর্বনিম্ন মূল বেতন ধরা হয়েছিল ৪১০০ টাকা আর গামেন্টস শ্রমিকের জন্য ২৪০০ টাকা। এই মূল বেতন কাঠামোটির পার্থক্যটি ছিল সত্যিই অবাস্তব। দেশের জিডিপি বেড়েছে। বেড়েছে দেশের মাথাপিছু আয় যা প্রায় ১ হাজার ৪০ ডলার (৬ হাজার ৯ শত টাকা)। এই আয় বৃদ্ধির অবদান এদেশের গার্মেন্টস শিল্পের। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ আয় হয় গামেন্টস শিল্প থেকে। দেশের গামেন্টস শিল্পের মেশিনারিজসহ সকল কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং দেশের শ্রম এই আমদানিকৃত কাঁচামাল পণ্যে রূপান্তরিত করে। এই পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করে দেশ। তাহলে এই শ্রমের প্রকৃত মূল্য করতেই এত অনীহা।

সম্প্রতি ডব্লিউআরসি এক গবেষণায় দেখিয়েছে যে, ২০১২ সালেও যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানীতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল। অবস্থান ভালো হলেও শ্রমিকদের মজুরি কমে গেছে ২ দশমিক ৩৭ শতাংশ। একই সময়ে চীনের মজুরি ১২৫ শতাংশ বেড়েছে। সিএনএন-এ প্রকাশিত যুক্তরাজ্যের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এর তথ্য অনুসারে যদি বৈদেশিক বিনিয়োগকারী একটি টি-শার্টে মাত্র ৩ সেন্ট বেশি দাম দেয় তাহলেই এদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন দ্বিগুণ করা সম্ভব।

শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে বেশ কয়েক ধাপে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়। আশির দশকে গড়ে উঠলেও ১৯৯৪ সালে প্রথমবারের মত শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম মজুরি ৯৬০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। ২০০৬ সালে শ্রমিকদের প্রবল আন্দোলনের মুখে মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। কিন্তু শ্রমিকদের প্রবল আপত্তির মুখে মাত্র এক হাজার ৬৬২ টাকা মজুরি ঘোষণা করা হয়। তিন বছর পর আবার মজুরি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুই মজুরি বোর্ডের মাঝখানে কয়েক দফা মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও মালিক বা সরকার পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। ফলে ২০১০ সালে শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শ্রমিক অসন্তোষের পর সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি তিন হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। চীনে এই মজুরি বাংলাদেশের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি। ২০১০ সালের বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাতের সবচেয়ে সস্তা শ্রমবাজার বাংলাদেশ।

সর্বশেষ ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য তিন হাজার টাকা বেসিক নির্ধারণ করে, ৫ হাজার ৩০০ টাকার ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে ৭ম গ্রেডে বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা হয়। ৩০০০ টাকা মূল বেতনের সঙ্গে বাড়িভাড়া ১২০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ২৫০, যাতায়াত ২০০ এবং খাদ্য ভর্তুকি বাবদ ৬৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয় ৭ম গ্রেডের একজন শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরিতে। এ ছাড়া প্রতিবছরই ৫ শতাংশ হারে বেসিক বৃদ্ধি পাবে। এ বেতন কাঠামো ডিসেম্বর,২০১৩ থেকেই কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু এ পর্যন্ত ঠিক কতটি কারখানায় এ কাঠামো বাস্তবায়ন হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য নেই বিজিএমইএর কাছে।

সরকার নির্ধারিত এ ন্যূনতম মজুরিও মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট নয়, শুধু মাত্র খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার জন্য শ্রমিকের দাবী ছিল ৮ হাজার টাকা, সেটা ৫৩০০ টাকা করা হয়েছে যাও আবার মালিকেরা দিচ্ছে না। বিভিন্ন ধরণের জালিয়াতি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে গার্মেন্টস মালিকেরা সর্বশেষ ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি থেকেও কম হারে মজুরি দিচ্ছে

শ্রমিকদের। জালিয়াতি ঢেকে রাখার জন্য বেশির ভাগ কারখানাতেই বেশ কয়েক মাস ধরে পে-স্লিপ দেয়া বন্ধ রেখেছে যেন আগের মজুরির সাথে নতুন মজুরির তুলনা করে জালিয়াতি সহজে ধরা না যায় বা ধরলেও প্রমাণ না থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মালিকপক্ষ একজন শ্রমিককে সিনিয়র অপারেটর (গ্রেড-৩) থেকে জুনিয়ার অপারেটরের (গ্রেড-৫) পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু যতটুকু বাড়ার কথা ততটুকু বাড়েনি। অথচ শ্রম আইন অনুযায়ী এবং ন্যূনতম মজুরি গেজেট অনুযায়ী এই ধরণের ডাউন গ্রেডিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আবার অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে স্বপদে রেখেই নির্ধারিত মজুরির চেয়ে কম মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। হেলপারদেরকে টাকা দেয়া হচ্ছে শিক্ষানবিশের স্কেল অনুযায়ী।

কারখানার মালিকেরা ইচ্ছাকৃতভাবেই শ্রমিকদেরকে তাদের গ্রেড সম্পর্কে অস্পষ্টতার মধ্যে রাখা, পে-স্লিপ না দেয়া, দিলেও গ্রেড উল্লেখ না করা, সরকার নির্ধারিত গ্রেড অনুসরণ না করে নিজস্ব উপায়ে শ্রমিকদেরকে গ্রেড ভুক্ত করা ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালিকরা শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখে। কিন্তু মালিকরা কৌশলে শ্রমিকদেরকে সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি স্কেল অনুযায়ী মজুরি না বাড়ালেও শ্রমিকের জীবন যাত্রার ব্যয় কিন্তু ঠিকই বেড়েছে। বাড়িওয়ালারা বাড়ি ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে, গ্যাস-বিদ্যুতের বিল বাড়ি ভাড়া থেকে আলাদা করে শ্রমিকের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেই সাথে জীবন যাত্রার অন্যান্য উপকরণের দাম বৃদ্ধি তো আছেই। যে হারে মজুরি বাড়ানোর কথা বলা হচ্ছে সে হারে বেসিক মজুরি না বাড়ার ফলে শ্রমিকের ওভার টাইমের রেটও তেমন বাড়েনি। ফলে বাস্তবে মজুরি টাকার অর্থে সামান্য কিছু বাড়লেও আগের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করে সেই বাড়তি টাকাটুকু অর্জন করতে হচ্ছে শ্রমিককে অর্থাৎ এই গোটা প্রক্রিয়ার ফলাফল হলো শ্রম শোষণের হার আরো বেড়ে যাওয়া যা শ্রমিককে আরো জীর্ণ করে তুলছে।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও শ্রমিকের মৃত্যু

গত দুই দশকে তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ বাংলাদেশের শ্রম আইন (২০০৬) অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিল্ডিং কোড নেই। অপ্রতুল অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা, অপ্রশস্ত দ্রুত বহির্গমন সিঁড়ি, ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা কারখানাগুলোর খুব সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর এসব কারণে বাংলাদেশের পোশাক কারখানার দূর্ঘটনাগুলোতে মৃত শ্রমিকের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। এই গার্মেন্টস শিল্পের অন্যতম উপাদান এই শ্রমিকের কাজ ও জীবনের নিরাপত্তা কিছু পরিসংখ্যান থেকেই অনুমান করা যায়। একটি পরিসংখ্যানে প্রকাশ করা হয়েছে ১৯৯০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে গার্মেন্টস শিল্পে বিভিন্ন দূর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ২১২৯ জন। বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর তথ্যমতে, ২০০৬ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে ২১৩ টি দূর্ঘটনায় ৪১৪ জন গার্মেন্টস শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

গার্মেন্টস মালিক সংগঠন বিজিএমইএ এবং অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলোর দেয়া পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস ব্যবসা শুরু হওয়ার পর গত দুই দশকে ২১৪টির মতো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯০ সাল থেকে এই দূর্ঘটনাগুলোতে ৭০০ গার্মেন্টস শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে এমন ঘটনার সংখ্যা ২৫টির মতো। আর ভবন ধসে ও অন্যান্য কারণে মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার শ্রমিকের।

এই নির্মম মৃত্যুও বেশিরভাগই হচ্ছে নারী শ্রমিক। সাভারের রানা প্লাজা ধসে যাওয়ার ঘটনায় ১১৩২ জন শ্রমিকের মৃত্যু এই তালিকার নতুন সংযোজন। মৃত্যু এই সংখ্যার পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাওয়াটা নেহাতই হাস্যকর। আর তাদের হিসেবে কতজন গার্মেন্টস মালিকের শাস্তি হয়েছে, এমন তথ্য না থাকাটাই যেন খুব স্বাভাবিক। অথচ সরকার সাংবিধানিকভাবেই প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে বাধ্য। সংবিধানের ৩১ ও ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তার স্পষ্ট বিধান রয়েছে। এছাড়া ২০০৬ সালের শ্রম আইনে শ্রমিকের মৌলিক অধিকার এবং মাতৃত্বকালীন ছুটির কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৯ বা সিডো সনদের ৩-এ অনুচ্ছেদে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার, ১১(২)-এ বিবাহ অথবা মাতৃত্বের জন্য বৈষম্য করা যাবেনা এবং অনুচ্ছেদ ১৫তে নারীর আইনগত

এবং নাগরিক অধিকারের বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শ্রমিক কোনো পণ্য নয় তারাও মানুষ। শিল্পায়নের জন্য মৃত্যু কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

রানা প্লাজা ধসের পরে সারা বিশ্বে যখন বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয় তখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে দেশের পোশাক শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত ও তাদের অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। রানা প্লাজার ঘটনার পরে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশী কিছু পণ্যের জন্য যে শুল্কমুক্ত সুবিধা (জিএসপি) ছিল তা বাতিল করে এবং তা আবার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও শ্রম অধিকার নিশ্চিতের শর্ত দিয়ে দেয়। সম্প্রতি ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের মতো জিএসপি বাতিল না করলেও ভবন ও অগ্নিনিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সরকারকে চাপ দেয়।

বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি গার্মেন্ট কারখানা পরিদর্শনের পর আন্তর্জাতিক ক্রেতা জোট অ্যাকর্ড । ১০টি কারখানার ওপর দেয়া এক প্রতিবেদনে নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির সন্ধান পেয়েছে। কাঠামোগত ত্রুটি ছাড়াও কারখানাগুলোয় তারা অগ্নিনিরাপত্তাজনিত নানা ধরনের সমস্যা আছে। প্রত্যেক কারখানার ভবন, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে যা প্রায় একই রকম। ভবনের কাঠামোগত সমস্যা আছে। সক্ষমতার চেয়ে বেশি ওজনের পণ্য ও যন্ত্রপাতি আছে অনেক কারখানায়। কারখানাগুলোর বৈদ্যুতিক তারের সংযোগগুলোও নিরাপদ নয়। ফায়ার অ্যালার্ম নেই। দ্রুত বহির্গমন সিঁড়ি যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। এমনকি কতগুলো কারখানায় ফায়ার ডোর নেই।

কিন্তু নিউইয়র্কভিত্তিক ব্লুমবার্গ এর মতে, বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশি গার্মেন্টস কারখানার কর্মপরিবেশ নিরাপদ নয়। গণমাধ্যমটির মতে, রানা প্লাজা ধসের ঘটনা বাংলাদেশের শিল্প নিরাপত্তা রেকর্ডে আরও একটি কালো দাগ টেনে দিয়েছে। ওয়াশিংটন ভিত্তিক সংগঠন 'ওয়ার্কার্স রাইটস কনসোর্টিয়াম' এর নির্বাহী পরিচালক স্কট নোভা এর মতে, বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ হাজার পোশাক কারখানা আছে, যার অধিকাংশই কোনো না-কোনোভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন। বিশ্বব্যাপী যে শ্রমিক সংগঠনগুলো আছে তারা সবাই গত কয়েকবছর ধরে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বোঝাতে চেয়েছে যে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানার কর্মপরিবেশ অত্যন্ত নিম্নমানের। কিন্তু ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে ইতিবাচক বক্তব্য দেয়নি।

কারখানায় কাজের পরিবেশও স্বাস্থ্যকর নয়। যে পরিবেশে শ্রমিকদের কাজ করতে হয় তাতে তাদের বড় অংশই বিভিন্ন অসুখ-বিসুখে পতিত হন। কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত না করায় এবং প্রাপ্ত মজুরির পরিমাণ অত্যন্ত নিম্ন হওয়ায় তারা সব রকমের চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেন। এ অবস্থায় অসুস্থ হওয়ার পর মালিকপক্ষ কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিত হলে তাদের চাকরি চলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে বৃহৎ আকারে নারী শ্রমিকের সমাবেশ ঘটলেও এবং একে কেন্দ্র করে মালিক পক্ষ, সুশীল সমাজ ইত্যাদি নারীর কর্মসংস্থান, ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বড় বড় কথা বললেও তাদের মাতৃত্বকালীন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার বন্দোবস্ত অধিকাংশ কারখানাতেই নেই। এসব প্রতারণাপূর্ণ কথার আড়ালে নারীদেরকে অধিক সংখ্যায় কাজে নেয়ার প্রকৃত কারণ হলো, পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে তাদের দিয়ে কাজ করানোর সুবিধা।

ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান ও ভবন ব্যবহারসংক্রান্ত বিধিবিধানগুলো নতুন করে পর্যালোচনা করা উচিত; যোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। কারখানার জন্য নির্মিত ইমারতের ভিত বসবাসের জন্য নির্মিত ইমারতের চেয়ে বেশি মজবুত হওয়া প্রয়োজন। তৈরি পোশাক কারখানার লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া এমন কঠোর হওয়া উচিত, যেন বসবাসের লক্ষ্যে নির্মিত ভবনকে কেউ পোশাক কারখানা হিসেবে ব্যবহার করতে না পারেন। সরকারি কর্তৃপক্ষ সমূহের স্পষ্টতই পেশাদারির অভাব রয়েছে।

ক্ষতিপূরণ

বাংলাদেশে অবহেলাজনিত চরম দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ বিষয়ক একটি আইন ১৮৫৫ সালে প্রণীত হয়। এ আইন অনুসারে এমনকি আইএলও ও বিশ্বব্যাংকেরও ক্ষতিপূরণ দেয়ার একটি গাণিতিক হিসাব আছে। এসব পদ্ধতির মধ্যে আমাদের দেশে কোনটি অনুসরণ করা হচ্ছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতোমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দুই দফায় ২১৪ জন শ্রমিককে দুই লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সকল ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কিনা তা অনিশ্চিত। বরাবরের মত ক্ষতিগ্রস্থদের তালিকা নিয়েও রয়েছে অস্পষ্টতা।

আর বিজিএমইএর পক্ষ থেকে যে ক্ষতিপূরণের অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার গড়িমসি দেখে খোদ সরকারও বিব্রত। অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন, যে অঙ্কে (জনপ্রতি দুইলাখ টাকা) ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে তা যথোচিত নয়। ১৮৫৫ সালের আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেয়া হলে জনপ্রতি প্রায় ৪৮ লাখ টাকা এবং আইএলও কিম্বা বিশ্বব্যাংকের পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্থ কমপক্ষে ৩০ লাখ টাকা পাবেন। শ্রমিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বি-জিএমইএ একটা মূল্য নির্ধারণ করেছিলো। নব্বইয়ের দশকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতো মাত্র ২৫ হাজার টাকা, পরে তা বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলনের চাপে ২০০১ সালে তা বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হয়। ১৯৮৫ সালের মারাত্বক দুর্ঘটনা আইনে নিহত পরিবারের পক্ষে ক্ষতিপূরণ মামলা করার অধিকার রয়েছে। অনেক আন্দোলনের পর স্পেকট্রাম গার্মেন্টসের এ ক্ষতিগ্রস্থদর জনপ্রতি মাত্র ১ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছিল।

ক্ষতিপূরণ-পুনর্বাসন বিষয়টি একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্তরা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পান। যদিও ভালো–টাকার অঙ্কে কারও মৃত্যুর বা অঙ্গহানির ক্ষতি কোনো দিন পূরণ হয় না। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত হতাহতের পরিবারগুলো যেন কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, শিশুরা শিক্ষা থেকে ঝরে না পরে, পরিবারগুলোর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং ভবিষ্যতের দিকে তাদের ভীতি নিয়ে না তাকাতে হয়। এ ক্ষেত্রে শুধু দায়ী মালিকই নন, বরং বিজিএমইএকে একটি বড় ভূমিকা পালন করতে হবে; সরকারকেও তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা আয় হচ্ছে যে খাত থেকে, সেই খাতে চার-পাঁচশ কোটি টাকার একটি তহবিল সৃষ্টি খুব কঠিন কিছু নয়। যদি এটি করার একটি আইনি বাধ্যবাধকতা থাকে এবং সরকারেরও সে তহবিলে অর্থ জোগানের বিধান থাকে, তাহলে ছয় মাসের মধ্যেই সেটি হতে পারে। যদি আমাদের তৈরি পোশাকশিল্পকে তার দুর্নাম ঘুচিয়ে উঠে দাঁড়াতে হয়, তাহলে এ রকম তহবিল তৈরিসহ এই শিল্পের পরিবেশ শ্রমিকবান্ধব করার কোনো বিকল্প নেই।

বীমা

গার্মেন্টস শিল্প দূঘটনায় নিহত শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যরা কখনোই জীবন বীমার অর্থ পান না। কারখানার স্থাপনা বীমার আওতায় না থাকায় শিল্প মালিকরা এমনকি শ্রমিকের অভিভাবকরা বীমার অর্থ দাবি করতে পারেন না। অগ্নিকাণ্ডে একটি কারখানার যত শ্রমিক প্রাণ হারাক না কেন বীমা কোম্পানি ২০ জনের বেশি পরিবারকে জীবন বীমার অর্থ দেয় না। গার্মেন্টস মালিকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য এবং কাঁচামালের বীমা করলেও শ্রমিকদের সবার বীমা করেন না। তৈরি পোশাক শিল্প মালিকরা শ্রমিকদের জন্য নামমাত্র প্রিমিয়াম দিয়ে বীমা করে থাকেন। এর ফলে যত শ্রমিকই মারা যাক না কেন ২০ জনের বেশি পরিবারকে জীবন বীমার অর্থ দেয়া হয় না।

বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত কারখানার সংখ্যা পাঁচ হাজার এবং এর বেশি হলেও ২ হাজার ৩০০ কারখানার ২০ জন করে শ্রমিকের নামে বীমা করা আছে। আগে বিজিএমইএর সঙ্গে জীবন বীমা করপোরেশনের চুক্তি ছিল। বর্তমানে চুক্তি রয়েছে বেসরকারি বীমা কোম্পানি ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের সঙ্গে। অর্থাৎ যেকোনো কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটলে শ্রমিকের মৃত্যু দাবি পরিশোধ করে থাকে ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স। বিজিএমইএ শ্রমিকদের স্বার্থে বীমা করে না। তারা নিজেদের রক্ষা করতে দায়সারা বীমা করে। ন্যূনতম ১০০ শ্রমিক রয়েছে এমন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গ্রুপ বীমা করা বাধ্যতামূলক। আইনে বলা হয়েছে, শ্রমিকদের বীমা দাবির টাকা প্রতিষ্ঠানের মালিকরা আদায় করবেন। শ্রমিকদের পোষ্যরা এ টাকা ৯০ দিনের মধ্যে পাবেন।

বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্পে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর পোশাক শিল্পের বীমার ব্যাপারেতথ্য বেরিয়ে এসেছে। ওই ভবনে অবস্থিত পোশাক কারখানাগুলো শ্রমিকদের জন্য নামমাত্র প্রিমিয়ামের জীবন বীমা করলেও ভবন মালিক ভবনের কোন বীমা করেননি। রানা প্লাজা ভবনধসে ১১৩২ জনের মৃত্যু এবং অসংখ্য মানুষ অঙ্গহারা, আহত হলেও সেখানে অবস্থিত ৫টি কারখানায় কারখানাপ্রতি মাত্র ২০ জন করে বিমা করা ছিল মাত্র ১০০ জনের নামে। এর আগে তাজরীন ফ্যাশনসে অগ্নি দুর্ঘটনায় ১১২ জনের মৃত্যু হলেও সেখানেও ঐ ২০ জন। অপরপক্ষে কারখানাগুলোর প্রায় যন্ত্রপাতিই বিমা করা ছিল। কারণ যন্ত্রপাতির বিমা ছাড়া ব্যাংক লোন পাওয়া যায় না। ফলে এ কথা বলা যায় যে, মালিকপক্ষের কাছে কর্মজীবিদের জীবনের মূল্যের চেয়ে যন্ত্রপাতির মূল্য অনেক বেশি। অথচ প্রত্যেক শ্রমিকের নামে বীমা থাকলে আহত ও নিহত সবাই এ সুবিধা পেতেন। তাই সংকট নিরসনে প্রত্যেক শ্রমিকের নামে যৌথ বীমা করা উচিত।

কমপ্লায়েন্স

পোশাক খাতে কমপ্লায়েন্স বলতে বোঝায় মূলত তিনটি বিষয় : প্রথমত, শ্রম আইন, দ্বিতীয়ত নিরাপত্তাব্যবস্থা ও সর্বশেষ মালিক-শ্যমিক সম্পর্ক। দেশে তৈরি পোশাক খাতে সাড়ে ৩ হাজার প্রতিষ্ঠান সচল। বিজিএমইএ দাবি করে, এর মধ্যে ১ হাজার প্রতিষ্ঠানের রয়েছে শতভাগ কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন কারখানা। কিন্তু শ্রমিকদের দাবি আদায়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সংগঠনগুলো বলছে, সাড়ে পাঁচ হাজার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মধ্যে সাড়ে তিন হাজার কারখানাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে বাংলাদেশ সোস্যাল কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ (বিএসসিআই) এর তথ্য অনুযায়ী দেশের মাত্র ৩০০-৫০০ কারখানা কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন। এই মুহূর্তে দেশে সাব কন্ট্রাক্ট বা ছোট কারখানাগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এই কারখানাগুলোর সংখ্যা ১ হাজারের বেশি। এসব কারখানাগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই নেই। শ্রম আইনের বিষয়ে এসব কারখানাগুলোর নেই কোন জানাশোনা। এছাড়া মালিক ও শ্রমিক সম্পর্কও খুব একটা ভাল নয়। এসব কারখানায় যেখানে নিরাপত্তাজনিত যন্ত্রাংশ রাখার কথা সেখানে ঠাঁই হয় কারখানার জেনারেটর কিংবা মেশিনারিজ যন্ত্রাংশ।

মালিকরা এই কমপ্লায়েন্স শব্দটি ব্যবহার করে কোটি কোটি আয় করছেন। কিন্তু তারা শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে ভাবেন না।

ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিকের অধিকার

বাংলাদেশে প্রায় পোশাক কারখানার অধিকাংশই কোন না কোনভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন। এসব পোশাক কারখানা যেকোনো সময় ধসে পড়তে পারে, অগ্নিকাণ্ডসহ ছোট-বড় নানা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। সে কথা জানা সত্ত্বেও বাংলাদেশি পোশাকমালিকেরা বহাল তবিয়তে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার একটা বড় কারণ এখানে শ্রমিক অধিকার রক্ষার কোনো সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ পোশাক কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ। ফলে একজোট হয়ে শ্রমিকেরা তাঁদের নিরাপত্তাহীনতার প্রতিবাদ জানাবেন, তার সুযোগও কার্যত নেই। তা ছাড়া প্রতিবাদ করতে গেলে চাকরি খোয়ানোর ভয় আছে। ভয় আছে গুম-খুনের।

গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া, মজুরি বৃদ্ধি সহ অপরাপর দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন করা ইত্যাদির অধিকার তাদের নেই। কাগজপত্রে আইএলও-এর শর্ত সমুহ মেনে নেয়া বাংলাদেশের সরকার গার্মেন্টস মালিকদেরকে এক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে রেখেছে। সিবিএ (Collective Bargaining Agency) নামক যেসব দরকষাকষির সংস্থা আছে, তার অধিকাংশের নেতৃত্ব প্রকৃত শ্রমিক নেতার পরিবর্তে মালিক পক্ষের দালাল লোকজনের দখলে। এরা কেউই শ্রমিক শ্রেণীর স্বাথে প্রতিনিধিত্ব তো করেই না, উপরন্তু শ্রমিকদের স্বার্থকে বিক্রি করেই ঢাকা শহরে নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিশাল ধনসম্পত্তি তারা গড়ে তুলেছে। এদের অধিকাংশই শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে নিজেদের পেছনে শ্রমিক সমাবেশ ঘটায়, তারপর শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে মালিক পক্ষের সাথে গোপন আঁতাত, লেনদেন ও সমঝোতার বিনিময়ে আন্দোলনকে হত্যা করে।

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেওয়া মৌলিক অধিকার। আমাদের সংবিধানেও এর স্বীকৃতি আছে। শ্রমিকরা যদি আজ ট্রেড ইউনিয়ন সুযোগ থাকলে তারা শ্রম আইন মানার ব্যাপারে মালিকদের বাধ্য করতে পারত। সংগঠিত ও যথাযথ পদ্ধতিতে মালিকপক্ষের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরতে পারত। শ্রম আইন অনুযায়ী, মালিকরা শ্রমিককে আট ঘণ্টার বেশি খাটাতে পারবে না। আর যদি খাটাতেও চায় তবে কয়েকটি শর্ত মেনে নিতে হবে। যেমন শ্রমিকের পূর্ণ ও স্বাধীন সম্মতিক্রমে এবং তাকে দ্বিগুণ বেতন দিয়ে তার কাছ থেকে বাড়তি শ্রম নেওয়া যাবে।

আজকে শ্রমিক সংগঠন আইনসিদ্ধভাবে প্রতিটি গার্মেন্টসে কাজ করতে পারলে যে সব জায়গায় আগুন লাগছে সে সব জায়গায় আগুন লাগত না। কারণ শ্রমিক সংগঠন সেখানে সজাগ থাকত। তারা আগুন নেভানোর যথাযথ ব্যবস্থা রেখে দিতে মালিক ও কারখানা প্রশাসনকে বাধ্য করত। আবার যে ভবনে দুর্ঘটনা হচ্ছে সে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত হলেই শ্রমিকরা ওখানে কাজ না করানোর জন্য মালিকদের চাপ দিত। এগুলো তো নেতিবাচক কিছু নয়। তাতে গার্মেন্টস শিল্প এভাবে মৃত্যুকূপ হয়ে উঠে বাইরের বিশ্বের বাজার নষ্ট করত না।

গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তির অন্যতম উপাদান। এই শিল্পের মূল উপাদান শ্রমকে অবজ্ঞা করে কোনোদিনই একে টিকিয়ে রাখা যাবে না।

বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরামের সুনির্দিষ্ট দাবীসমূহ:

১. অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে রানা প্লাজা ধসে নিহত-আহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করতে হবে।

২. রানা প্লাজার মালিক ও দায়ী কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৩. নিহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী শ্রমিক পরিবারকে জনপ্রতি ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪. আহতদের সুচিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. ২৪ এপ্রিল কে 'গার্মেন্টস শ্রমিক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

৬. রানা প্লাজা সকল বেকার শ্রমিকদের অবিলম্বে চাকরীর ব্যবস্থা বিজিএমইএ-কে করতে হবে।

৭. রানা প্লাজাসহ সকল কারখানার বকেয়া বেতন অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে।

রানা প্লাজা ট্রাজেডির এক বছর স্মরণে ২২ এপ্রিল, ২০১৪ জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ।

রানা প্লাজা ট্রাজেডির এক বছর : গার্মেন্টস শ্রমিকের কাজ, নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ এবং আজকের বাস্তবতা

রানা প্লাজা ভবন ধ্বস বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ইতিহসে সবচেয়ে বড় এক ট্রাজেডি। এই ভবন ধ্বসে সহস্রাধিক গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত হয়, নিখোঁজ হয় প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিক। আহত হয় ২১০০ জনের বেশি শ্রমিক। এ ঘটনা সারা বিশ্বেই আলোড়ন তোলে। প্রশ্ন ওঠে গার্মেন্টস শ্রমিকদের কাজ ও জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে। গার্মেন্টস শিল্পে নানা অনিয়ম সবার নজরে আসে। পরবর্তীতে রানা প্লাজার শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিয়েও নানা প্রশ্ন ওঠে। ২০১৪ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধসের এক বছর পূর্ণ হয়। দীর্ঘ এক বছর পার হলেও এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যথাযথ কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখে বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম ২২ এপ্রিল সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'রানা প্লাজা ট্রাজেডির এক বছর : গার্মেন্টস শ্রমিকের কাজ, নিরাপত্তা, ক্ষতিপূরণ এবং আজকের বাস্তবতা' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলদেশ এর সভাপতি শিরিন আক্তার, এমপি। সেমিনারে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এর গবেষণা পরিচালক ড. বিনায়েক সেন, নারী শ্রমিক বিষয়ক গবেষক ড. বিনা শিকদার এবং এশিয়ান মনিটর রিসোর্চ সেন্টার (হং কং) এর গবেষক ওমানা জর্জ। সেমিনারে সভাপতিত্ব ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম এর আহ্বায়ক শ্রমিকনেতা আবুল হোসাইন। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম এর সদস্য সচিব ও নাগরিক উদ্যোগ-এর প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিরিন আক্তার বলেন, রানা প্লাজা ধ্বস গার্মেন্টস শিল্পে আমাদের অবস্থা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যারা প্রতিনিয়ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বৈদেশিক রপ্তানিতে সাহায্য করছে, সেই শ্রমিকদের জীবনে এমন ঘটনা কেন ঘটবে? কেন তারা ভবন ধ্বসে প্রাণ হারাবে? কেন তারা আগুনে পুড়ে মরবে? কেন তারা পঙ্গুত্ববরণ করবে? এই প্রশ্নগুলো আজ শুধু বাংলাদেশের মানুষের নয়, এই প্রশ্ন আজ সারা বিশ্বজুড়ে। পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের কর্মরত অবস্থায় যে কোনো প্রকার ক্ষতি হলে এর দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে। পাশাপাশি এর দায়ভার ট্রেড ইউনিয়নসহ অন্যান্য সংগঠনের ওপরও বর্তায়।

তিনি মনে করেন রানা প্লাজা ঘটনার পর তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া খুব প্রয়োজন (১) যাদের প্রাণহানি হয়েছে এবং অঙ্গহানি হয়েছে, তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, (২) বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের পুনর্বাসন করতে হবে এবং (৩) রানা প্লাজার মত ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কারখানাগুলোকে নিরাপদ কর্মস্থল হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, রানা প্লাজার ঘটনায় যেসব শ্রমিক আহত হয়েছেন তাঁদের বেশির ভাগই এখন ট্রমাক্রান্ত জীবনয-

াপন করছেন। যেসব শিশু এই দুর্ঘটনায় মা-বাবাকে হারিয়েছে তারা সবচেয়ে দুঃসহ অবস্থায় রয়েছে। রানা প্লাজার মত ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলা বা অন্যের উপর দায় চাপানো চলবে না। এমন ঘটনা এড়াতে আমাদের ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। এ ধরণের ঘটনা কখনো ঘটলেও সভা সেমিনার ছাড়াই যেন যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. প্রতিমা পাল মজুমদার বলেন, আমাদের গার্মেন্টস শিল্প আজ অনেক এগিয়ে গিয়েছে। দেশে এখন ৯টি ইপিজেড রয়েছে। এখানে বেশ ভালভাবেই কাজ হচ্ছে। বিজিএমই এর নিবন্ধিত গার্মেন্টসের সংখ্যা ৫ হাজার। এর বাহিরেও রয়েছে প্রায় ৫০০টি গার্মেন্টস। কিন্তু এই গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য অনেকাংশেই অবহেলা করে। যেসব তৈরি পোশাক কারখানা সাবকন্ট্রাক্টে কাজ করে সেসব প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়। কারণ সেসব প্রতিষ্ঠান খুব বেশি তদারকির আওতায় থাকে না। এ দেশের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার তুলনায় মজুরী পর্যাপ্ত নয়। গ্রাম থেকে কাজে আসা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের কোন সুযোগ নেই। বিজিএমইএ কিছুদিন আগে ম্যানেজারদের জন্য প্রশিক্ষনের আয়োজন করলেও শ্রমিকদের জন্য এ ধরনের কোন সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্থদের খোঁজ-খবরও রাখছেন না কেউ। অথচ রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকরা সহায়তা পাচ্ছেন না। সরকার ও গার্মেন্টস মালিকরা তাদের যথাযথ খোঁজখবরও রাখছেন না। রানা প্লাজার ঘটনায় যেসব শ্রমিক আহত হয়েছে তাদের ৭৪ শতাংশ এখনো কোনো কাজ পায়নি। রানা প্লাজার ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে জমা হয়েছে ১৩০ কোটি টাকা। সেখানে খরচ হয়েছে মাত্র ২৭ কোটি টাকা। এ বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।

গবেষক ড: বিনা শিকদার বলেন, গ্রামের দরিদ্র যে মেয়েটির আজ প্রাইমারি শেষ করে সেকেন্ডারি স্কুলে পড়ার কথা, সে মেয়েটি জীবিকার তাগিদে পোশাক শিল্পে কাজ করছে। এই মেয়েরা একদিকে যেমন পরিবারের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে, সাথে সাথে ছোট ভাইবোনদের পড়ালেখার খরচও বহন করে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, তাদের স্বামীও তাদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই নারী শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির কোন নিশ্চয়তা নেই। এই শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সবসময়ই অবহেলার চোখে দেখা হয়। বিদেশী ক্রেতাদের পক্ষ থেকে যে চাপ আসে তা কাজে লাগিয়ে দেশের শ্রমিকরা পরিস্থিতির পরিবর্তনে সচেষ্ট হতে পারেন। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের দায়িত্ব মূলত সরকার ও মালিকপক্ষের। কিন্তু এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নেরও যথেষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। সম্প্রতি ১২০টি ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এর কার্যকারিতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

তিনি আরও বলেন, গার্মেন্টস শিল্পের সমস্যা সমাধান আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে সেখানে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করা উচিত ছিল। সবচেয়ে বড় কথা এসব দেখভাল করার জন্য উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ কোন প্রতিষ্ঠান এখানে নেই। শ্রমিক সংগঠনগুলোও এসব ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত। অনেক কারখানাতে এখনও কোন শ্রমিক সংগঠন নেই। আবার শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের কতটুকু সম্পৃক্ত করতে পেরেছে সেটিও দেখবার বিষয়। আমাদের দেশের গার্মেন্টস শ্রমিকর সোনার ডিম পাড়া হাঁসের মত। কিন্তু এই শ্রমিকদের জন্য সরকার যদি ন্যূনতম মজুরী, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করত, তাহলে শ্রমিকদের কয়েকদিন পর পর তাদের রাস্তায় নেমে আসতে হত না। শ্রমিকরা যেন নিরাপদে কাজ করতে পারেন সেজন্য তিনি রাষ্ট্রের প্রতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ড. বিনায়েক সেন বলেন, সারাদেশে ৪৪ লাখ শ্রমিক গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত। চীনের পর গার্মেন্টস শিল্পে বাংলাদেশের স্থান দ্বিতীয়। তিনি বলেন, পোশাক শ্রমিকরা মাত্র ৫ হাজার ৩ শত টাকা বেতন পাচ্ছেন। যা নিতান্তই বেদনাদায়ক। তিনি অবিলম্বে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবি জানান।

তিনি আরও বলেন, শ্রমিকের ন্যূনতম নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র এটা করতে পারে সহজে। একটা উপায় হলো শ্রমিক নিরাপত্তার নামে বাজেটে বরাদ্দ রাখতে পারে। অথবা রাষ্ট্র সহজ শর্তে ঋণ দিতে পারে। যাতে মালিকরা কারখানার আধুনিকায়ন করতে পারে। তাঁর মতে আন্তর্জাতিক বাজারের মানদন্ড রক্ষা করতে না পারলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরে ধ্বস নেমে আসবে। আমাদের উচিত প্রতিটা কারখানায় কি পরিমাণ ঝুঁকি রয়েছে, তা নির্ণয় করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া। এই মুহূর্তে রাতারাতি দেশের সব তৈরি পোশাক কারখানাকে পরিপূর্ণ কমপ্লায়েন্সের আওতায় আনা কঠিন কাজ। এটি অনেক ব্যয়সাপেক্ষও বটে। তাই শ্রমিকের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করাটা জরুরি। রানা প্লাজায় আহত মহিলা শ্রমিকদের ওপর এখন পারিবারিক নির্যাতন চলছে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত ও কর্মহীন প্রত্যেক শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার দাবি জানান এই গবেষক।

এশিয়ান মনিটর রিসোর্স সেন্টার (হং কং) এর গবেষক ওমানা জর্জ বলেন, তৈরি পোশাক খাতে যেসব আইন ও বিধিবিধান রয়েছে সেগুলো পরিপালনের ক্ষেত্রে অবকাঠামো দুর্বলতা এক বড় সমস্যা। আমরা এশিয়ার ১৪টি দেশে কাজ করছি। বাংলাদেশের মতো চীন, ভারত, পাকিস্তানেও একই ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। এসব দেশে শ্রমিকের জন্য পর্যাপ্ত আইন ও শ্রম অধিকার রয়েছে কিন্তু সেগুলোর বাস্তবে কোন প্রয়োগ নেই। তাই এ ধরনের দুর্ঘটনা যাতে না হয় সেজন্য আইনের সঠিক প্রয়োগ দরকার।

তিনি আরও বলেন, রানা প্লাজার মতো দুর্ঘটনা প্রায় দেশেই ঘটছে। প্রত্যেকটি ঘটনা একই ধরনের। পোশাক কারখানার সব দুর্ঘটনা অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দুর্ঘটনার সময় ভবনের ফটক ছিল তালা দেয়া অথবা দ্রুত বহির্গমন সিড়ি ছিলনা। ক্ষতিগ্রস্থরা কোন দুর্ঘটনারই বিচার পান না। শ্রমিকের অধিকার ও কর্মপরিবেশের বিষয়ে এক ধরনের সমঝোতা হয়। ফলে এসব দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না।

গার্মেন্টস শ্রমিকনেত্রী লাভলী ইয়াসমিন বলেন, সেই নব্বই সাল থেকেই গার্মেন্টসগুলোতে আগুন এবং সেই আগুনে শ্রমিকের প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। তখন থেকেই শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে। স্পেকট্রাম ভবন ধ্বসের পর দেখা গেছে শুধু আগুন নয়, ভবন ধ্বসেও শ্রমিকদের প্রাণহানি হয়। শ্রমিক নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক মানদন্ড হয়ত সম্পূর্ণভাবে মানা সম্ভব নয়। কিন্তু যতটুকু সম্ভব ততটুকু অন্তত মানতে হবে। তিনি সরকার, একোডা এলায়েন্স ও জনসাধারণ সবাইকে একত্রে এ বিষয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

গার্মেন্টস শ্রমিকনেত্রী শামিমা আক্তার শিরিন বলেন, রানা প্লাজা ধ্বসের পর গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের জন্য নানা অনিয়মের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে সংস্কার নিয়েও। কিন্তু এক বছরে প্রকৃত অর্থেই কতটুকু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে? একোডা এলায়েন্সের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে মালিকরা শ্রমিকদের চাকুরি থেকে বের করে দিচ্ছে। বেকার হয়ে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ছে। গার্মেন্টস শ্রমিকরা এখনো নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। মজুরী বাড়ার (যদিও সবাই পাচ্ছেন না) সাথে সাথে বেড়েছে বাড়িভাড়া। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্যবুদ্ধি তো আছেই। যাদের বাড়িতে বাবা মার কাছে টাকা পাঠাতে হয়, তারা তা পাঠাতে পারছে না।

শ্রমিকনেত্রী সুলতানা আক্তার বলেন, রানা প্লাজা ধ্বসের এক বছর পার হলেও সরকার আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন পদক্ষেপ নিতে পারলো না। এখন পর্যন্ত পুনাঙ্গ ও নিরপেক্ষ কোন তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি। ন্যূনতম মজুরী বাড়লেও কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি হয়েছে আরও ভয়াবহ। কোন শ্রমিক যদি ৮ ঘণ্টায় তার কাজ শেষ করতে না পারে, তাকে আরও ২ ঘন্টা বেশী সময় কাজ করিয়ে কাজ শেষ করা হয়। কিন্তু তাদের কোন ওভারটাইম দেওয়া হচ্ছে না। তাদের জীবন ধারণ করা দূর্বিষহ হয়ে পড়েছে।

শ্রমিকনেতা রফিকুল ইসলাম সুজন বলেন, অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে রানা প্লাজায় নিহত, আহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। ২৪ এপ্রিল গার্মেন্টস শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষনা করতে হবে। তিনি রানা প্লাজায় ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ, বাসস্থান ও পুনর্বাসনের দাবি জানান।

রানা প্লাজার শ্রমিক শাহিন বলেন, আমি রানা প্লাজার ছয়তলায় কাজ করতাম। আমি আজ পর্যন্ত কোন সহায়তা পাইনি, কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি। আমাদের শ্রমিকদের জীবনের কোনো মূল্য নেই। কাজের জন্য একাধিক গার্মেন্টসে যাওয়ার পর সেখান থেকে তাকে বলা হয়েছে রানা প্লাজায় আহত কোনো শ্রমিককে কাজ দেওয়া হয় না। তিনি সরকারে প্রতি এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানান।

ফোরাম এর সদস্য সচিব জাকির হোসেন বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরামের পক্ষে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় আহত সব শ্রমিকের কর্মসংস্থান ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা এবং পোশাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান। তিনি বলেন, পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি ও বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচয়পত্র সরবরাহ করতে হবে। এর ফলে যেকোনো পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের পরিচয় ও সংখ্যা নির্ধারণ সহজ হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ফোরামের আহ্বায়ক শ্রমিকনেতা আবুল হোসাইন বলেন, ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত শতাধিক অগ্নিকাণ্ড এবং ভবন ধসে দুই সহস্রাধিক শ্রমিকের প্রাণ বলি দিতে হয়েছে। অসংখ্য শ্রমিক আহত ও পঙ্গু হয়েছে, যারা বর্তমানে দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছে। দুর্ঘটনার দায় ক্রেতা ও মালিক উভয়কেই নিতে হবে। সরকারেরও দায় এড়ানো চলবে না। পূর্ণ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্রুত নির্ধারণ এবং ক্রমাগত অবস্থার উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি হাতে নেয়া দরকার। সেই সাথে রানা প্লাজায় আহত ও বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের মানসিক ও সামাজিক কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

সবশেষে তিনি উপস্থিত বিশিষ্ট আলোচকবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকারকর্মীবৃন্দ এবং সংবাদকর্মীবৃন্দসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সেমিনার থেকে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালাঃ

১. সকল শ্রমিককে স্থায়ী নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে।

২. ন্যূনতম মজুরি বিধিমালা মেনে মাসের ১ তারিখে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন, ওভার টাইমের টাকা পরিশোধ করতে হবে।

৩. গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য মালিক ও সরকারী উদ্যোগে স্বল্প খরচে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. সাপ্তাহিক ছুটি, মেডিকেল ছুটি, বাৎসরিক ছুটি চালু করতে হবে।

৫. সন্ধ্যা ৭টার পর সকল গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ রাখতে হবে।

৬. কারখানা চলাকালীন কোনো তলায়ই কলাপসিবল গেট বন্ধ রাখা যাবে না।

৭. শক্তিশালী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও প্রশস্ত সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮. অবিলম্বে কারখানার পরিবেশ উন্নত ও কমপ্লায়েন্স এর আওতাভুক্ত করতে হবে।

৯. নারী শ্রমিকদের স্ব-বেতন ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে।

১০. সন্তান প্রতিপালনের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. বাধ্যতামূলক ওভার টাইম বন্ধ করতে হবে। নারী শ্রমিকদের হোল নাইট কাজ বন্ধ করতে হবে।

১২. শ্রমিকদের ছাঁটাই করা চলবে না। শ্রমিকদের সাথে অশালীন ও অসদাচরণ বন্ধ করতে হবে। দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান রাখতে হবে।

১৩. অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে। শ্রমিকদের মিছিল-মিটিং-ধর্মঘট, রাজনীতি করা ও সংগঠিত হবার অধিকার দিতে হবে।

রানা প্লাজা ধসে নিহতদের নামের তালিকা

(স্বজনদের মধ্যে হস্তান্তরিত মৃতদেহের তালিকা অনুসারে)

১. দুলালী বেগম, গাইবান্ধা
২. মাহফুজা, রাজবাড়ী
৩. শাহীন, টাঙ্গাইল
৪. শাহিনা, গাইবান্ধা
৫. মো: বাসুনিয়া, ঢাকা
৬. জুয়েল, ঢাকা
৭. মেরিনা, নওগাঁ
৮. হারুন-অর-রশিদ, রাজবাড়ী
৯. সাহেদা, জামালপুর
১০. সাইফুল ইসলাম, শেরপুর
১১. মোসা: আকলিমা, নওগাঁ
১২. ফাতেমা, শেরপুর
১৩. রোজিনা, দিনাজপুর
১৪. কাইয়ুম, কুড়িগ্রাম
১৫. আক্তারা খাতুন, দিনাজপুর
১৬. রিফাত হাসান (আলমগীর), গোপালগঞ্জ
১৭. ছগির আহমেদ, পটুয়াখালী
১৮. আব্দুল কাদের রুবেল, চট্টগ্রাম
১৯. আতাউর মোল্লা, মানিকগঞ্জ
২০. ঝুমা আক্তার, পিরোজপুর
২১. চান বানু, নওগাঁ
২২. ঝুমুর, ভোলা
২৩. আরজিনা, রংপুর
২৪. সাথি, খুলনা
২৫. সোনিয়া, রাজশাহী
২৬. জুলেখা, গাইবান্ধা
২৭. নুপুর, বরিশাল
২৮. খাদিজা, নওগাঁ
২৯. মো: আজিজুল হক, ময়মনসিংহ
৩০. ফিরোজা, পাবনা
৩১. রেবা খাতুন, গাইবান্ধা
৩২. শাহনারা, বাগেরহাট
৩৩. আমির হোসেন মিরাজ, মুন্সিগঞ্জ
৩৪. ফয়সাল, ঢাকা
৩৫. মো: বিলাল হোসেন, চট্টগ্রাম
৩৬. মনিরা, গোপালগঞ্জ
৩৭. আমিরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া
৩৮. শিউলি, খুলনা
৩৯. সাহিদা, কুষ্টিয়া
৪০. সুফলা, হবিগঞ্জ
৪১. ফাতেমা, নারায়নগঞ্জ
৪২. সুকলা সরকার, ঢাকা
৪৩. শিপন রশিদ, গাইবান্ধা
৪৪. লাবনী, রাজবাড়ী
৪৫. শান্তা, জামালপুর
৪৬. ফাউজিয়া, চাঁদপুর
৪৭. নার্গিস, চাঁদপুর
৪৮. মো: ইয়াদুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা
৪৯. নূরুজ্জামান, দিনাজপুর
৫০. সূবর্না, রাজবাড়ী
৫১. তানিয়া, ঝালকাঠি
৫২. হাবিবুর রহমান, পাবনা
৫৩. বিপ্লব, রাজশাহী
৫৪. আম্বিয়া, কুড়িগ্রাম
৫৫. নজরুল ইসলাম, পিরোজপুর
৫৬. হাবিরুন নেছা, শরীয়তপুর
৫৭. মো: আবু সাঈদ, যশোর
৫৮. নাসরিন, গাইবান্ধা
৫৯. কল্পনা, জয়পুরহাট
৬০. শিল্পি আক্তার, ঢাকা
৬১. মানি, গাইবান্ধা
৬২. চায়না আক্তার, ঢাকা
৬৩. রুবেল বিশ্বাস, রাজবাড়ী
৬৪. গোলাপী রানী, পাবনা
৬৫. কল্পনা, সিরাজগঞ্জ
৬৬. রায়হান, টাঙ্গাইল
৬৭. রুমানা আফরোজ নিশাত, ঢাকা
৬৮. রাবেয়া খাতুন, কুড়িগ্রাম
৬৯. মাধবী রাণী, পিরোজপুর
৭০. রমিছা, টাঙ্গাইল
৭১. জহুরুল ইসলাম, টাঙ্গাইল
৭২. কবির, বাগেরহাট

৭৩. মাশিউর রহমান নান্নু, বরগুনা
৭৪. জাহাঙ্গীর আলম, কুষ্টিয়া
৭৫. নজরুল ইসলাম, কিশোরগঞ্জ
৭৬. মাসুম, বরিশাল
৭৭. রিপন, ঝিনাইদহ
৭৮. আলিয়া আক্তার, মানিকগঞ্জ
৭৯. রেহানা বেগম, ঢাকা
৮০. জাফর সাদেক, বি-বাড়িয়া
৮১. মোজাম্মেল, ঢাকা
৮২. বিলকিস, মানিকগঞ্জ
৮৩. হামিদা, ঢাকা
৮৪. মোসা: আদুরী, রংপুর
৮৫. নাসিমা আক্তার, রাজবাড়ী
৮৬. শিউলি বেগম, খুলনা
৮৭. রিনা আক্তার, ঢাকা
৮৮. আক্তারুজ্জামান, বাগেরহাট
৮৯. হাসিনা, গাইবান্ধা
৯০. তাসলিমা বেগম, পটুয়াখালী
৯১. রেহেনা, রাজবাড়ী
৯২. রুবিয়া খাতুন, মাগুরা
৯৩. রাবেয়া বেগম, রংপুর
৯৪. বিলকিস আক্তার, ফেনী
৯৫. সোহেল, শরিয়তপুর
৯৬. মো: সাগর, খুলনা
৯৭. আনোয়ার, ঢাকা
৯৮. নেওয়াজ শফিক, রংপুর
৯৯. পারভীন, শেরপুর
১০০. মোমেনা, মানিকগঞ্জ
১০১. জবা, দিনাজপুর
১০২. রাজ্জাক, জয়পুরহাট
১০৩. মো: নয়ন আক্তার, কুমিল্লা
১০৪. মো: মাহবুব আলম, ভোলা
১০৫. মল্লিকা, জয়পুরহাট
১০৬. মোসা: আলিয়া, নাটোর
১০৭. মঞ্জুরাণী, বগুড়া
১০৮. হযরত আলী, নাটোর
১০৯. খালেদা, রাজবাড়ী
১১০. জয়ন্ত, হবিগঞ্জ
১১১. লিপি বেগম, রাজবাড়ী
১১২. মনিকা, বগুড়া
১১৩. শিখা রাণী কর্মকার, ফরিদপুর
১১৪. সালমা খাতুন, যশোর
১১৫. শিরিন আক্তার, রাজবাড়ী
১১৬. জাহানারা বেগম, কুড়িগ্রাম
১১৭. সেলিনা আক্তার, ঝিনাইদহ
১১৮. মোসা: রতনা, নওগাঁ
১১৯. হালিমা, রংপুর
১২০. সুজারুয়া, লক্ষীপুর
১২১. মো: আল মাসুদ, পঞ্চগড়
১২২. নয়ন, বরগুনা
১২৩. জামিল, নওগাঁ
১২৪. রুমা, ভোলা
১২৫. পেয়ারুল, রংপুর
১২৬. রশিদ, নওগাঁ
১২৭. মো: নাঈম, নওগাঁ
১২৮. নার্গিস, টাঙ্গাইল
১২৯. মমিন, বগুড়া
১৩০. রহিমা, শেরপুর
১৩১. সিদ্দিকুর রহমান, বরগুনা
১৩২. রাহিমা, রাজবাড়ী
১৩৩. ফেরদৌস, যশোর
১৩৪. শ্যামলী, রংপুর
১৩৫. পবিত্রা রাণী মন্ডল, ঢাকা
১৩৬. জহুরুল, রাজবাড়ী
১৩৭. মালা, মানিকগঞ্জ
১৩৮. কামরুল ইসলাম, পাবনা
১৩৯. কবির খান, পিরোজপুর
১৪০. মোসা: সোনিয়া আক্তার, বগুড়া
১৪১. নূর আলম, দিনাজপুর
১৪২. দিনাজ, ভোলা
১৪৩. ইসমাইল, লক্ষীপুর
১৪৪. রহিমা, দিনাজপুর
১৪৫. শিরীন সুলতানা, মাগুরা
১৪৬. রোজিয়া, নীলফামারী
১৪৭. শাপলা, পাবনা
১৪৮. হিরা বেগম, বরিশাল
১৪৯. নাজমা বেগম, বরিশাল
১৫০. আব্দুর রহমান, ফরিদপুর
১৫১. রাসেল, পাবনা
১৫২. শায়লা, দিনাজপুর
১৫৩. মো: হারুন-অর-রশিদ, ভোলা
১৫৪. ভাগী রানী দাস, ঢাকা
১৫৫. হাফিজা, ঝালকাঠি
১৫৬. মরিয়ম, কুমিল্লা

১৫৭. গুলশানারা বেগম, রংপুর
১৫৮. আল্পনা বেগম, মানিকগঞ্জ
১৫৯. আমেনা বেগম, নাটোর
১৬০. ফিরোজ আল মামুন, মানিকগঞ্জ
১৬১. শেফালী, গাইবান্ধা
১৬২. তাসলিমা আক্তার, ময়মনসিংহ
১৬৩. রত্না, খুলনা
১৬৪. বিউটি বেওয়া, খুলনা
১৬৫. মো: মোমিন, ঢাকা
১৬৬. রিয়া, ঢাকা
১৬৭. নিলুফার ইয়াসমিন, রাজবাড়ী
১৬৮. মো: শাওন, ঢাকা
১৬৯. খালেদা আক্তার, ঝালকাঠি
১৭০. মাকসুদা আক্তার (মুক্তি), শরিয়তপুর
১৭১. লিমা আক্তার, ঢাকা
১৭২. জিয়াসমিন, লক্ষীপুর
১৭৩. মো: রেজাউল, রংপুর
১৭৪. সুইটি, রংপুর
১৭৫. আলেয়া বেগম, রংপুর
১৭৬. ইজাবুল মল্লিক, মাদারীপুর
১৭৭. জোসনা, কুষ্টিয়া
১৭৮. মো: জাহিদুল ইসলাম, বগুড়া
১৭৯. সান্তনা, রংপুর
১৮০. মিলন, নীলফামারী
১৮১. কবির মোল্লা, ঢাকা
১৮২. লায়লা, টাঙ্গাইল
১৮৩. শহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর
১৮৪. সালমা, পাবনা
১৮৫. আজহারুল ইসলাম, ময়মনসিংহ
১৮৬. রুবেল, দিনাজপুর
১৮৭. মো: ইলিয়াস, বরগুনা
১৮৮. খুশি, রাজবাড়ী
১৮৯. সোহাগী, বাগেরহাট
১৯০. তুষার মিয়া, ঝিনাইদহ
১৯১. মুরাদ শেখ, রাজবাড়ী
১৯২. লাভলী আক্তার লাকী, লালমনিরহাট
১৯৩. ফরিদা পারভীন, রংপুর
১৯৪. সম্পা বেগম, বগুড়া
১৯৫. মো: ওয়াহেদ মিয়া, ঢাকা
১৯৬. সাহেব আলী, নওগাঁ
১৯৭. নিপা খাতুন, দিনাজপুর
১৯৮. কাইসার আহম্মেদ, শেরপুর
১৯৯. সালমা, মানিকগঞ্জ
২০০. গোলাপী বেগম, রংপুর
২০১. আনোয়ারা বেগম, ভোলা
২০২. মনি, পিরোজপুর
২০৩. তাছলিমা, ময়মনসিংহ
২০৪. শিউলী, গাইবান্ধা
২০৫. শাহাদাৎ হোসেন, কুড়িগ্রাম
২০৬. শরীফুল ইসলাম, চাঁদপুর
২০৭. আতাউর রহমান, মানিকগঞ্জ
২০৮. আঞ্জু বেগম, ঠাকুরগাঁও
২০৯. রাসেল, মানিকগঞ্জ
২১০. ফজিলা খাতুন, রাজশাহী
২১১. মো: সোহাগ হাওলাদার, বরগুনা
২১২. খুশি আক্তার, দিনাজপুর
২১৩. রিক্তা, মানিকগঞ্জ
২১৪. আবু তালেব, শরিয়তপুর
২১৫. সোনিয়া আক্তার, কিশোরগঞ্জ
২১৬. মো: সাইফুল ইসলাম, ঢাকা
২১৭. জাকিয়া, গাইবান্ধা
২১৮. মো: সেলিম মিয়া, চাঁদপুর
২১৯. রুনা বেগম, ময়মনসিংহ
২২০. তিতন বালাদাম, হবিগঞ্জ
২২১. রুজিনা বেগম, রাজবাড়ী
২২২. জহিরুল ইসলাম, গাইবান্ধা
২২৩. মর্জিনা আক্তার লিমা, কিশোরগঞ্জ
২২৪. সুমী, রংপুর
২২৫. শারমিন, জামালপুর
২২৬. সাথী, নওগাঁ
২২৭. সালমা, সিরাজগঞ্জ
২২৮. রাশিদা আক্তার, বরিশাল
২২৯. অর্চনা রানী, গাইবান্ধা
২৩০. মনোয়ারা বেগম, রাজবাড়ী
২৩১. আব্দুস সাত্তার, গাইবান্ধা
২৩২. মো: হাকিম, কিশোরগঞ্জ
২৩৩. রেহেনা বেগম, রাজবাড়ী
২৩৪. লাভলী, রাজবাড়ী
২৩৫. মো: পলাশ, ঝিনাইদহ
২৩৬. ইমরান, বাগেরহাট
২৩৭. বিশ্বজিত সাহা, খুলনা
২৩৮. ছালমা, গাইবান্ধা
২৩৯. আ: ছালাম, ঢাকা
২৪০. গোলাপী কাজল বেগম, নীলফামারী

২৪১. মোসা: আকলিমা, চট্টগ্রাম
২৪২. মিলন কুমার সরকার, গোপালগঞ্জ
২৪৩. সেলিনা বেগম, মানিকগঞ্জ
২৪৪. সেলিনা আক্তার, মানিকগঞ্জ
২৪৫. রিমা আক্তার, ঝালকাঠি
২৪৬. আ: ছালাম জীবন, কুষ্টিয়া
২৪৭. আব্দুল্লাহ, নাটোর
২৪৮. বিউটি আক্তার, বগুড়া
২৪৯. রবিউল ইসলাম, গোপালগঞ্জ
২৫০. লিপি, বরগুনা
২৫১. নাজমা বেগম, রাজবাড়ী
২৫২. সাইফুল্লাহ, শেরপুর
২৫৩. মোসা: সীমা, নোয়াখালী
২৫৪. দীপ কর ঘোষ, কুষ্টিয়া
২৫৫. মো: আব্দুল মালেক, টাঙ্গাইল
২৫৬. হানিফ, দিনাজপুর
২৫৭. নার্গিস আক্তার, চাঁদপুর
২৫৮. মৌসুমী, নাটোর
২৫৯. আফরোজা বেগম, দিনাজপুর
২৬০. ফজলে রাব্বি, রাজবাড়ী
২৬১. নিপা আক্তার, ঢাকা
২৬২. কাজলী রাণী, টাঙ্গাইল
২৬৩. মোছা: সালমা আক্তার, রংপুর
২৬৪. সাথী, মাদারীপুর
২৬৫. মো: ওমর ফারুক, সাতক্ষীরা
২৬৬. শাহীনুর বেগম, বগুড়া
২৬৭. নাজমা বেগম, বগুড়া
২৬৮. শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী
২৬৯. মো: লুৎফর রহমান, বগুড়া
২৭০. সাবিনা বেগম, ফরিদপুর
২৭১. সোহাগ, রংপুর
২৭২. মো: হালিম, শেরপুর
২৭৩. মো: আলতাফ হোসেন, ঠাকুরগাঁও
২৭৪. সারথি রানী দাস, হবিগঞ্জ
২৭৫. মো: আলমগীর হোসেন, পাবনা
২৭৬. শরিফা বেগম, শেরপুর
২৭৭. নীলা, মাদারীপুর
২৭৮. নাজমা বেগম, জয়পুরহাট
২৭৯. রবিন, ঢাকা
২৮০. আশা রানী, হবিগঞ্জ
২৮১. সোনা মিয়া, রংপুর
২৮২. সাজেদা, পাবনা
২৮৩. ফিরোজ, জয়পুরহাট
২৮৪. মামুন, ঝালকাঠি
২৮৫. সবুজ আহম্মেদ, দিনাজপুর
২৮৬. রহিমা, ভোলা
২৮৭. আলী হোসেন, ঝিনাইদহ
২৮৮. আব্দুল বাতেন, রংপুর
২৮৯. লাভলী, রংপুর
২৯০. লিপি আক্তার, রাজবাড়ী
২৯১. জোসনা বেগম, চট্টগ্রাম
২৯২. হাফিজুর রহমান, কুড়িগ্রাম
২৯৩. শিরিন আক্তার, ময়মনসিংহ
২৯৪. মোসা: জহুরা খাতুন, নওগাঁ
২৯৫. মোসা: তহুরা বেগম, রংপুর
২৯৬. হাসিনা, রংপুর
২৯৭. মো: আ: মমিন, সিরাজগঞ্জ
২৯৮. সীমা আক্তার, ময়মনসিংহ
২৯৯. মো: আরিফুল ইসলাম, রাজশাহী
৩০০. লতা বেগম, নাটোর
৩০১. রুকসানা আক্তার (রনি), শেরপুর
৩০২. মালেক মন্ডল, পাবনা
৩০৩. লিটন, মাদারীপুর
৩০৪. মো: সিদ্দিক, পটুয়াখালী
৩০৫. আরজিনা, পাবনা
৩০৬. মজিব সরদার, গোপালগঞ্জ
৩০৭. মুর্শিদা আক্তার, বিবাড়িয়া
৩০৮. পুতুল, জালকাঠি
৩০৯. সুইটি বেগম, দিনাজপুর
৩১০. নাফরিন, নড়াইল
৩১১. আনোয়ার নওশাদ, সিরাজগঞ্জ
৩১২. রিমা আক্তার, টাঙ্গাইল
৩১৩. খোদেজা বেগম, বিবাড়িয়া
৩১৪. চম্পা, রাজবাড়ী
৩১৫. উজ্জল, ঢাকা
৩১৬. কোহিনুর বেগম, ঝিনাইদহ
৩১৭. রোজিনা বেগম, গাইবান্ধা
৩১৮. কাইয়ুম, নীলফামারী
৩১৯. সুমি আক্তার, মানিকগঞ্জ
৩২০. রহিমা বেগম, ঢাকা
৩২১. রাশেদা বেগম, বগুড়া
৩২২. তানজিলা আক্তার, ফরিদপুর
৩২৩. বানেছা, কুড়িগ্রাম
৩২৪. রিমু বেগম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৩২৫. সুবিতা রানী, হবিগঞ্জ
৩২৬. জোসনা বেগম, মানিকগঞ্জ
৩২৭. মো: আনিসুর রহমান, জামালপুর
৩২৮. রিয়াদ, চট্টগ্রাম
৩২৯. শ্রী দয়াল চন্দ্র রায়, দিনাজপুর
৩৩০. শাহিনা, পটুয়াখালী
৩৩১. ইসরাইল বিশ্বাস, যশোর
৩৩২. আইনুল হক, রংপুর
৩৩৩. রোজিনা আক্তার রুবিনা, মানিকগঞ্জ
৩৩৪. শিউলী, পিরোজপুর
৩৩৫. মোজাম্মেল, সিরাজগঞ্জ
৩৩৬. আলেয়া বেগম, কুষ্টিয়া
৩৩৭. জুলেখা, কুষ্টিয়া
৩৩৮. নাজনীন আক্তার বৃষ্টি, বাগেরহাট
৩৩৯. সাবিনা বেগম, দিনাজপুর
৩৪০. নাছিম উদ্দিন, রংপুর
৩৪১. তানজিলা আক্তার, কিশোরগঞ্জ
৩৪২. দুলালী, নওগাঁ
৩৪৩. সাথী আক্তার, লক্ষীপুর
৩৪৪. মো: আরমান, জয়পুরহাট
৩৪৫. আফজাল হোসেন, রংপুর
৩৪৬. মাজেদা, জালকাঠি
৩৪৭. কাওসার, ঝালকাঠি
৩৪৮. সেলিম, নওগাঁ
৩৪৯. রিপন ব্যাপারী, টাঙ্গাইল
৩৫০. আনোয়ার হোসেন, গাইবান্ধা
৩৫১. নয়ন, সিরাজগঞ্জ
৩৫২. সুজন, গাইবান্ধা
৩৫৩. রাশিদা, নীলফামারী
৩৫৪. আসমা বেগম, গাইবান্ধা
৩৫৫. মমতাজ বেগম, রাজবাড়ী
৩৫৬. মুক্তা, যশোর
৩৫৭. লাইজু আক্তার, রংপুর
৩৫৮. রোজিনা আক্তার (শাম্মী), লালমনিরহাট
৩৫৯. কাইয়ুম, কুড়িগ্রাম
৩৬০. তোজাম্মেল হোসেন, গাইবান্ধা
৩৬১. চুমকি, রাজবাড়ী
৩৬২. নাঈম, ময়মনসিংহ
৩৬৩. সুমী আক্তার, চাঁদপুর
৩৬৪. পলি আক্তার, নেত্রকোনা
৩৬৫. আকরাম হোসেন, রাজবাড়ী
৩৬৬. মো: আশরাফুল ইসলাম, ঢাকা
৩৬৭. মুনসুর শেখ, মানিকগঞ্জ
৩৬৮. সাথী আক্তার, পাবনা
৩৬৯. সবুজ, বরগুনা
৩৭০. শিউলী বেগম, গাইবান্ধা
৩৭১. সিমা আক্তার, গাইবান্ধা
৩৭২. মো: কবির হোসেন, রংপুর
৩৭৩. চায়না, সিরাজগঞ্জ
৩৭৪. মিতু, ঝালকাঠি
৩৭৫. সেলিমুজ্জামান বাদশা, ঢাকা
৩৭৬. আমেনা আক্তার, মানিকগঞ্জ
৩৭৭. লিয়াকত আলী, চট্টগ্রাম
৩৭৮. মোকছেদুর, গাইবান্ধা
৩৭৯. আলমগীর, কুমিল্লা
৩৮০. সাগর মন্ডল, গাইবান্ধা
৩৮১. সুমি আক্তার, গাইবান্ধা
৩৮২. পরিতোষ চন্দ্র বর্মন, রংপুর
৩৮৩. মাহফুজুর রহমান মিল্লাত, চট্টগ্রাম
৩৮৪. জাহাঙ্গীর হোসেন শরিফ, বরিশাল
৩৮৫. মোছা: রেহেনা আক্তার, রাজবাড়ী
৩৮৬. মো: দুলাল মিয়া, চট্টগ্রাম
৩৮৭. পারভিন বেগম, বাগেরহাট
৩৮৮. মো: ফুরকান, বাগেরহাট
৩৮৯. তুষার, ময়মনসিংহ
৩৯০. রাজুকা খাতুন, ফরিদপুর
৩৯১. তুষার, ঝিনাইদহ
৩৯২. জাহেদা, চাঁদপুর
৩৯৩. শিল্পি, মানিকগঞ্জ
৩৯৪. মামুন, নাটোর
৩৯৫. শোভা আক্তার, ফরিদপুর
৩৯৬. ইউনুস মিয়া, গাইবান্ধা
৩৯৭. প্রমিলা, হবিগঞ্জ
৩৯৮. শরিফা বেগম, রংপুর
৩৯৯. ছাবিনা আক্তার, দিনাজপুর
৪০০. স্বপন বেপারী, টাঙ্গাইল
৪০১. মো: রাহিদুল ইসলাম আজাদ, রাজশাহী
৪০২. কল্পনা বেগম, জামালপুর
৪০৩. মিনু মিয়া, গাইবান্ধা
৪০৪. মোসা: জনতা আক্তার, মানিকগঞ্জ
৪০৫. রুবিনা বানু, রংপুর
৪০৬. জুলেখা,কুষ্টিয়া
৪০৭. মমতাজ বেগম, রাজবাড়ী
৪০৮. কবির হোসেন, টাঙ্গাইল

৪০৯. কামরুল, নীলফামারী
৪১০. খাদিজা বেগম, দিনাজপুর
৪১১. অলি উল্লাহ, বগুড়া
৪১২. রুকসানা, পিরোজপুর
৪১৩. মেহেদী, বগুড়া
৪১৪. জুয়েল হাওলাদার, বরিশাল
৪১৫. দুলালী, গাইবান্ধা
৪১৬. রিয়া আক্তার রুমা, ভোলা
৪১৭. শিউলী রানী দাস, মানিকগঞ্জ
৪১৮. রিপন, মানিকগঞ্জ
৪১৯. স্মৃতি, গাইবান্ধা
৪২০. খুশি খাতুন, পাবনা
৪২১. আল আমিন, নেত্রকোনা
৪২২. বাবুল বিশ্বাস, রাজবাড়ী
৪২৩. মো: সুজন, বরিশাল
৪২৪. খন্দকার সেলিম আহমেদ, মানিকগঞ্জ
৪২৫. মো: সুলতান, পিরোজপুর
৪২৬. তাহসান আহমেদ, রাজশাহী
৪২৭. কামাল হোসেন, ময়মনসিংহ
৪২৮. জাহানারা, টাঙ্গাইল
৪২৯. রাশিদা খাতুন, গাইবান্ধা
৪৩০. নূর মো: মীর, ভোলা
৪৩১. দীপা পাত্র, মাদারীপুর
৪৩২. রহিমা বেগম, রংপুর
৪৩৩. ইফতেখার হোসেন শাহিন, নরসিংদী
৪৩৪. মো: লিটন শেখ, রাজবাড়ী
৪৩৫. আনজু বেগম, রাজবাড়ী
৪৩৬. সোহেল রানা, সিরাজগঞ্জ
৪৩৭. রফিকুল ইসলাম, বরিশাল
৪৩৮. রাকিব, গাইবান্ধা
৪৩৯. সেলিম রানা, শেরপুর
৪৪০. মো: শাবলু, দিনাজপুর
৪৪১. মোছা: রেখা, রংপুর
৪৪২. মাকসুদা খানম, মাদারীপুর
৪৪৩. মো: সেলিম, পঞ্চগড়
৪৪৪. ফাহিমা, বরগুনা
৪৪৫. সিহেনা আক্তার কাজল, বরগুনা
৪৪৬. শামিমা, লক্ষীপুর
৪৪৭. সোনিয়া আক্তার, ঢাকা
৪৪৮. মো: আবু সালেহ, বরগুনা
৪৪৯. পলি, রাজবাড়ী
৪৫০. সাবিহা সুলতানা, বগুড়া
৪৫১. শিল্পী, বগুড়া
৪৫২. মো: রাশেদুজ্জামান, জামালপুর
৪৫৩. সোহেল রানা, নাটোর
৪৫৪. কাওসার, পটুয়াখালী
৪৫৫. আ: হামিদ, কুড়িগ্রাম
৪৫৬. রেহানা আক্তার, ঢাকা
৪৫৭. সেলিনা, চাঁদপুর
৪৫৮. রফিকুল ইসলাম, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া
৪৫৯. মো: ইছহাক, গাজীপুর
৪৬০. লাবনী আক্তার, লালমনিরহাট
৪৬১. তোফাজ্জল হোসেন, মানিকগঞ্জ
৪৬২. মেহেদী হাসান, নাটোর
৪৬৩. ইদ্রিস আলী, রংপুর
৪৬৪. সাইফুর রহমান, দিনাজপুর
৪৬৫. কামরুল আলম, চট্টগ্রাম
৪৬৬. রওশন আলী, চট্টগ্রাম
৪৬৭. সাইফুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ
৪৬৮. রেহেনা খাতুন, ময়মনসিংহ
৪৬৯. মিলন সিকদার, রাজবাড়ী
৪৭০. মোছা: ফাতেমা বেগম, রংপুর
৪৭১. মো: জাহাঙ্গীর আলম, নীলফামারী
৪৭২. সুমি খাতুন, সিরাজগঞ্জ
৪৭৩. মো: তছলিম হোসেন, চট্টগ্রাম
৪৭৪. রহিমা খাতুন, যশোর
৪৭৫. মোছা: ফারজানা খাতুন, দিনাজপুর
৪৭৬. জাহানারা বেগম, বরিশাল
৪৭৭. স্বপন সরকার, মুন্সিগঞ্জ
৪৭৮. আ: মালেক, মানিকগঞ্জ
৪৭৯. সোহান শেখ জাহিদ, বাগেরহাট
৪৮০. নয়ন, সিরাজগঞ্জ
৪৮১. মিলি, গাইবান্ধা
৪৮২. মিস জোসনা, মানিকগঞ্জ
৪৮৩. হাসান উদ্দিন, যশোর
৪৮৪. মো: জাহিদ হাসান, মানিকগঞ্জ
৪৮৫. অজুপা, ময়মনসিংহ
৪৮৬. ময়নাল হক, জামালপুর
৪৮৭. মাইদুর রহমান, মানিকগঞ্জ
৪৮৮. ওমর ফারুক, টাঙ্গাইল
৪৮৯. মো: রিপন, পিরোজপুর
৪৯০. আসমা বেগম, শরিয়তপুর
৪৯১. শিল্পী, পাবনা
৪৯২. শ্রী রীতা রানী সুত্রধর, মানিকগঞ্জ

৪৯৩. মোছা: লতিফা, ঢাকা
৪৯৪. রুকসানা বেগম, পটুয়াখালী
৪৯৫. রোজিনা আক্তার, বরগুনা
৪৯৬. জাকির হোসেন পাঠান, রাজবাড়ী
৪৯৭. হাসি খাতুন, রাজবাড়ী
৪৯৮. মোছা: জাকিয়া, বরগুনা
৪৯৯. হৃদয় (রাসেল), পিরোজপুর
৫০০. মোছা: শরিফা, ঢাকা
৫০১. শফিউল আলম, নওগাঁ
৫০২. সনজিত দাস, সুনামগঞ্জ
৫০৩. মো: ইউসুফ আলী, পঞ্চগড়
৫০৪. রুবি, বরগুনা
৫০৫. মায়া রানী, ঝিনাইদহ
৫০৬. মো: আলমগীর হোসেন (লিমন), পাবনা
৫০৭. মোস্তাফিজুর রহমান (বিপ্লব) , ফেনী
৫০৮. মো: ইকরামুল হক, নোয়াখালী
৫০৯. জোহরা, মানিকগঞ্জ
৫১০. আশরাফুল ইসলাম, মাগুড়া
৫১১. মো: রবিউল ইসলাম, শরিয়তপুর
৫১২. মো: আল আমিন, জয়পুরহাট
৫১৩. মো: আবু তাহের, বগুড়া
৫১৪. মাজেদা বেগম, রংপুর
৫১৫. সুশান্ত দাস, হবিগঞ্জ
৫১৬. মো: আলমগীর হোসেন, দিনাজপুর
৫১৭. মোছা: রাশিদা, সিরাজগঞ্জ
৫১৮. তসলিমা বেগম, খুলনা
৫১৯. জোসনা খাতুন, ফরিদপুর
৫২০. আবুল কাশেম, পাবনা
৫২১. সীমা আক্তার, পাবনা
৫২২. পারভীন, মানিকগঞ্জ
৫২৩. মো: আব্দুল হাই, টাঙ্গাইল
৫২৪. রাতী রানী, নীলফামারী
৫২৫. মো: মহিত শেখ, বাগেরহাট
৫২৬. সোনিয়া, ঢাকা
৫২৭. পারভীন, মাদারীপুর
৫২৮. মায়া রানী, লালমনিরহাট
৫২৯. শিরিন আক্তার, ময়মনসিংহ
৫৩০. অনিকা, কুষ্টিয়া
৫৩১. অন্তরা, রাজবাড়ী
৫৩২. বাদশা, বরগুনা
৫৩৩. মোছা: মুসলিমা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা
৫৩৪. মোছা: রতনা খাতুন, যশোর
৫৩৫. সামসুদ্দোহা, রংপুর
৫৩৬. মো: দীন ইসলাম, মানিকগঞ্জ
৫৩৭. মামুনুর রহমান, মাদারীপুর
৫৩৮. শেখ মো: ইউসুফ রানা, খুলনা
৫৩৯. জুলফিকার আলী মাসুদ, নওগাঁ
৫৪০. মো: নাসিম, রংপুর
৫৪১. মো: আব্দুল হাই, টাঙ্গাইল
৫৪২. সাহাবুদ্দিন, বরিশাল
৫৪৩. মো: গিয়াস উদ্দিন, বরিশাল
৫৪৪. মোছা: শাহিনুর, বগুড়া
৫৪৫. হান্নান, ঝিনাইদহ
৫৪৬. মেহেদী হাসান, মাগুড়া
৫৪৭. ইজাবুল মল্লিক, মাদারীপুর
৫৪৮. কেয়া আক্তার, রাজবাড়ী
৫৪৯. শাপলা আক্তার, পাবনা
৫৫০. মো: ফরহাদ আলী, সিরাজগঞ্জ
৫৫১. রেজাউল, নওগাঁ
৫৫২. রুহুল আমিন, ময়মনসিংহ
৫৫৩. মোছা: সাথী, কুড়িগ্রাম
৫৫৪. লাকী আক্তার ছনিয়া, গাজীপুর
৫৫৫. মর্জিনা বেগম, রাজবাড়ী
৫৫৬. জুয়েল, রংপুর
৫৫৭. সাবিনা ইয়াসমিন, জামালপুর
৫৫৮. বিলকিস বেগম, পটুয়াখালী
৫৫৯. সুমন দাস, মাদারীপুর
৫৬০. আ: কাদের লিটন, রাজশাহী
৫৬১. মোছা: শেফালী, রংপুর
৫৬২. আকলিমা, ময়মনসিংহ
৫৬৩. মো: ইসরাইল হোসেন, রাজশাহী
৫৬৪. নীলুফা বেগম, ঝিনাইদহ
৫৬৫. নূরুজ্জামান, সুনামগঞ্জ
৫৬৬. জিন্নাতারা পপি, বরিশাল
৫৬৭. হেলাল, পাবনা
৫৬৮. শিরিনা, নড়াইল
৫৬৯. সাইদুর রহমান, সাতক্ষীরা
৫৭০. মাহফুজা, রাজবাড়ী
৫৭১. মল্লিকা, গাইবান্ধা
৫৭২. মোছা: শারমিন আক্তার, ময়মনসিংহ
৫৭৩. রিতা খাতুন, মানিকগঞ্জ
৫৭৪. আরিফুল ইসলাম রাজু, বাগেরহাট
৫৭৫. মোসা: মাজেদা, মানিকগঞ্জ
৫৭৬. মো: মঞ্জুর এলাহী, রাজশাহী

৫৭৭. মোছা: ফরিদা, রংপুর
৫৭৮. মো: নুরুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ
৫৭৯. লিভা বেগম, খুলনা
৫৮০. লাকি, রাজবাড়ী
৫৮১. মো: রফিক, বরিশাল
৫৮২. মো: ফরহাদ হোসেন, রাজশাহী
৫৮৩. মো: তাজুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ
৫৮৪. মো: শাহিন, কিশোরগঞ্জ
৫৮৫. শহিদুল ইসলাম, ময়মনসিংহ
৫৮৬. আরিফা খাতুন, গাইবান্ধা
৫৮৭. ময়না বেগম, বরিশাল
৫৮৮. জমেলা, গাইবান্ধা
৫৮৯. আকলিমা বেগম, ঢাকা
৫৯০. হামিদা আক্তার, ময়মনসিংহ
৫৯১. সেলিনা, মানিকগঞ্জ
৫৯২. শহিদুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ
৫৯৩. সামসুন্নাহার, নওগাঁ
৫৯৪. নিশি আক্তার, নাটোর
৫৯৫. শেখ আবুল কালাম আজাদ, সাতক্ষীরা
৫৯৬. নাজমুল, সিরাজগঞ্জ
৫৯৭. রফিকুল, জামালপুর
৫৯৮. মো: সাজেদুল ইসলাম, পাবনা
৫৯৯. আবুল ফজল খান, টাঙ্গাইল
৬০০. মুক্তা, ঢাকা
৬০১. রোকসানা, রংপুর
৬০২. মো: মনোয়ারুল, গাইবান্ধা
৬০৩. হোসনে আরা, লক্ষীপুর
৬০৪. পারভীন, মানিকগঞ্জ
৬০৫. রুবি, ঝালকাঠি
৬০৬. মো: মুজাউর রহমান, ফরিদপুর
৬০৭. মো: আরিফুর রহমান, ঢাকা
৬০৮. সুমন সর্দার, মাদারীপুর
৬০৯. রাসেল, রংপুর
৬১০. আঞ্জুমান আরা, রংপুর
৬১১. আনজুমান বেগম, লালমনিরহাট
৬১২. নার্গিস, রংপুর
৬১৩. মো: সোলেমান, দিনাজপুর
৬১৪. নাসরিন আনোয়ার, নওগাঁ
৬১৫. মোছা: আসমা, শেরপুর
৬১৬. মো: জাকির হোসেন, সিরাজগঞ্জ
৬১৭. মো: টুটুল, চাঁদপুর
৬১৮. আফজাল হোসেন জয়, ঢাকা
৬১৯. মোসা: কুলসুম, বরিশাল
৬২০. মো: রিপন, বাগেরহাট
৬২১. রবিউল ইসলাম সুজন, মানিকগঞ্জ
৬২২. মো: নাজমুল হোসেন, রংপুর
৬২৩. মো: রিদওয়ান, চট্টগ্রাম
৬২৪. মনোয়ার হোসেন, ঢাকা
৬২৫. ফুলচান চন্দ্র মন্ডল, গাজীপুর
৬২৬. মামুন অর রশিদ, বগুড়া
৬২৭. জবিরুল মাওলা, চট্টগ্রাম
৬২৮. রাশেদুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ
৬২৯. আল্পনা, কিশোরগঞ্জ
৬৩০. শাহিদা খাতুন, গাইবান্ধা
৬৩১. শেফালী আক্তার, কিশোরগঞ্জ
৬৩২. মিনারা, শরিয়তপুর
৬৩৩. মো: সোহাগ, ঢাকা
৬৩৪. মো: আ: গণি, ভোলা
৬৩৫. মোছা: পারভীন বেগম, রাজবাড়ী
৬৩৬. মো: শরিফুল ইসলাম, দিনাজপুর
৬৩৭. মো: কামাল হোসেন, টাঙ্গাইল
৬৩৮. এখলাছ, ঢাকা
৬৩৯. মো: বেলায়েত হোসেন, বরগুনা
৬৪০. শাহনাজ বেগম, টাঙ্গাইল
৬৪১. মো: অইদুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম
৬৪২. হারুন-অর-রশিদ, ময়মনসিংহ
৬৪৩. সীমা আক্তার, বরিশাল
৬৪৪. ফোরকান হাওলাদী, বরিশাল
৬৪৫. কামরুজ্জামান বাবুল, কিশোরগঞ্জ
৬৪৬. মিনি আক্তার, গাইবান্ধা
৬৪৭. মো: হাসান চৌধুরী, দিনাজপুর
৬৪৮. শামসুল আলম, কুষ্টিয়া
৬৪৯. মো: সবুজ শেখ, গাইবান্ধা
৬৫০. জোসনা, ঢাকা
৬৫১. আবু জাফর মন্টু, মানিকগঞ্জ
৬৫২. খালেক, ঝিনাইদহ
৬৫৩. জাহিদ মোল্লা, রাজবাড়ী
৬৫৪. মোছা: শাহিনা আক্তার, বাগেরহাট
৬৫৫. মো: আনোয়ার, মানিকগঞ্জ
৬৫৬. লাল মিয়া, ঢাকা
৬৫৭. রাজু আহমেদ, রাজবাড়ী
৬৫৮. সালমা, বগুড়া
৬৫৯. আরিফুল ইসলাম, ঢাকা
৬৬০. হালিমা, জামালপুর

৬৬১. রেহানা বেগম, ঢাকা
৬৬২. খোকন, ঢাকা
৬৬৩. বেনু রানী দাস, ঢাকা
৬৬৪. মোছা: দুলালী বেগম, গাইবান্ধা
৬৬৫. মো: আবু সাঈদ, রংপুর
৬৬৬. আসমা, পাবনা
৬৬৭. নূরে আলম সিকদার, ঝালকাঠি
৬৬৮. ফিরোজা বেগম, ঢাকা
৬৬৯. গবিন্দ, হবিগঞ্জ
৬৭০. একরামুল, রংপুর
৬৭১. কাকলী, মানিকগঞ্জ
৬৭২. মোছা: শিল্পি আক্তার, ঠাকুরগাঁও
৬৭৩. মো: সুমন, চট্টগ্রাম
৬৭৪. হোসনে আরা, চাঁদপুর
৬৭৫. জোসনা, পাবনা
৬৭৬. মৌসুমি, দিনাজপুর
৬৭৭. মোছা: রেশমা আক্তার, দিনাজপুর
৬৭৮. মোছা: খোদেজা বেগম, ফরিদপুর
৬৭৯. শারমিন সুলতানা, যশোর
৬৮০. রিজিয়া খাতুন, গাজীপুর
৬৮১. সাবিনা খাতুন, নওগাঁ
৬৮২. নিত্যা খাতুন, টাঙ্গাইল
৬৮৩. শিলা রানী শিপরা, মানিকগঞ্জ
৬৮৪. মো: কাদের সিদ্দিক, গাইবান্ধা
৬৮৫. সাজেদা বেগম, জয়পুরহাট
৬৮৬. বিথী, ময়মনসিংহ
৬৮৭. শরিফুল ইসলাম, পাবনা
৬৮৮. শিউলী আক্তার, ঢাকা
৬৮৯. মো: সেলিম হোসেন, নওগাঁ
৬৯০. মো: শহীদুল্লাহ, জামালপুর
৬৯১. মো: হুমায়ুন, মাগুড়া
৬৯২. দিপালী রানী দাস, মানিকগঞ্জ
৬৯৩. রহিমা, জামালপুর
৬৯৪. মেরিনা, নওগাঁ
৬৯৫. ময়না আক্তার, রাজবাড়ী
৬৯৬. শাহিদা বেগম, চাঁদপুর
৬৯৭. রফিকুল ইসলাম, রংপুর
৬৯৮. মো: ইসরাফিল, ময়মনসিংহ
৬৯৯. মো: আলী আজম, ঢাকা
৭০০. জরিনা খাতুন, রাঙ্গামাটি
৭০১. মোছা: সাহেরা, বগুড়া
৭০২. মো: বাবুল হোসেন, ঢাকা
৭০৩. রবিতা রানী দাস, ঢাকা
৭০৪. সফিকুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ
৭০৫. সোনিয়া, ঝালকাঠি
৭০৬. মনোয়ারা, মানিকগঞ্জ
৭০৭. মোছা: সুলতানা বেগম, জামালপুর
৭০৮. মামুন শেখ, কুষ্টিয়া
৭০৯. জহুরুল ইসলাম, গাইবান্ধা
৭১০. মো: আব্দুর রাজ্জাক খান, ঢাকা
৭১১. মোছা: মরিয়ম বেগম, নওগাঁ
৭১২. মোছা: পলি খাতুন, সিরাজগঞ্জ
৭১৩. মোছা: নুরী আক্তার, রংপুর
৭১৪. মো: শাহজাহান, ঢাকা
৭১৫. মোছা: সাহনাজ, ভোলা
৭১৬. সাইদুল ইসলাম, কুষ্টিয়া
৭১৭. সেলিম শেখ, রাজশাহী
৭১৮. মোছা: মতিজা, বগুড়া
৭১৯. আছমা খাতুন, জামালপুর
৭২০. রাজিনা, মানিকগঞ্জ
৭২১. যমুনা রানী, ঢাকা
৭২২. মো: নার্গিস বেগম, ময়মনসিংহ
৭২৩. সুমি, ভোলা
৭২৪. সরজিতা, দিনাজপুর
৭২৫. শাবানা, নাটোর
৭২৬. কল্পনা, নওগাঁ
৭২৭. কায়েম বেগম, গোপালগঞ্জ
৭২৮. মো: আনিছ, জামালপুর
৭২৯. মো: মাসুদ রানা, কুষ্টিয়া
৭৩০. জামাল মিয়া, ঝালকাঠি
৭৩১. রোকেয়া আক্তার, ফরিদপুর
৭৩২. মো: জিল্লুর বারী, বগুড়া
৭৩৩. লিপি আক্তার, গাইবান্ধা
৭৩৪. মো: লুৎফর রহমান, দিনাজপুর
৭৩৫. লাকী আক্তার, মানিকগঞ্জ
৭৩৬. লতা বেগম, কুষ্টিয়া
৭৩৭. মো: নূর ইসলাম রাব্বানী, দিনাজপুর
৭৩৮. রানী, রংপুর
৭৩৯. শিউলি আক্তার, চাঁদপুর
৭৪০. নীলা আক্তার, রংপুর
৭৪১. আল্পনা, ঢাকা
৭৪২. নার্গিস, পটুয়াখালী
৭৪৩. সাগরিকা, মানিকগঞ্জ
৭৪৪. মালা রাণী বাড়ই, মাদারীপুর

৭৪৫. মোছা: সোনিয়া, বরগুনা
৭৪৬. শিরিনা বেগম, রাজবাড়ী
৭৪৭. মো: সুমন, নীলফামারী
৭৪৮. মোছা: রেখা বেগম, মানিকগঞ্জ
৭৪৯. মোছা: মঞ্জিলা বেগম, গাইবান্ধা
৭৫০. মো: মিজানুর হোসেন, ঢাকা
৭৫১. ঝর্ণা, সিরাজগঞ্জ
৭৫২. মো: নাসির উদ্দিন, বরগুনা
৭৫৩. মোসা: খাইরুন নাহার, পাবনা
৭৫৪. মো: মুন্না মিয়া, রংপুর
৭৫৫. শাহানা বেগম, গাইবান্ধা
৭৫৬. আলো, ঢাকা
৭৫৭. শাহনাজ, মানিকগঞ্জ
৭৫৮. পারভীন আক্তার, রাজবাড়ী
৭৫৯. রহিমা, গাইবান্ধা
৭৬০. লিপি আক্তার, ময়মনসিংহ
৭৬১. মো: কাজল মিয়া, লালমনিরহাট
৭৬২. মো: রেহেনা, শেরপুর
৭৬৩. আব্দুল আজিজ, শেরপুর
৭৬৪. মো: জসীম, মানিকগঞ্জ
৭৬৫. তাসলিমা, সিরাজগঞ্জ
৭৬৬. মো: আনিসুর রহমান, জামালপুর
৭৬৭. মোছা: রুপা আক্তার, পাবনা
৭৬৮. রিফাত হোসেন, গোপালগঞ্জ
৭৬৯. রাহেনা খাতুন, নোয়াখালী
৭৭০. লাইলী বেগম, রংপুর
৭৭১. রায়হান, নাটোর
৭৭২. মোছা: সুরিয়া বেগম, টাঙ্গাইল
৭৭৩. মালা আক্তার, রাজবাড়ী
৭৭৪. রাবেয়া বাসরী, রাজশাহী
৭৭৫. রোজিনা আক্তার, সিরাজগঞ্জ
৭৭৬. মো: বাদল, বরগুনা
৭৭৭. রিনা আক্তার, দিনাজপুর
৭৭৮. মো: ইকবাল হোসেন, পাবনা
৭৭৯. জাহিদ হাসান, রংপুর
৭৮০. ছুরমান আলী, ঢাকা
৭৮১. সালমা বেগম, ঢাকা
৭৮২. মো: রফিকুল ইসলাম, মানিকগঞ্জ
৭৮৩. মনিরা বেগম, ফরিদপুর
৭৮৪. মো: মমিনুল মিয়া, রংপুর
৭৮৫. মর্জিনা আক্তার, ঢাকা
৭৮৬. জাকির হোসেন, ঢাকা
৭৮৭. জরিনা বেগম, রাজশাহী
৭৮৮. আল-আমিন, বরগুনা
৭৮৯. রুবিনা বেগম, রাজশাহী
৭৯০. আনোয়ারা বেগম, বরিশাল
৭৯১. মাহাবুবুল আলম, কুমিল্লা
৭৯২. মো: রিপন, পাবনা
৭৯৩. মনোয়ারা, মানিকগঞ্জ
৭৯৪. কাজলী, নাটোর
৭৯৫. আল-আমিন, নওগাঁ
৭৯৬. আলামিন, বরগুনা
৭৯৭. শাহিনুর আক্তার, ফরিদপুর
৭৯৮. হাসি বেগম, বরিশাল
৭৯৯. মাকসুদা, গাইবান্ধা
৮০০. আশিক, টাঙ্গাইল
৮০১. জসীম, ভোলা
৮০২. শোভা আক্তার, কুষ্টিয়া
৮০৩. নুরুল হুদা সোহেল, নোয়াখালী
৮০৪. দুলাল মিয়া, বাগেরহাট
৮০৫. বেলাল হোসেন, ঢাকা
৮০৬. মোছা: শারমিন, জামালপুর
৮০৭. খোকন মিয়া, জামালপুর
৮০৮. নাসিমা বেগম, চাঁদপুর
৮০৯. সাহিদা আক্তার, ঢাকা
৮১০. সাথী, খুলনা
৮১১. হেলেনা আক্তার, ঢাকা
৮১২. ফুলজান খাতুন, রাজশাহী
৮১৩. নূর করিম, গাইবান্ধা
৮১৪. সুমন মিয়া, দিনাজপুর
৮১৫. হানিফ খান, টাঙ্গাইল
৮১৬. বিপ্লব ভট্টাচার্য, হবিগঞ্জ
৮১৭. রেখা আলম, বগুড়া
৮১৮. নূর জাহান বেগম, পাবনা
৮১৯. পিয়ারা খাতুন, বগুড়া
৮২০. রোজিনা খাতুন, ঝিনাইদহ
৮২১. মোসা: শেফালী বেগম, জামালপুর
৮২২. লতা ইয়াসমিন, ঢাকা
৮২৩. শাহীন, গাইবান্ধা
৮২৪. মোছা: চম্পা বেগম, বরিশাল
৮২৫. পিন্টু, ঢাকা
৮২৬. রিনা আক্তার, নরসিংদী
৮২৭. রিনা, বরগুনা
৮২৮. কবিতা আক্তার, মানিকগঞ্জ

৮২৯. মিতা খাতুন, রাজবাড়ী
৮৩০. মো: শাহজাহান আলী, গাইবান্ধা
৮৩১. মো: জসীম উদ্দিন, নওগাঁ
৮৩২. নাজিম উদ্দিন, গাইবান্ধা
৮৩৩. মো: মনোয়ারুল, গাইবান্ধা
৮৩৪. সুলতানা, পাবনা
৮৩৫. বাকি শেখ, খুলনা
৮৩৬. মমতাজ, টাঙ্গাইল
৮৩৭. মোসা: নাছিনা খাতুন, ঝিনাইদহ
৮৩৮. আশরাফুল ইসলাম, ময়মনসিংহ
৮৩৯. আঞ্জুয়ারা, নড়াইল
৮৪০. শ্রী সুজন চন্দ্র রায়, রংপুর
৮৪১. রুপালী, রংপুর
৮৪২. সোহেল রানা অপু, টাঙ্গাইল

রানা প্লাজা ধসে নিহতদের নামের তালিকা

(ডিএনএ রিপোর্ট অনুসারে)

১. মোসা: সাবি বেগম, গাইবান্ধা
২. সালমা আক্তার, পিরোজপুর
৩. পপি আক্তার, নওগাঁ
৪. নূরে আলম শিকদার, ঝালকাঠি
৫. আমিনা খাতুন, গোপালগঞ্জ
৬. আলেয়া খাতুন, নাটোর
৭. পারভীন, মানিকগঞ্জ
৮. মোছা: স্মৃতি বেগম, নীলফামারী
৯. সুমি, মানিকগঞ্জ
১০. হেনা, বরিশাল
১১. সুমন দাম, ফরিদপুরকেয়া আক্তার, রাজবাড়ী
১২. রিয়াজুল ইসলাম, রাজবাড়ী
১৩. আকাই আক্তার, সাভার
১৪. মো: আবু তাহের, বগুড়া
১৫. মো: সাঈদ,
১৬. আল্পনা দাসী, ঢাকা
১৭. উর্মী বেগম, রাজবাড়ী
১৮. সুলতানা খাতুন, নওগাঁ
১৯. মর্জিনা খাতুন, ময়মনসিংহ
২০. মর্জিনা বেগম, রাজবাড়ী
২১. রেহানা, রাজবাড়ী
২২. সকিনা, নীলফামারী
২৩. লাইজু আক্তার, ভোলা
২৪. জিন্নাত আরা পপি, ভোলা
২৫. মো: জাহাঙ্গীর শেখ, ফরিদপুর
২৬. টিটু, চাঁদপুর
২৭. তাসলিমা আক্তার, ময়মনসিংহ
২৮. সুলতানা, ঢাকা
২৯. মোছা: বৃষ্টি আক্তার, বগুড়া
৩০. নাজমা বেগম, চাঁদপুর
৩১. রীনা, বগুড়া
৩২. হাসি বেগম, বরিশাল
৩৩. বন্যা আক্তার, কিশোরগঞ্জ
৩৪. রাশেদা, গাইবান্ধা
৩৫. সুশান্ত দাশ, হবিগঞ্জ
৩৬. শিল্পী আক্তার, ঢাকা
৩৭. মাহমুদা, নওগাঁ
৩৮. আবু সাঈদ, পিরোজপুর
৩৯. রফিকুল, বরিশাল
৪০. প্রভাত বসু, নওগাঁ
৪১. সেলিম, রাজশাহী
৪২. মো: খাইরূল, বরগুনা
৪৩. লাবনী, পাবনা
৪৪. রফিকুল ইসলাম, রংপুর
৪৫. শিরীন বেগম, মানিকগঞ্জ
৪৬. মো: বাকি শেখ, খুলনা
৪৭. আরজু, রংপুর
৪৮. ফরিজান, রাজশাহী
৪৯. নাজিমুদ্দীন, নওগাঁ
৫০. সেলিনা, চাঁদপুর
৫১. সুমন, ঢাকা
৫২. মনোয়ার হোসেন, ঢাকা
৫৩. মার্থা শিখা হাশদা, রাজশাহী
৫৪. মো: আব্দুর রশীদ, নওগাঁ
৫৫. শামসুন নাহার, কিশোরগঞ্জ
৫৬. সুজিত সাহা, ঢাকা
৫৭. সহিমা, টাঙ্গাইল
৫৮. হেলেনা খাতুন, জামালপুর
৫৯. লাকি আক্তার, ঝালকাঠি
৬০. শিরীন আক্তার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৬১. শাহিনূর বেগম, মাদারীপুর
৬২. রোজিনা, পাবনা
৬৩. মো: সাইদুল, মানিকগঞ্জ
৬৪. সীমাতুন সুজাতা, কুষ্টিয়া
৬৫. আরিছা খাতুন, রংপুর
৬৬. মোছা: শিল্পী, মাগুড়া
৬৭. বেগম, গাইবান্ধা
৬৮. এ্যানি বেগম, নীলফামারী
৬৯. সাগরিকা রানী দাস, মানিকগঞ্জ
৭০. মালেকা আক্তার, ব্রাহ্মনবাড়িয়া
৭১. রেশমা, পাবনা
৭২. শামসুন্নাহার, মানিকগঞ্জ

৭৩. শহিদুল, রংপুর
৭৪. পেপেতুয়া হাশদা, দিনাজপুর
৭৫. রিনা আক্তার, লক্ষীপুর
৭৬. ইস্রাফিল, ময়মনসিংহ
৭৭. মোছাঃ মাকছুদা আক্তার, গাইবান্ধা
৭৮. সুমন, চট্টগ্রাম
৭৯. লিজা আক্তার, পিরোজপুর
৮০. মর্জিনা, রংপুর
৮১. হেমায়েত আলী চৌধুরী, গোপালগঞ্জ
৮২. বুলবুলি, গাইবান্ধা
৮৩. পারভীন বেগম, ঢাকা
৮৪. লতা বেগম, কুষ্টিয়া
৮৫. মোছাঃ ইছমোতারা বেগম, নওগাঁ
৮৬. চান বানু, নওগাঁ
৮৭. মোহসীনা খাতুন, জয়পুরহাট
৮৮. মৌসুমি আক্তার, দিনাজপুর
৮৯. সমোলা আক্তার, বরিশাল
৯০. ঝর্ণা, শরীয়তপুর
৯১. শিল্পী আক্তার, ঢাকা
৯২. জান্নাত, বরিশাল
৯৩. মমতাজ, টাঙ্গাইল
৯৪. সাথী, পটুয়াখালী
৯৫. বিথী, জামালপুর
৯৬. মোছাঃ রাশেদা খাতুন, মেহেরপুর
৯৭. পিংকী, গাইবান্ধা
৯৮. লিটন, ফরিদপুর
৯৯. কমিলা বেগম, রাজশাহী
১০০. আছমা বেগম, নওগাঁ
১০১. মোঃ আনিস, শেরপুর
১০২. সাহিদা, মানিকগঞ্জ
১০৩. মাসুদ, গাইবান্ধা
১০৪. সুরভী রানী দাস, হবিগঞ্জ
১০৫. আছমা আক্তার, বগুড়া
১০৬. বুলবুলি বেগম, গাইবান্ধা
১০৭. রোকসানা বেগম, মানিকগঞ্জ
১০৮. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মানিকগঞ্জ
১০৯. তাসলিমা খাতুন, রাজবাড়ী
১১০. ইয়াসমীন, বগুড়া
১১১. রেজাউল মন্ডল, বগুড়া
১১২. নাজমা, বরিশাল
১১৩. পুস্প রানী, ঢাকা
১১৪. আসাদুল ব্যাপারী, বগুড়া
১১৫. সাগরিকা, নাটোর
১১৬. মোঃ আবুল কাশেম ভুঁইয়া, খুলনা
১১৭. মনিরা খাতুন, শেরপুর
১১৮. মেহের রানী বেগম, গাইবান্ধা
১১৯. রোজিনা আক্তার, ব্রাহ্মনবাড়িয়া
১২০. সালমা, কুড়িগ্রাম
১২১. আশা, রাজবাড়ী
১২২. সালমা, রাজবাড়ী
১২৩. ফরিদ হোসেন, পাবনা
১২৪. রাজা, গাইবান্ধা
১২৫. ইমরান হোসেন, নওগাঁ
১২৬. নাসিমা আক্তার, টাঙ্গাইল
১২৭. শহিদুল, ফরিদপুর
১২৮. শাহনাজ বেগম, বাগেরহাট
১২৯. লতা খাতুন, নড়াইল
১৩০. মোছাঃ কহিনূর, নওগাঁ
১৩১. মোছাঃ নাসা বেগম, গাইবান্ধা
১৩২. তাসলিমা, ফরিদপুর
১৩৩. পারভীন বেগম, ঢাকা
১৩৪. এ. সালাম, নওগাঁ
১৩৫. মোঃ শরীফ হোসেন, কিশোরগঞ্জ
১৩৬. মোছাঃ হাছনা বেগম, মানিকগঞ্জ
১৩৭. জাদব দাস, হবিগঞ্জ
১৩৮. সাজেদা বেগম, শরীয়তপুর
১৩৯. মোঃ কামরুল হাসান, জামালপুর
১৪০. মোছাঃ জাহিমুন্নেসা, যশোর
১৪১. রাজিনা আক্তার, শরীয়তপুর
১৪২. রেহানা পারভীন, জয়পুরহাট
১৪৩. মোঃ শাহাদাৎ, কুড়িগ্রাম
১৪৪. রুবিনা খাতুন
১৪৫. সাজেদা
১৪৬. আছমা, ঝিনাইদহ
১৪৭. মর্জিনা খাতুন, সাতক্ষীরা
১৪৮. রহিমা বিবি, ভোলা
১৪৯. হালিমা খাতুন, কুড়িগ্রাম
১৫০. আসাদুর জামান, মাগুড়া
১৫১. সাবেদা খাতুন, রংপুর
১৫২. শিরীনা, নওগাঁ
১৫৩. স্বপ্না বেগম, নওগাঁ
১৫৪. আছমা আক্তার, খুলনা
১৫৫. জেসমিন, রাজবাড়ী
১৫৬. মোসলিমা, ঢাকা

১৫৭. সাথী আক্তার, টাঙ্গাইল
১৫৮. শামীমা আক্তার, ঝিনাইদহ
১৫৯. রিয়াজুল ইসলাম, রাজবাড়ী
১৬০. একাই আক্তার, সাভার
১৬১. মনিকা, রাজশাহী
১৬২. বেনু রানী দাস, হবিগঞ্জ
১৬৩. সম্পতি রানী দাস, সুনামগঞ্জ
১৬৪. টিটু, চাঁদপুর
১৬৫. জোসনা বেগম, ঢাকা
১৬৬. মো: জসিম উদ্দীন, গাইবান্ধা
১৬৭. রাবেয়া আক্তার, পটুয়াখালী
১৬৮. রেশমা বেগম, রাজবাড়ী
১৬৯. রাকিব, দিনাজপুর
১৭০. শিরীন আক্তার, ফরিদপুর
১৭১. শওকত হোসেন, মেহেরপুর
১৭২. নাজু আক্তার, বাগেরহাট
১৭৩. সুইট, নড়াইল
১৭৪. বিটু বাড়ই, বরিশাল
১৭৫. মো: ওবায়দুল, বগুড়া
১৭৬. শিল্পী আক্তার, ঠাকুরগাঁও
১৭৭. রাবেয়া খাতুন, ভোলা
১৭৮. মোছা: নাসিমা আক্তার, দিনাজপুর
১৭৯. জাহানারা বেগম, রংপুর
১৮০. নার্গিস, জামালপুর
১৮১. পুস্প রানী, ঢাকা
১৮২. রাশেদা বেগম, ঢাকা
১৮৩. মোছা: নীলুফা বেগম, পিরোজপুর
১৮৪. ফাতেমা আক্তার, মানিকগঞ্জ
১৮৫. কাঞ্চন মালা, ঢাকা
১৮৬. নূরজাহান বেগম, ঢাকা
১৮৭. জাহিদা খাতুন, রংপুর
১৮৮. মো: শাহিন রেজা, জয়পুরহাট
১৮৯. রেহানা বেগম, মানিকগঞ্জ
১৯০. সাজেদা বেগম, শরীয়তপুর
১৯১. সূর্য বানু, শরীয়তপুর
১৯২. এলিনা আক্তার, পাবনা
১৯৩. মোছা: ওজিফা, রংপুর
১৯৪. সীমা খাতুন, রাজবাড়ী
১৯৫. আসাদুর জামান, মাগুড়া
১৯৬. আক্কাস মিঞা, ময়মনসিংহ
১৯৭. সবিরন, রংপুর

রানা প্লাজা ধসে নিখোঁজদের নামের তালিকা

১. আখি আক্তার, ঢাকা
২. জোসনা আক্তার, ঢাকা
৩. সুমন, ঢাকা
৪. সুজিত সাহা, ঢাকা
৫. আফজাল, ঢাকা
৬. রাশেদা বেগম, ঢাকা
৭. কাঞ্চন মালা, ঢাকা
৮. নুরজাহান বেগম, ঢাকা
৯. মনির হোসেন, ঢাকা
১০. ঝুমা, ঢাকা
১১. হাবিবুর, ঢাকা
১২. পারভীন বেগম, ঢাকা
১৩. মো : কামাল, ঢাকা
১৪. শায়লা আক্তার, ঢাকা
১৫. মোসলেমা, ঢাকা
১৬. নুসরাত জাহান রুনা, জামালপুর
১৭. সহিদুল্লাহ, জামালপুর
১৮. মো : বিল্লাহ হোসেন, জামালপুর
১৯. হেলেনা খাতুন, জামালপুর
২০. মো : শামীম হোসেন, জামালপুর
২১. বিথী, জামালপুর
২২. নার্গিস, জামালপুর
২৩. শাহিন, জামালপুর
২৪. মোছা: শারমিন আক্তার, জামালপুর
২৫. রিক্তা, জামালপুর
২৬. কামরুল হাসান, জামালপুর
২৭. আবিয়া বেগম, জামালপুর
২৮. মর্জিনা বেগম, কুমিল্লা
২৯. রেহানা, রাজবাড়ী
৩০. রাশেদা, রাজবাড়ী
৩১. রেশমা বেগম, রাজবাড়ী
৩২. মোছা : এরিনা বেগম, রাজবাড়ী
৩৩. তাসলিমা খাতুন, রাজবাড়ী
৩৪. আশা, রাজবাড়ী
৩৫. সালমা বেগম, রাজবাড়ী
৩৬. মোছা : আসমা, রাজবাড়ী
৩৭. রওশন আরা, রাজবাড়ী
৩৮. সীমা খাতুন, রাজবাড়ী
৩৯. সাজেদা আক্তার, রাজবাড়ী
৪০. জেসমিন আক্তার, রাজবাড়ী
৪১. আলেয়া খাতুন, নাটোর
৪২. মতিউর রহমান, নাটোর
৪৩. দেলনাহার খাতুন, নাটোর
৪৪. সাগরিকা, নাটোর
৪৫. আরজুবা, রংপুর
৪৬. মো: রাজিব, রংপুর
৪৭. আরিছা খাতুন, রংপুর
৪৮. শহিদুল, রংপুর
৪৯. মরজিনা, রংপুর
৫০. কুলসুম, রংপুর
৫১. জাহানারা বেগম, রংপুর
৫২. বাবুল, রংপুর
৫৩. জাহিদা খাতুন, রংপুর
৫৪. ওজিফা, রংপুর
৫৫. মোরশেদুল, রংপুর
৫৬. মালেকা আক্তার, বিবাড়িয়া
৫৭. রুনা, বিবাড়িয়া
৫৮. মর্জিনা খাতুন, ময়মনসিংহ
৫৯. রেজিয়া খাতুন, ময়মনসিংহ
৬০. মোছা : মাহমুদা, ময়মনসিংহ
৬১. ইয়াসমিন, ময়মনসিংহ
৬২. হৃদয়, ময়মনসিংহ
৬৩. এবাদুল হক, ময়মনসিংহ
৬৪. সালেহা বেগম, ময়মনসিংহ
৬৫. তাসলিমা আক্তার, ময়মনসিংহ
৬৬. শাহিনুর বেগম, মাদারীপুর
৬৭. বিউটি বেগম, মাদারীপুর
৬৮. মো: ফরিদ, চট্টগ্রাম
৬৯. রেনু আক্তার, পঞ্চগড়
৭০. মোছা : শিল্পী, মাগুড়া
৭১. হাজেরা, জয়পুরহাট
৭২. মোহসিনা খাতুন, জয়পুরহাট
৭৩. মাহেদুল, জয়পুরহাট
৭৪. শাহীন রেজা, জয়পুরহাট

৭৫. রেহেনা পারভীন, জয়পুরহাট
৭৬. আঁখি, পিরোজপুর
৭৭. তাপস হাওলাদার, পিরোজপুর
৭৮. আবু সাঈদ, পিরোজপুর
৭৯. লিজা আক্তার, পিরোজপুর
৮০. নিলুফা, পিরোজপুর
৮১. সালমা আক্তার, পিরোজপুর
৮২. সিমু বেগম, মানিকগঞ্জ
৮৩. সুমি, মানিকগঞ্জ
৮৪. শিরীন বেগম, মানিকগঞ্জ
৮৫. মো: সাইদুল, মানিকগঞ্জ
৮৬. ময়না আক্তার, মানিকগঞ্জ
৮৭. শামসুন্নাহার(শান্তা), মানিকগঞ্জ
৮৮. শামীম, মানিকগঞ্জ
৮৯. শহিদা, মানিকগঞ্জ
৯০. শিলা, মানিকগঞ্জ
৯১. রোকসানা বেগম, মানিকগঞ্জ
৯২. মো: জাহাঙ্গীর হোসেন, মানিকগঞ্জ
৯৩. রাসেল, মানিকগঞ্জ
৯৪. ফাতেমা আক্তার, মানিকগঞ্জ
৯৫. শিল্পী আক্তার, মানিকগঞ্জ
৯৬. হাসনা বেগম, মানিকগঞ্জ
৯৭. রেহেনা বেগম, মানিকগঞ্জ
৯৮. সুমি আক্তার, মানিকগঞ্জ
৯৯. নির্মলা দাস, হবিগঞ্জ
১০০. যাদব দাস, হবিগঞ্জ
১০১. সমাপ্তি রানী দাস, সুনামগঞ্জ
১০২. রুমা আক্তার, সুনামগঞ্জ
১০৩. ফরিজান, রাজশাহী
১০৪. মার্থা শিখা হাসদা, রাজশাহী
১০৫. কমেলা বেগম, রাজশাহী
১০৬. মো: জহিরুল ইসলাম, রাজশাহী
১০৭. শিখা আক্তার, রাজশাহী
১০৮. আমেনা খাতুন, গোপালগঞ্জ
১০৯. নার্গিস, গোপালগঞ্জ
১১০. রাফিজা, গোপালগঞ্জ
১১১. হিমায়েত আলী, গোপালগঞ্জ
১১২. পপি আক্তার, নওগাঁ
১১৩. সুলতানা, খাতুন, নওগাঁ
১১৪. ইয়াসমিন, নওগাঁ
১১৫. মাহমুদা আক্তার, নওগাঁ
১১৬. প্রভাতী চন্দ্র বসু, নওগাঁ
১১৭. মো: আব্দুর রশীদ, নওগাঁ
১১৮. আল আমিন, নওগাঁ
১১৯. মোছা: ইসমোতারা বেগম, নওগাঁ
১২০. আসমা বেগম, নওগাঁ
১২১. বেবী আক্তার, নওগাঁ
১২২. ইমরান হোসেন, নওগাঁ
১২৩. মোছা: কহিনূর, নওগাঁ
১২৪. মোছা: মুন্নি, নওগাঁ
১২৫. মো: আব্দুস সালাম, নওগাঁ
১২৬. নাছিমা, নওগাঁ
১২৭. শিরিনা, নওগাঁ
১২৮. স্বপ্না বেগম, নওগাঁ
১২৯. সালেহা, নওগাঁ
১৩০. ঝর্না বেগম, নওগাঁ
১৩১. লিপি, নওগাঁ
১৩২. মো: সুজাউর রহমান, ফরিদপুর
১৩৩. আলমগীর শেখ, ফরিদপুর
১৩৪. শিরিনা আক্তার রিনা, ফরিদপুর
১৩৫. আজম, ফরিদপুর
১৩৬. লিটন, ফরিদপুর
১৩৭. মুন্নি আক্তার সাজেদা, ফরিদপুর
১৩৮. শহিদুল, ফরিদপুর
১৩৯. তাসলিমা, ফরিদপুর
১৪০. আনোয়ারুল ইসলাম, শেরপুর
১৪১. মো: আনিস, শেরপুর
১৪২. মনিরা খাতুন, শেরপুর
১৪৩. মো: ছেকান্দার, শেরপুর
১৪৪. মো: ইমরান হোসেন, শেরপুর
১৪৫. সুলায়মান হোসেন, সিরাজগঞ্জ
১৪৬. মমতা খাতুন, সিরাজগঞ্জ
১৪৭. আমেনা খাতুন, সিরাজগঞ্জ
১৪৮. মোসা: আমিনা খাতুন, সিরাজগঞ্জ
১৪৯. আলেয়া, চুয়াডাঙ্গা
১৫০. নাসিমা আক্তার, মুন্সীগঞ্জ
১৫১. সাথী, পটুয়াখালী
১৫২. রাবেয়া আক্তার, পটুয়াখালী
১৫৩. শিরীন আক্তার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১৫৪. আসাদুজ্জামান, মাগুড়া
১৫৫. সুইটি, নড়াইল
১৫৬. লতা খাতুন, নড়াইল
১৫৭. শিল্পী আক্তার (১), ঢাকা
১৫৮. শিল্পী আক্তার (২), ঢাকা

১৫৯. রেখা, ঢাকা
১৬০. পুষ্প রানী, ঢাকা
১৬১. রিনা আক্তার, ঢাকা
১৬২. শান্তা আক্তার, ঢাকা
১৬৩. জহীরুন, যশোর
১৬৪. মোছা: রহিমা খাতুন (মুন্নী), যশোর
১৬৫. সাবিনা খাতুন, যশোর
১৬৬. মো: শাহাবুদ্দিন কবীর, যশোর
১৬৭. নাজু আক্তার, বাগেরহাট
১৬৮. শাহনাজ বেগম, বাগেরহাট
১৬৯. মো : হাসান, বরগুনা
১৭০. সালমা আক্তার, বরগুনা
১৭১. মো : আজমল, বরগুনা
১৭২. আলী আকবর, বরগুনা
১৭৩. রোজিনা, বরগুনা
১৭৪. আমিনা, বরগুনা
১৭৫. খাইরুল, বরগুনা
১৭৬. সেলিনা আক্তার, রাঙ্গামাটি
১৭৭. মর্জিনা খাতুন, সাতক্ষীরা
১৭৮. বন্যা আক্তার, কিশোরগঞ্জ
১৭৯. শামসুন নাহার, কিশোরগঞ্জ
১৮০. সমলা খাতুন, কিশোরগঞ্জ
১৮১. ব্রজেশ্বর দাস, হবিগঞ্জ
১৮২. সুরভী রানী দাস, হবিগঞ্জ
১৮৩. সাফিয়া খাতুন, হবিগঞ্জ
১৮৪. রাবেয়া বেগম রেখা, নোয়াখালী
১৮৫. শান্তা আক্তার, ঢাকা
১৮৬. সাজেদা বেগম, শরীয়তপুর
১৮৭. রোজিনা আক্তার, শরীয়তপুর
১৮৮. লিপি আক্তার, শরীয়তপুর
১৮৯. বেগম মায়া, শরীয়তপুর
১৯০. বেগম ঝর্ণা আক্তার, শরীয়তপুর
১৯১. সাহিদা বেগম, শরীয়তপুর
১৯২. বেগম সূর্য ভানু, শরীয়তপুর
১৯৩. হোসনে আরা, চাঁদপুর
১৯৪. রাজমা বেগম, চাঁদপুর
১৯৫. সেলিনা, চাঁদপুর
১৯৬. রহিমা বিবি, ভোলা
১৯৭. হালিমা খাতুন, কুড়িগ্রাম
১৯৮. সালমা, কুড়িগ্রাম
১৯৯. সুফিয়া বেগম, কুড়িগ্রাম
২০০. মোছা: বেবী, লালমনিরহাট
২০১. শামীমা আক্তার, ঝিনাইদহ
২০২. মুন্নি, ঝিনাইদহ
২০৩. মমতা রানী দাসী, ঝিনাইদহ
২০৪. আছমা খাতুন, ঝিনাইদহ
২০৫. নাজমা খাতুন, ঠাকুরগাঁও
২০৬. শাহিনুর পারভীন, ঠাকুরগাঁও
২০৭. মোসা: শিরিন আক্তার, ঠাকুরগাঁও
২০৮. মোসা: শান্তা আক্তার, দিনাজপুর
২০৯. ইসলামুল, দিনাজপুর
২১০. পেপেতুয়া হাসদা, দিনাজপুর
২১১. শাহিনুর ইসলাম, দিনাজপুর
২১২. আব্দুল করিম প্রধান, দিনাজপুর
২১৩. মৌসুমী আক্তার, দিনাজপুর
২১৪. মোসা: গুলশানা জান্নাত, দিনাজপুর
২১৫. মোসা: নাসিমা আক্তার, দিনাজপুর
২১৬. শেফালী মার্দি, দিনাজপুর
২১৭. সাঈদা বেগম, দিনাজপুর
২১৮. মোসা: বিলকিস আক্তার, দিনাজপুর
২১৯. আইনুল ইসলাম, দিনাজপুর
২২০. মো: মাহমুদ হাসান, দিনাজপুর
২২১. মোছা: লাবনী (তানিয়া), পাবনা
২২২. রোজিনা, পাবনা
২২৩. রেশম, পাবনা
২২৪. ফারজানা, পাবনা
২২৫. মিতা খাতুন, পাবনা
২২৬. পারভিন আক্তার (মিনা), পাবনা
২২৭. মো: খলিল হোসেন, পাবনা
২২৮. ফরিদ হোসেন, পাবনা
২২৯. পারভীন, পাবনা
২৩০. মো: লিটন, পাবনা
২৩১. হাসিনা, পাবনা
২৩২. আতাউর রহমান, বগুড়া
২৩৩. মোসা: বৃষ্টি, বগুড়া
২৩৪. মোছা: সাথি আক্তার, বগুড়া
২৩৫. ওবাইদুল রহমান, বগুড়া
২৩৬. ইয়াসমিন, বগুড়া
২৩৭. আসাদুল বেপারী, বগুড়া
২৩৮. সুরুজ মিয়া, বগুড়া
২৩৯. লাইজু আক্তার, ভোলা
২৪০. জিনাদ আরা পপি, ভোলা
২৪১. রাবেয়া খাতুন, ভোলা
২৪২. স্মৃতি বেগম, নীলফামারী

২৪৩. সখিনা, নীলফামারী
২৪৪. এনি বেগম, নীলফামারী
২৪৫. সালমা বেগম, ঝালকাঠি
২৪৬. মোছা: লাকী, ঝালকাঠি
২৪৭. হালিমা, গাইবান্ধা
২৪৮. রাজা, গাইবান্ধা
২৪৯. বাবু মিয়া, টাঙ্গাইল
২৫০. সাথি আক্তার, টাঙ্গাইল
২৫১. রহিমা, টাঙ্গাইল
২৫২. মোছা : সুমি বগম, টাঙ্গাইল
২৫৩. নাসিমা আক্তার, টাঙ্গাইল
২৫৪. আয়েশা, কুষ্টিয়া
২৫৫. জহুরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া
২৫৬. মো: উজ্জ্বল, কুষ্টিয়া
২৫৭. টিপু, কুষ্টিয়া
২৫৮. সিমা খাতুন (সুজাতা), কুষ্টিয়া
২৫৯. নূরজাহান বেগম, কুষ্টিয়া
২৬০. মুক্তি, কুষ্টিয়া
২৬১. হালিমা খাতুন, কুষ্টিয়া
২৬২. শাহাদাত হোসেন, মেহেরপুর
২৬৩. রবিউল ইসলাম, মেহেরপুর
২৬৪. রাশিদা খাতুন, মেহেরপুর
২৬৫. হেনা, বরিশাল
২৬৬. হাসি বেগম, বরিশাল
২৬৭. রিতু বাড়ৈই, বরিশাল
২৬৮. জান্নাত, বরিশাল
২৬৯. নাজমা, বরিশাল
২৭০. মোছা: কুলসুম, লক্ষীপুর
২৭১. রিনা আক্তার, লক্ষীপুর
২৭২. শাহিনুর, নেত্রকোনা
২৭৩. তানিয়া, নেত্রকোনা
২৭৪. সালেহা বেগম, চুয়াডাঙ্গা
২৭৫. শিরিন আক্তার, চুয়াডাঙ্গা
২৭৬. আছমা আক্তার,

রানা প্লাজা ধসে আহতদের নামের তালিকা

১. মঞ্জু, গাইবান্ধা
২. হুমায়ুন কবির, ঢাকা
৩. হাসনা, ফরিদপুর
৪. রাজিয়া, মানিকগঞ্জ
৫. খাদিম, টাঙ্গাইল
৬. মো: সুরুজ মিয়া, রংপুর
৭. ময়না, রাজশাহী
৮. বাবুল হোসেন, ঢাকা
৯. মনিকা, দিনাজপুর
১০. হাজেরা বেগম, ফরিদপুর
১১. মিম, জয়পুরহাট
১২. ছানোয়ার হোসেন, জামালপুর
১৩. মো: জাকির, ঝালকাঠি
১৪. আব্দুল রাজ্জাক, দিনাজপুর
১৫. কমল চন্দ্র রায়, দিনাজপুর
১৬. মো: আলমগীর, নওগাঁ
১৭. রিমা, ভোলা
১৮. রতনা, নরসিংদী
১৯. রুবিনা, রংপুর
২০. অঞ্জনা, হবিগঞ্জ
২১. সালমা, ঝিনাইদহ
২২. বেলি, সিরাজগঞ্জ
২৩. শিউলি, ঠাকুরগাঁও
২৪. মোমেনা, নওগাঁ
২৫. মোরশেদা, গাইবান্ধা
২৬. মো: হাবিবুর রহমান, নীলফামারী
২৭. শুভ, মানিকগঞ্জ
২৮. আছিয়া, টাঙ্গাইল
২৯. আঞ্জুয়ারা, রাজশাহী
৩০. মো: শাহিন, ময়মনসিংহ
৩১. মো: ছায়দুর, সাতক্ষীরা
৩২. মো: সামসুল আলম, নওগাঁ
৩৩. শাহ্নাজ, পিরোজপুর
৩৪. নাছিমা, খুলনা
৩৫. সাহেদা, রাজবাড়ী
৩৬. হেলেনা, মানিকগঞ্জ
৩৭. রোকেয়া, রাজবাড়ী
৩৮. রেখা, ফরিদপুর
৩৯. মোসাঃ তাসলিমা, ফরিদপুর
৪০. মনোয়ারা বেগম, ফরিদপুর
৪১. মো: মোশারফ হোসেন, রংপুর
৪২. আইরিন, জামালপুর
৪৩. বাচ্চু মিয়া, ভোলা
৪৪. বাবুল, নওগাঁ
৪৫. আল আমিন, রংপুর
৪৬. সালমা, ফেনী
৪৭. বাবু, শরিয়তপুর
৪৮. আবুল কালাম, পিরোজপুর
৪৯. শামিমা, বগুড়া
৫০. মো: সোহেল, জামালপুর
৫১. সাদ্দাম, দিনাজপুর
৫২. মো: সেলিম, কিশোরগঞ্জ
৫৩. সুমন, কিশোরগঞ্জ
৫৪. নার্গিস, মানিকগঞ্জ
৫৫. শিপু রানী দাস, হবিগঞ্জ
৫৬. রোজিনা, জামালপুর
৫৭. মর্জিনা, জয়পুরহাট
৫৮. সাবিনা, পাবনা
৫৯. ববিতা, বগুড়া
৬০. কমলা ভানু, জয়পুরহাট
৬১. রেহেনা, বাগেরহাট
৬২. রেহেনা, গাইবান্ধা
৬৩. জেসমিন, ফরিদপুর
৬৪. মরিয়ম বেগম, গাইবান্ধা
৬৫. কল্পনা, নীলফামারী
৬৬. মজিদা বেগম, রংপুর
৬৭. রোকেয়া, ভোলা
৬৮. রত্না রানী, সিরাজগঞ্জ
৬৯. নাসিমা, পটুয়াখালী
৭০. অতিজান, নওগাঁ
৭১. সপুরা আক্তার, বগুড়া
৭২. সুরমা, ভোলা
৭৩. খোকন, বরগুনা
৭৪. সায়মা, নওগাঁ
৭৫. শরিফুল ইসলাম, নওগাঁ
৭৬. শাকিল, যশোর
৭৭. ইসমাইল, জামালপুর
৭৮. মো: রাশেদুজ্জামান, গাইবান্ধা

৭৯. পারুল, যশোর
৮০. জেসমিন, মানিকগঞ্জ
৮১. রাশেদুল ইসলাম, রংপুর
৮২. আছিয়া, নওগাঁ
৮৩. ইসমত আরা, নড়াইল
৮৪. জোৎস্না বেগম, ফরিদপুর
৮৫. মনি বেগম, পিরোজপুর
৮৬. শিউলি, পিরোজপুর
৮৭. সখিনা, রাজবাড়ী
৮৮. আব্দুল হান্নান, বগুড়া
৮৯. তারিকুল ইসলাম, রাজশাহী
৯০. মো: হারুন, ঝালকাঠি
৯১. বিজয় দাস, সুনামগঞ্জ
৯২. রিংকু, কুষ্টিয়া
৯৩. শাহ্নাজ, কুষ্টিয়া
৯৪. রুপালী, রংপুর
৯৫. আব্দুর রশিদ, জয়পুরহাট
৯৬. সকিনা, গাইবান্ধা
৯৭. সাবিনা, গাইবান্ধা
৯৮. লুৎফর রহমান, নওগাঁ
৯৯. মোক্তার, চাঁদপুর
১০০. শিরিন, বি বাড়িয়া
১০১. আঞ্জুয়ারা, পাবনা
১০২. রুনা আক্তার, বরগুনা
১০৩. কাশেম, কিশোরগঞ্জ
১০৪. মিঠুন, টাঙ্গাইল
১০৫. সাথী, দিনাজপুর
১০৬. সুজন, দিনাজপুর
১০৭. ময়না, ভোলা
১০৮. শাপলা, রংপুর
১০৯. মেঘলা, রংপুর
১১০. জেসমিন, যশোর
১১১. মিতা, পাবনা
১১২. জাহাঙ্গীর কবির, কিশোরগঞ্জ
১১৩. উজ্জল, বরগুনা
১১৪. শিখা, রাজবাড়ী
১১৫. সেলিমা, বাগেরহাট
১১৬. নাছিমা, দিনাজপুর
১১৭. কাজল, ঢাকা
১১৮. সোনিয়া, বাগেরহাট
১১৯. সোহাগ খাঁন, বাগেরহাট
১২০. ডালিয়া, নাটোর
১২১. নিলুরানী, হবিগঞ্জ
১২২. সেলিনা, দিনাজপুর
১২৩. সেলিনা, দিনাজপুর
১২৪. নাঈম, নড়াইল
১২৫. বায়েজিদ, জয়পুরহাট
১২৬. নাসরিন, নাটোর
১২৭. ঝর্ণা, বি বাড়িয়া
১২৮. আয়শা, মাগুরা
১২৯. সাহিদা, বরগুনা
১৩০. বিনা, গাইবান্ধা
১৩১. সুমি, মুন্সিগঞ্জ
১৩২. নাজমা, গাইবান্ধা
১৩৩. শিরিন, গোপালগঞ্জ
১৩৪. জলি, ভোলা
১৩৫. চামেলি, ফরিদপুর
১৩৬. কোহিনুর, সাতক্ষীরা
১৩৭. নার্গিস, ফরিদপুর
১৩৮. রহুল আমিন, গাইবান্ধা
১৩৯. শফিকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা
১৪০. নবী হোসেন, বরগুনা
১৪১. পিন্টু, গোপালগঞ্জ
১৪২. রফিকুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ
১৪৩. মো: আবুল কালাম, রংপুর
১৪৪. আনোয়ারুল, গাইবান্ধা
১৪৫. লিটন সাহা, ঢাকা
১৪৬. সারবানু, দিনাজপুর
১৪৭. ফাতেমা, পটুয়াখালী
১৪৮. শাহিনুর, বরিশাল
১৪৯. তানজিনা, বি বাড়িয়া
১৫০. অনুপমা, হবিগঞ্জ
১৫১. জুলহাস, মানিকগঞ্জ
১৫২. রেখা, নাটোর
১৫৩. মো: আব্দুল হালিম, ঢাকা
১৫৪. মোসাঃ শিলপি, নওগাঁ
১৫৫. মো: আলাউদ্দিন, গাজীপুর
১৫৬. মিনা, যশোর
১৫৭. নদী, রাজবাড়ী
১৫৮. রিনা, ভোলা
১৫৯. মুন্নি, বরিশাল
১৬০. জাহানারা, বগুড়া
১৬১. মাসুদা, গাইবান্ধা
১৬২. দিপালী, দিনাজপুর
১৬৩. পারভিন, জামালপুর
১৬৪. রিনা, কুষ্টিয়া
১৬৫. হাফিজুর
১৬৬. তাসলিমা, বাগেরহাট

১৬৭. আবুল কালাম, শেরপুর
১৬৮. হৃদয়, কুষ্টিয়া
১৬৯. মঞ্জিলা, রংপুর
১৭০. আনোয়ারা, রংপুর
১৭১. আন্না, জামালপুর
১৭২. রিক্তা বেগম, মানিকগঞ্জ
১৭৩. সিমা, জামালপুর
১৭৪. শারমিন, নোয়াখালী
১৭৫. মনির, ঢাকা
১৭৬. মিম, জয়পুরহাট
১৭৭. হাসিনা, মানিকগঞ্জ
১৭৮. ইনুরায়, পাবনা
১৭৯. মরিয়ম, লক্ষীপুর
১৮০. বাবু, শরিয়তপুর
১৮১. রিয়াদ, চট্টগ্রাম
১৮২. লিটন, যশোর
১৮৩. লাবনী, নড়াইল
১৮৪. ইতি, ঝিনাইদহ
১৮৫. লাবনী, গাইবান্ধা
১৮৬. শাহিনুর, রংপুর
১৮৭. আহমেদ হোসেন, মানিকগঞ্জ
১৮৮. জাহাঙ্গীর, মানিকগঞ্জ
১৮৯. হালিম, রাজবাড়ী
১৯০. মোছাঃ নিলুফা, ঝিনাইদহ
১৯১. মোছাঃ রুবিনা, ঢাকা
১৯২. মোঃ মোফাজ্জল, দিনাজপুর
১৯৩. মোঃ মনির হোসেন, গাইবান্ধা
১৯৪. লাভলী, গাইবান্ধা
১৯৫. পাখি, ঢাকা
১৯৬. মনজু, রংপুর
১৯৭. সুজনা, ভোলা
১৯৮. ময়না, ভোলা
১৯৯. শিল্পী বেগম, বরগুনা
২০০. বিউটি বেগম, বরগুনা
২০১. সুফিয়া, জামালপুর
২০২. আখি, ঝালকাঠি
২০৩. ফিরোজা, রাজবাড়ী
২০৪. শাহানাজ বেগম, জয়পুরহাট
২০৫. ফরিদা, কুড়িগ্রাম
২০৬. হাসনা, ফরিদপুর
২০৭. মনসুর আহমেদ, কিশোরগঞ্জ
২০৮. রিনা, ভোলা
২০৯. মোঃ জুয়েল, ঝিনাইদহ
২১০. রাশেদুজ্জামান, গাইবান্দা
২১১. মলি, গাইবান্দা
২১২. মরিয়ম, নওগাঁ
২১৩. জেসমিন, ঢাকা
২১৪. আফরোজা, নওগাঁ
২১৫. রিমা, গোপালগঞ্জ
২১৬. মেহেদী হাসান, দিনাজপুর
২১৭. নুর হোসেন, ঢাকা
২১৮. নাজমিন, মেহেরপুর
২১৯. আয়শা, ঠাকুরগাঁও
২২০. আনোয়ারা, ঢাকা
২২১. নাছরিন, গাইবান্দা
২২২. সবিতা রানী, হবিগঞ্জ
২২৩. দুদু মোল্লা, রাজবাড়ী
২২৪. ইয়াসমিন, রংপুর
২২৫. সমাপ্তী রানী দাস, হবিগঞ্জ
২২৬. নিলুফা, বগুড়া
২২৭. অপুজয়ধর, গোপালগঞ্জ
২২৮. ইয়াসমিন আক্তার, রংপুর
২২৯. পিয়ারী বেগম, রংপুর
২৩০. নাছরিন, ফরিদপুর
২৩১. শাকিল, দিনাজপুর
২৩২. মারুফ আলম, বি বাড়িয়া
২৩৩. নুরুজ্জামান, কুষ্টিয়া
২৩৪. রিনা, মানিকগঞ্জ
২৩৫. সুমি, ঝালকাঠি
২৩৬. ইব্রাহিম, লালমনিরহাট
২৩৭. ছারোয়ার হোসেন, সিরাজগঞ্জ
২৩৮. মিটন হোসেন, টাঙ্গাইল
২৩৯. মোমেনা আক্তার, রাজবাড়ী
২৪০. রবিউল করিম, পাবনা
২৪১. মর্জিনা, জয়পুরহাট
২৪২. রওশন আরা বেগম, পঞ্চগড়
২৪৩. রোকেয়া, রাজবাড়ী
২৪৪. মজিদা, রংপুর
২৪৫. পারুল, নওগাঁ
২৪৬. শিরীন, যশোর
২৪৭. ভগবতী, হবিগঞ্জ
২৪৮. মর্জিনা, জামালপুর
২৪৯. জোসনা, রাজবাড়ী
২৫০. লুৎফা, ঢাকা
২৫১. পাভেল, মেহেরপুর
২৫২. দিলজান, গাইবান্দা
২৫৩. হেলেনা, নওগাঁ
২৫৪. শামছুন নাহার, গাইবান্দা

২৫৫. মো: তরিকুল ইসলাম, দিনাজপুর
২৫৬. সবুজ, জামালপুর
২৫৭. জোবেদা, মানিকগঞ্জ
২৫৮. মমতাজ, বরিশাল
২৫৯. খোদেজা, চাঁদপুর
২৬০. ইয়াসমিন আক্তার, বি বাড়িয়া
২৬১. লাকী, নওগাঁ
২৬২. কাজলী, পাবনা
২৬৩. লিপি, মানিকগঞ্জ
২৬৪. পারুল, মানিকগঞ্জ
২৬৫. রহিমা, দিনাজপুর
২৬৬. শিউলী, গোপালগঞ্জ
২৬৭. আয়শা, মাদারীপুর
২৬৮. মেরিনা, মেহেরপুর
২৬৯. লাইলী, জামালপুর
২৭০. শারমিন,বগুড়া
২৭১. আক্কাস, বরিশাল
২৭২. আল আমিন, রংপুর
২৭৩. কোহিনুর ইসলাম, ঢাকা
২৭৪. নাসিমা, ভোলা
২৭৫. লাবনী, ঢাকা
২৭৬. বিউটি রানী, টাঙ্গাইল
২৭৭. নুরুল ইসলাম, ঢাকা
২৭৮. রুলী, দিনাজপুর
২৭৯. শিরিন, গোপালগঞ্জ
২৮০. বৃষ্টি, ঢাকা
২৮১. আয়শা, মাগুরা
২৮২. তোফাজ্জল, দিনাজপুর
২৮৩. আকমল, কুষ্টিয়া
২৮৪. হযরত আলী, মানিকগঞ্জ
২৮৫. ডিপজল, ঢাকা
২৮৬. রফিকুল, বাগেরহাট
২৮৭. আসমা, ঢাকা
২৮৮. সালেহা, ঢাকা
২৮৯. হেলেনা, টাঙ্গাইল
২৯০. মিন্টু, টাঙ্গাইল
২৯১. ফারুক, বরিশাল
২৯২. সুমি আক্তার, যশোর
২৯৩. রুকসানা, মাগুরা
২৯৪. লিলি, ঢাকা
২৯৫. আজমল, পাবনা
২৯৬. আল্পনা, ঢাকা
২৯৭. লিমা, বরিশাল
২৯৮. আব্দুস সোবহান, পাবনা
২৯৯. রাজিয়া সুলতানা, নাটোর
৩০০. মল্লিকা, জামালপুর
৩০১. আখি, গাইবান্ধা
৩০২. তাসলিমা, বরগুনা
৩০৩. আমানউল্লাহ, ঢাকা
৩০৪. বিনা, ঢাকা
৩০৫. হাসিনা, ঢাকা
৩০৬. নিলা, রাজশাহী
৩০৭. শিউলি, ঢাকা
৩০৮. লতা, ঢাকা
৩০৯. সাহিদা, ঢাকা
৩১০. নারগিস, ভোলা
৩১১. সাদি, ঢাকা
৩১২. সপ্না, সিরাজগঞ্জ
৩১৩. নিলুফা, ঢাকা
৩১৪. রিতা, মাদারীপুর
৩১৫. প্রতিমা, মানিকগঞ্জ
৩১৬. নাসরিন, রাজবাড়ী
৩১৭. সালমা, মানিকগঞ্জ
৩১৮. মেরিনা, নওগাঁ
৩১৯. সাহিদা, গাইবান্ধা
৩২০. মো: আমজাদ, কুষ্টিয়া
৩২১. মো: কবির হোসেন, ঢাকা
৩২২. ইমদাদুল হক, নেত্রকোনা
৩২৩. আকলিমা, মানিকগঞ্জ
৩২৪. জরিনা বেগম, মাগুরা
৩২৫. শাহিনুর বেগম, গাইবান্ধা
৩২৬. রেবেকা, মানিকগঞ্জ
৩২৭. পুরভি, সিলেট
৩২৮. মোমেনা, গাইবান্ধা
৩২৯. জায়েদা, মানিকগঞ্জ
৩৩০. মোমোনা আক্তার, মাগুরা
৩৩১. নার্সিন, মাদারীপুর
৩৩২. শেখ ফিরোজ, গাজীপুর
৩৩৩. আকলিমা,পাবনা
৩৩৪. মো: রাজিব, বরিশাল
৩৩৫. রিনা আক্তার, নওগাঁ
৩৩৬. বুলবুলি, নওগাঁ
৩৩৭. সুমিত্রা, হবিগঞ্জ
৩৩৮. রোকসানা, পিরোজপুর
৩৩৯. ফাহিমা, মেহেরপুর
৩৪০. জেয়েসমিন, ময়মনসিংহ
৩৪১. রোকেয়া, ভোলা
৩৪২. রোকেয়া বেগম, ঢাকা

৩৪৩. রহিমা বেগম, ময়মনসিংহ
৩৪৪. ইমরান হোসেন, ঢাকা
৩৪৫. দুখুমিয়া, জয়পুরহাট
৩৪৬. আখি, ঢাকা
৩৪৭. ময়না, মানিকগঞ্জ
৩৪৮. শোকরানী, চাপাইনবাবগঞ্জ
৩৪৯. আব্দুর রব, পাবনা
৩৫০. মো: সোহেল, ঢাকা
৩৫১. খাদিজা, মাগুড়া
৩৫২. মো: শফিক, নীলফামারী
৩৫৩. শিমুল জাহিদ, পাবনা
৩৫৪. তাজুল ইসলাম, লালমনিরহাট
৩৫৫. হোসাইন, টাঙ্গাইল
৩৫৬. মাসুমা বেগম, দিনাজপুর
৩৫৭. নিপা, রংপুর
৩৫৮. মেহেদী হাসান, দিনাজপুর
৩৫৯. খলিল, টাঙ্গাইল
৩৬০. ঝর্ণা খাতুন, চাপাইনবাবগঞ্জ
৩৬১. রোকেয়া পারভীন, গোপালগঞ্জ
৩৬২. বিউটি, গাইবান্ধা
৩৬৩. সবিনা বেগম, ঢাকা
৩৬৪. কাঞ্চন বেগম, রাজবাড়ী
৩৬৫. মমতাজ, ঢাকা
৩৬৬. আনোয়ারা খাতুন মুক্তা, যশোর
৩৬৭. শাহজালাল, বাগেরহাট
৩৬৮. কুলসুম বেগম, পাবনা
৩৬৯. জুথি, গাইবান্ধা
৩৭০. নাজমা বেগম, সাতক্ষীরা
৩৭১. আসমা, গাজীপুর
৩৭২. হেসেনা, ময়মনসিংহ
৩৭৩. লাইলী বেগম, রাজবাড়ী
৩৭৪. নাসিমা বেগম, কিশোরগঞ্জ
৩৭৫. সুমি, পঞ্চগড়
৩৭৬. শিল্পি বেগম, গোপালগঞ্জ
৩৭৭. জোসেফা আক্তার বেলী, লালমনিরহাট
৩৭৮. মো: শহিদুল ইসলাম, ঢাকা
৩৭৯. মনিরা খাতুন, টাঙ্গাইল
৩৮০. মো: আব্দুল গফুর, নাটোর
৩৮১. মো: বিলাল হোসেন, গাজীপুর
৩৮২. আব্দুর রহমান স্বপন, ঢাকা
৩৮৩. লাভলী বেগম, রংপুর
৩৮৪. ইউসুফ আলী, মানিকগঞ্জ
৩৮৫. মনিকা, গাইবান্ধা
৩৮৬. রেবেকা, দিনাজপুর
৩৮৭. মনিফা বেগম, গাইবান্ধা
৩৮৮. সাথি বেগম, যশোর
৩৮৯. আয়নাল হোসেন, গাইবান্ধা
৩৯০. শহিদুল ইসলাম, বগুড়া
৩৯১. রাজিব হোসেন, বরিশাল
৩৯২. ইমরুল কায়েস, দিনাজপুর
৩৯৩. রিপন হোসেন, বরগুনা
৩৯৪. মো: মেহের রানা, টাঙ্গাইল
৩৯৫. সৈনিক রানা, কুমিল্লা
৩৯৬. রুপা বশির, বরিশাল
৩৯৭. মনোয়ারা বেগম, কুড়িগ্রাম
৩৯৮. শাকিলা, বগুড়া
৩৯৯. সুমি বেগম, টাঙ্গাইল
৪০০. মোস্তফা, মাদারীপুর
৪০১. নিজাম, মানিকগঞ্জ
৪০২. মর্তুজা, বরিশাল
৪০৩. মো: রাশেদুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম
৪০৪. শিহাব উদ্দিন, চট্টগ্রাম
৪০৫. মো: রহুল আমিন, ময়মনসিংহ
৪০৬. লালন শেখ, বাগেরহাট
৪০৭. মনির হোসেন, ঢাকা
৪০৮. মো: রুবেল, নওগাঁ
৪০৯. দেলোয়ার হোসেন, পটুয়াখালী
৪১০. সিদ্দিকুর রহমান, বরিশাল
৪১১. খলিলুর রহমান, পঞ্চগড়
৪১২. আলামিন, রাজশাহী
৪১৩. সালাম, কুষ্টিয়া
৪১৪. মো: মোবারক ভূইয়া, নোয়াখালী
৪১৫. অমর চন্দ্রা দাস, কুমিল্লা
৪১৬. ঝর্ণা বেগম, পাবনা
৪১৭. জয়া, মানিকগঞ্জ
৪১৮. সিমা, মানিকগঞ্জ
৪১৯. জেসমিন বেগম, মানিকগঞ্জ
৪২০. রফিকুল ইসলাম, মাদারীপুর
৪২১. কাউসার, কুষ্টিয়া
৪২২. খোকন, ভোলা
৪২৩. মুকুল মহন কুন্ড, ময়মনসিংহ
৪২৪. শ্যামলী, মানিকগঞ্জ
৪২৫. নিলোফা ইয়াসমিন, নরসিংদী
৪২৬. শরিফা বেগম, নওগাঁ
৪২৭. ময়না বেগম, পাবনা
৪২৮. আঞ্জুমান আরা, হবিগঞ্জ
৪২৯. নিলুফা বেগম, পাবনা
৪৩০. আঞ্জারা, টাঙ্গাইল

৪৩১. শিরিনা বেগম, ফরিদপুর
৪৩২. বিমলা, কিশোরগঞ্জ
৪৩৩. জাহানারা বেগম, মানিকগঞ্জ
৪৩৪. ফাতেমা, পাবনা
৪৩৫. হাসি বেগম, পাবনা
৪৩৬. হিরা রানী দাস, নওগাঁ
৪৩৭. দুরমতি, হবিগঞ্জ
৪৩৮. বুলবুলি বেগম, রংপুর
৪৩৯. আউশি, মানিকগঞ্জ
৪৪০. শিউলী, নাটোর
৪৪১. মালেকা বেগম, মানিকগঞ্জ
৪৪২. হাসিনা বেগম, কুষ্টিয়া
৪৪৩. নুপুর বেগম, বগুড়া
৪৪৪. রিনা বেগম, দিনাজপুর
৪৪৫. নুপুর বেগম, ভোলা
৪৪৬. তায়েবা বেগম, রাজবাড়ী
৪৪৭. অরিয়না খাতুন, রাজশাহী
৪৪৮. স্বরসতী রানী, বগুড়া
৪৪৯. বিউটি, বগুড়া
৪৫০. ফাহিম
৪৫১. কামরুন নাহার,গাইবান্ধা
৪৫২. ছাবিহা সুলতানা, পাবনা
৪৫৩. সুইটি সুলতানা, ঢাকা
৪৫৪. শিল্পী বেগম, দিনাজপুর
৪৫৫. লাইলী বেগম, জামালপুর
৪৫৬. সুমনা, দিনাজপুর
৪৫৭. ছাবিনা, কিশোরগঞ্জ
৪৫৮. রোকিয়া, মানিকগঞ্জ
৪৫৯. তাসলিমা, ভোলা
৪৬০. অনিমা, টাঙ্গাইল
৪৬১. পারভিন, রাজবাড়ী
৪৬২. মোঃ বিল্লাল, টাঙ্গাইল
৪৬৩. মজিবর, মানিকগঞ্জ
৪৬৪. ইউসুফ, নওগাঁ
৪৬৫. আনোয়ারুল হক, রংপুর
৪৬৬. তাসলিমা, বাগেরহাট
৪৬৭. তাজুল ইসলাম, লালমনিরহাট
৪৬৮. আওয়াল খান, ঢাকা
৪৬৯. সোহেল রানা, নওগাঁ
৪৭০. গৌরাঙ্গ, বগুড়া
৪৭১. মাওলানা আব্দুল আহাদ, ঢাকা
৪৭২. মোঃ রাকিব, ফরিদপুর
৪৭৩. সুমি, রংপুর
৪৭৪. সুর্মিলা, হবিগঞ্জ
৪৭৫. ফাতেমা বেগম, মানিকগঞ্জ
৪৭৬. চম্পা, পাবনা
৪৭৭. মুক্তা, যশোর
৪৭৮. সপ্না, নওগাঁ
৪৭৯. রেহেনা, সিরাজগঞ্জ
৪৮০. মানিক, কুড়িগ্রাম
৪৮১. মোঃ সাদিক, বরিশাল
৪৮২. জাকির হোসেন, মাগুড়া
৪৮৩. তাপস আরফান, মুন্সিগঞ্জ
৪৮৪. খাজা রতন, বি বাড়িয়া
৪৮৫. লাভলী, সিরাজগঞ্জ
৪৮৬. মোঃ হযরত আলী, পঞ্চগড়
৪৮৭. আব্দুর রহিম, মানিকগঞ্জ
৪৮৮. আমেনা বেগম, নওগাঁ
৪৮৯. শাহ্নাজ মিয়া, দিনাজপুর
৪৯০. উজ্জল, পাবনা
৪৯১. শিরিনা, নওগাঁ
৪৯২. উর্মি বেগম, নেত্রকোনা
৪৯৩. মাহিদুল, রংপুর
৪৯৪. ছাদেকুল ইসলাম, রংপুর
৪৯৫. শাবানা, গাইবান্ধা
৪৯৬. বিউটি বেগম, পঞ্চগড়
৪৯৭. আকলিমা, জামালপুর
৪৯৮. মিস নাজমা, ঢাকা
৪৯৯. মিসেস বেলী, ঢাকা
৫০০. মর্জিনা, সিরাজগঞ্জ
৫০১. তাজনুরী , রংপুর
৫০২. লাভলী, ঢাকা
৫০৩. রফিকুল ইসলাম, ঢাকা
৫০৪. মেরিনা, ঢাকা
৫০৫. হেনা বেগম, ঢাকা
৫০৬. ঋতু, ঢাকা
৫০৭. রেজাউল করিম, ঢাকা
৫০৮. রোজিনা বেগম, ঢাকা
৫০৯. জেসমিন আকতার, ঢাকা
৫১০. মোঃ কবির, ঢাকা
৫১১. জান্নাত আরা, ঢাকা
৫১২. বুলবুলি, ঢাকা
৫১৩. শাহ্নাজ পারভিন, ঢাকা
৫১৪. মোকছেদুর রহমান, ঢাকা
৫১৫. নূরজাহান, ঢাকা
৫১৬. শামসুর নাহার, ঢাকা
৫১৭. মিসেস জবা বেগম, ঢাকা
৫১৮. রেশমা বেগম, পিরোজপুর

৫১৯. আরজিনা, ঢাকা
৫২০. মো: হোসেন আলী, নাটোর
৫২১. মাসুদা, বরগুনা
৫২২. শিখা বেগম, ফরিদপুর
৫২৩. জাহিদুর রহমান, কুড়িগ্রাম
৫২৪. আলিফ, গাইবান্ধা
৫২৫. মো: আ: হালিম, ঢাকা
৫২৬. মো: সিদ্দিক, ঢাকা
৫২৭. রেহেনা আকতার, ঢাকা
৫২৮. ফরিদা, ঢাকা
৫২৯. সালমা খাতুন, জামালপুর
৫৩০. রুপা, ঢাকা
৫৩১. নূপুর, ঢাকা
৫৩২. ছাহেরা, ঢাকা
৫৩৩. মুক্তা, নীলফামারী
৫৩৪. সীমা আলম, বরিশাল
৫৩৫. আমেনা, নড়াইল
৫৩৬. কোহিনূর, বরিশাল
৫৩৭. মাহ্ফুজা, ঢাকা
৫৩৮. মিষ্টি, ঢাকা
৫৩৯. সাকিব, লালমনিরহাট
৫৪০. ময়না খাতুন, বরিশাল
৫৪১. বুলবুলি, বগুড়া
৫৪২. লাইলি বেগম, বরিশাল
৫৪৩. আলমগীর, গাইবান্ধা
৫৪৪. নারগিস, শরিয়তপুর
৫৪৫. রুমা বেগম, মানিকগঞ্জ
৫৪৬. আঞ্জুয়ারা, ঢাকা
৫৪৭. শাহীনুর, ঢাকা
৫৪৮. মো: মিজানুর রহমান, ঢাকা
৫৪৯. শামছুন্নাহার, ঢাকা
৫৫০. মো: মনিরুজ্জামান, যশোর
৫৫১. লিজা, ঠাকুরগাঁও
৫৫২. গীতারানী, ঢাকা
৫৫৩. মো: ইব্রাহিম মোল্লা, গোপালগঞ্জ
৫৫৪. সুফিয়া খাতুন, ঢাকা
৫৫৫. মো: রেজাউল ইসলাম, পাবনা
৫৫৬. সুমী, চাঁদপুর
৫৫৭. লাইজু আক্তার, বরিশাল
৫৫৮. সীমা রানী দাস, ঢাকা
৫৫৯. মিসেস হাসিনা, গাইবান্ধা
৫৬০. মিসেস ইয়াসমিন, রংপুর
৫৬১. মিসেস শিল্পী, রাজবাড়ী
৫৬২. মো: আলমগীর হোসেন, লালমনিরহাট
৫৬৩. মো: শরিফুল ইসলাম, গাইবান্ধা
৫৬৪. মিসেস রেখা, গাইবান্ধা
৫৬৫. রাকিব হোসেন, ঢাকা
৫৬৬. সুমাইয়া আক্তার, ঢাকা
৫৬৭. জেসমিন আক্তার, ঢাকা
৫৬৮. সালাউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা
৫৬৯. মিস. হামিদা
৫৭০. সুফিয়া, ঢাকা
৫৭১. রুখসানা আকতার, ঢাকা
৫৭২. বিজয় কুমার সরকার, টাঙ্গাইল
৫৭৩. মো: আবু সাঈদ, মানিকগঞ্জ
৫৭৪. মো: মিজান, ঢাকা
৫৭৫. নুপুর আক্তার, বরিশাল
৫৭৬. আমেনা বেগম, ঢাকা
৫৭৭. সামীন আক্তার, মানিকগঞ্জ
৫৭৮. সপ্না আক্তার, ঢাকা
৫৭৯. মিসেস শিল্পি আক্তার
৫৮০. নূরজাহান বেগম, নওগাঁ
৫৮১. নাজমা খাতুন, ঢাকা
৫৮২. রুনা, বগুড়া
৫৮৩. তানিয়া, ভোলা
৫৮৪. মো: মনির, মানিকগঞ্জ
৫৮৫. নার্গিস আক্তার, মাদারীপুর
৫৮৬. শাহিদা, ঢাকা
৫৮৭. হালিমা, ময়মনসিংহ
৫৮৮. আখি, কুমিল্লা
৫৮৯. রাশিদা, রংপুর
৫৯০. হৃদয়, ঢাকা
৫৯১. ময়না, রংপুর
৫৯২. বিথি, বগুড়া
৫৯৩. মুক্তা, পাবনা
৫৯৪. নাজমা, ঢাকা
৫৯৫. মোকছেদা, মানিকগঞ্জ
৫৯৬. রিনা, মানিকগঞ্জ
৫৯৭. নিলুফার ইয়াসমিন, ঢাকা
৫৯৮. মো: কবির হোসেন, ঢাকা
৫৯৯. মিসেস হাসিনা
৬০০. মিসেস রীতা
৬০১. মিসেস রাবেয়া, ঢাকা
৬০২. মিসেস সুনিয়া, ঢাকা
৬০৩. মিসেস রিমা, ঢাকা
৬০৪. সুমী, ঢাকা
৬০৫. মহব্বত খান, ঢাকা
৬০৬. পারভীন, ঢাকা

৬০৭. হিরা, ঢাকা
৬০৮. সায়েদুল মন্ডল, ঢাকা
৬০৯. তাজেনুর, ঢাকা
৬১০. নাসির উদ্দিন, ঢাকা
৬১১. আয়েশা আরবী, ঢাকা
৬১২. রায়হান, নওগাঁ
৬১৩. জেসমিন, ঢাকা
৬১৪. আনোয়ারা, রংপুর
৬১৫. সাবিনা, নাটোর
৬১৬. আম্বিয়া, পাবনা
৬১৭. আসমা, পাবনা
৬১৮. মানসুরা, শেরপুর
৬১৯. লতিফা, নওগাঁ
৬২০. রীনা, ঢাকা
৬২১. শামিমা, রাজবাড়ী
৬২২. রুবি, মানিকগঞ্জ
৬২৩. নাজু, মুন্সিগঞ্জ
৬২৪. সপ্না, মাগুরা
৬২৫. রুবিনা, বরিশাল
৬২৬. আসমা, কুষ্টিয়া
৬২৭. জুলেখা, কুষ্টিয়া
৬২৮. শারমিন, দিনাজপুর
৬২৯. সুমা, বরিশাল
৬৩০. শরিফা, রংপুর
৬৩১. মুন্না, পিরোজপুর
৬৩২. মাসুম আলী, রংপুর
৬৩৩. রেজা, ঢাকা
৬৩৪. কবির হোসেন, ঢাকা
৬৩৫. ইছা, ঢাকা
৬৩৬. মানসুর আহম্মদ, চাঁদপুর
৬৩৭. গোপাল, ঢাকা
৬৩৮. মিনি, ঢাকা
৬৩৯. মুক্তি, ঢাকা
৬৪০. রুমানা, ঢাকা
৬৪১. লাকী, নওগাঁ
৬৪২. মৌসুমী, ঢাকা
৬৪৩. রুবেল, নওগাঁ
৬৪৪. উজ্জল, কুষ্টিয়া
৬৪৫. রতন, ঢাকা
৬৪৬. রাহেলা খাতুন, ঢাকা
৬৪৭. মনোয়ারা, ঢাকা
৬৪৮. পলি, রাজবাড়ী
৬৪৯. নাহার, ঢাকা
৬৫০. সাজেদা, ঢাকা
৬৫১. কুলসুম, ভোলা
৬৫২. হেনা, জয়পুরহাট
৬৫৩. জোনাকী, গাইবান্ধা
৬৫৪. বাবুল, সিরাজগঞ্জ
৬৫৫. লুৎফর রহমান, নওগাঁ
৬৫৬. মাহিনুর, বরগুনা
৬৫৭. জান্নাতুল, দিনাজপুর
৬৫৮. বৃষ্টি দাস, গাজীপুর
৬৫৯. নিলুফা, রংপুর
৬৬০. ইয়াসমীন, রাজবাড়ী
৬৬১. ফিরোজা, গাইবান্ধা
৬৬২. দুলিয়া, বরগুনা
৬৬৩. মোসলিমা, নাটোর
৬৬৪. শাকিলা, জামালপুর
৬৬৫. পিন্টু, বগুড়া
৬৬৬. মোছাঃ বুলবুলি খাতুন, নাটোর
৬৬৭. নুর জাহান, ঢাকা
৬৬৮. সাইফুল, জামালপুর
৬৬৯. আরিফ, ঢাকা
৬৭০. রাজিয়া, ঢাকা
৬৭১. মো: আঃ খালেক, সিরাজগঞ্জ
৬৭২. মো: আঃ রহিম, সিরাজগঞ্জ
৬৭৩. মো: জহির হোসেন, ঢাকা
৬৭৪. মেহের দেব মীর, মৌলভীবাজার
৬৭৫. আ: মজিদ, দিনাজপুর
৬৭৬. মো: ফিরোজ, শেরপুর
৬৭৭. মো: নয়ন, রাজবাড়ী
৬৭৮. নিতোষ, হবিগঞ্জ
৬৭৯. আঃ রউফ, মেহেরপুর
৬৮০. মালা, মেহেরপুর
৬৮১. রিয়াদ, চট্টগাম
৬৮২. রাসেল, চট্টগাম
৬৮৩. সুখী সালমা, চট্টগ্রাম
৬৮৪. শারমীন, বরগুনা
৬৮৫. ফাতেমা, নওগাঁ
৬৮৬. সাহিদা, পটুয়াখালী
৬৮৭. জান্নাত, চাঁদপুর
৬৮৮. লাকী, মানিকগঞ্জ
৬৮৯. খাদিজা, টাঙ্গাইল
৬৯০. মমতাজ, বরিশাল
৬৯১. লতিফা, জয়পুরহাট
৬৯২. শাহানাজ, নাটোর
৬৯৩. লাভলী, গাইবান্ধা
৬৯৪. সোহাগী, মানিকগঞ্জ

৬৯৫. নিলুফা, দিনাজপুর
৬৯৬. রিয়াজুল ইসলাম, দিনাজপুর
৬৯৭. শম্পা, কুষ্টিয়া
৬৯৮. কাজুলী আকতার, কুষ্টিয়া
৬৯৯. বিলকিস, টাঙ্গাইল
৭০০. তানিয়া, জয়পুরহাট
৭০১. লিজা, গোপালগঞ্জ
৭০২. কেয়া, নড়াইল
৭০৩. মো: রেজাউল করিম, মানিকগঞ্জ
৭০৪. নুরুন্নবী, দিনাজপুর
৭০৫. রুয়ানা, বরগুনা
৭০৬. লাবনী, বগুড়া
৭০৭. রুপালী, ফরিদপুর
৭০৮. সাথী, মানিকগঞ্জ
৭০৯. তানজিলা আক্তার, রাজবাড়ী
৭১০. মুক্তা, ঢাকা
৭১১. মো: খোরশেদ আলম, শেরপুর
৭১২. ঝর্ণা, কিশোরগঞ্জ
৭১৩. রাজু আহমেদ, ঢাকা
৭১৪. কাজিমুদ্দিন, মানিকগঞ্জ
৭১৫. আনোয়ার হোসেন, ঢাকা
৭১৬. মো: শাহাবুদ্দিন, বরিশাল
৭১৭. আঙ্গরী, সিরাজগঞ্জ
৭১৮. শিল্পী, ঢাকা
৭১৯. আশা
৭২০. সিমা, রাজবাড়ী
৭২১. শিরিন আক্তার, মুন্সীগঞ্জ
৭২২. রফিকুল ইসলাম, নওগাঁ
৭২৩. মোসাঃ শিউলী বেগম, কুড়িগ্রাম
৭২৪. কাজী আরিফুল হোসেন, রাজবাড়ী
৭২৫. ঝরনা বেগম
৭২৬. মিসেস রিনা বেগম, রংপুর
৭২৭. মিসেস ইয়ানুর বেগম, বরিশাল
৭২৮. মো: ঝন্টু, ঝিনাইদহ
৭২৯. রোজিনা, টাঙ্গাইল
৭৩০. তাছলিমা, ফরিদপুর
৭৩১. আশরাফুল, ময়মনসিংহ
৭৩২. রহিমা বেগম, গাইবান্ধা
৭৩৩. লাবনী
৭৩৪. জিয়াসমিন জলিল, রাজবাড়ী
৭৩৫. সেলিম রানা, পঞ্চগড়
৭৩৬. কামরুল, সিরাজগঞ্জ
৭৩৭. শিরিনা, খুলনা
৭৩৮. হেনা (রেহেনা), পাবনা
৭৩৯. মোজাম্মেল, সিরাজগঞ্জ
৭৪০. মোসাঃ মমতাজ বেগম, রংপুর
৭৪১. ইয়াকুব আলী, ঢাকা
৭৪২. রিক্তা মনি, গাইবান্ধা
৭৪৩. রোজিনা বেগম, ঢাকা
৭৪৪. সোহেল রানা, টাঙ্গাইল
৭৪৫. ফেলী বেগম, যশোর
৭৪৬. শিল্পী আক্তার, রাজবাড়ী
৭৪৭. মো: জুয়েল শেখ, ঢাকা
৭৪৮. শিরিনা আক্তার, খুলনা
৭৪৯. আকতার বানু, রংপুর
৭৫০. আমজাদ হোসেন, গাজীপুর
৭৫১. আমেনা, ঢাকা
৭৫২. আবদুল লতিফ, রংপুর
৭৫৩. রিনা, রংপুর
৭৫৪. ইব্রাহীম হাওলাদার, বরিশাল
৭৫৫. মিসেস সপ্না, নোয়াখালী
৭৫৬. মোক্তার হোসেন, চাঁদপুর
৭৫৭. উজ্জল দাস, বরগুনা
৭৫৮. সীমা, ঢাকা
৭৫৯. রিনা, নওগাঁ
৭৬০. অজ্ঞাত (হেলপার)
৭৬১. ফারজানা
৭৬২. রহিমা বেগম মুক্তা
৭৬৩. আব্দুল সোবহান
৭৬৪. মরিয়ম
৭৬৫. ডিপজল
৭৬৬. মিজানুর রহমান
৭৬৭. আজমল হোসেন, পাবনা
৭৬৮. সাইফুল, জামালপুর
৭৬৯. লাকী, নড়াইল
৭৭০. মরিয়ম বরগুনা
৭৭১. শ্রী সুজন
৭৭২. তুহিন, গাইবান্ধা
৭৭৩. রুনু বাদল, মুন্সিগঞ্জ
৭৭৪. শামসুল আলম, নওগাঁ
৭৭৫. রুনা বেগম, গোপালগঞ্জ
৭৭৬. রমজান
৭৭৭. রাসেল
৭৭৮. মোবারক হোসেন, নোয়াখালী
৭৭৯. ইমরান, মাগুরা
৭৮০. সুফিয়া বেগম
৭৮১. লিখন, শেরপুর
৭৮২. শিরিন আক্তার

৭৮৩. রাবেয়া বেগম
৭৮৪. সাবিনা
৭৮৫. সাবিনা
৭৮৬. মো: বশির আহমেদ
৭৮৭. রানা আহমেদ
৭৮৮. মিঠু মিয়া
৭৮৯. মাসুদা বেগম
৭৯০. বেদেনা (হানিফা)
৭৯১. আঞ্জুয়ারা
৭৯২. রাশিদা
৭৯৩. মরিয়ম মোস্তফা কামাল
৭৯৪. রায়হান কবির
৭৯৫. মাসুদুজ জামান (দিপু)
৭৯৬. মো: ফরহাদ
৭৯৭. মো: বাকি বিল্লাহ
৭৯৮. ফেলি
৭৯৯. সানি
৮০০. মালেকা
৮০১. শাপলা
৮০২. রোকসানা
৮০৩. সাইফুল ইসলাম রইচ
৮০৪. গোলাম রাব্বানী
৮০৫. ইয়াকুব আলী
৮০৬. তাসলিমা
৮০৭. ফিরোজা
৮০৮. রেহেনা, যশোর
৮০৯. শিল্পী
৮১০. রেবেকা
৮১১. মরিয়ম বেগম
৮১২. করুনা
৮১৩. নীরু সরদার
৮১৪. মোসাঃ হালিমা বেগম, ঢাকা
৮১৫. বেবী আক্তার, ঝালকাঠি
৮১৬. উর্মি, নেত্রকোনা
৮১৭. খায়রুন নাহার, নওগাঁ
৮১৮. রেহেনা আক্তার, গাইবান্ধা
৮১৯. জোসনা, রাজবাড়ী
৮২০. রোজিনা, জামালপুর
৮২১. বিথী, বগুড়া
৮২২. মিজানুর রহমান, লালমনিরহাট
৮২৩. রিক্তা আক্তার, ফরিদপুর
৮২৪. মো: সাখাওয়াত হোসেন, দিনাজপুর
৮২৫. রুমা আক্তার, পঞ্চগড়
৮২৬. মো: ফারুক, নওগাঁ
৮২৭. গোলাপী, পাবনা
৮২৮. রেজাউল করিম, মানিকগঞ্জ
৮২৯. আমেনা বেগম, নওগাঁ
৮৩০. শাহ্নাজ, দিনাজপুর
৮৩১. মো: আলিম, রাজবাড়ী
৮৩২. মায়ানুর বেগম, বরিশাল
৮৩৩. মো: খায়রুল ইসলাম, টাঙ্গাইল
৮৩৪. নাসির উদ্দিন, ঢাকা
৮৩৫. বুলবুল হোসেন, বাগেরহাট
৮৩৬. নূরজাহান, রাজবাড়ী
৮৩৭. মো: মোবারক, গাইবান্ধা
৮৩৮. মোস্তাফিজুর রহমান (সাভলু), দিনাজপুর
৮৩৯. নিলুফা খাতুন, ঢাকা
৮৪০. শাহ আলম, ঢাকা
৮৪১. ইমদাদুল হক, ঢাকা
৮৪২. মরিয়ম, ঢাকা
৮৪৩. সোনিয়া, ঢাকা
৮৪৪. মো: ইউসুফ আলী, বরগুনা

গার্মেন্ট শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সুপারিশসমূহ

“সকল কারখানার পরিবেশ উন্নত ও কমপ্লায়েন্স এর আওতাভুক্ত করতে হবে”
আবুল হোসাইন, টেক্সটাইল গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

“শক্তিশালী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও প্রশস্ত সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকতে হবে”
লাভলী ইয়াসমিন, রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

“কারখানা চলাকালীন কোনো তলায়ই কলাপসিবল গেট বন্ধ রাখা যাবে না। চলাচলের সিঁড়িতে মালামাল রাখা যাবে না”
মো. শফিকুল ইসলাম, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

“সাপ্তাহিক ছুটি, মেডিকেল ছুটি, বাৎসরিক ছুটি নিশ্চিত করতে হবে,
নারী শ্রমিকদের স্ব-বেতন ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে”
শামীমা আক্তার শিরীন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন

সন্তান প্রতিপালনের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা করতে হবে।
সাহিদা সরকার, বাংলাদেশ মুক্তির সংগ্রাম গার্মেন্টস ফেডারেশন

“বাধ্যতামূলক ওভার টাইম বন্ধ করতে হবে”
জাহানারা বেগম, ভাসমান নারী শ্রমিক উন্নয়ন কেন্দ্র

“আন্তর্জাতিক মান অনুসরন করে ক্ষতিপূরণ নির্দিষ্ট করতে হবে।
সে অনুসারে রানা প্লাজা, তাজরীনসহ সকল দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা করতে হবে”
মো. তৌহিদুর রহমান, বাংলাদেশ পোশাক শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন

“ট্রেড ইউনিয়নকে কার্যকর ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে”
সুলতানা আক্তার, গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক কেন্দ্র

“গার্মেন্টস শ্রমিকদের বীমার জন্য উদ্যোগী হতে হবে”
মো. শহীদুল্লাহ বাদল, বাংলাদেশ গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক ফেডারেশন

“ক্ষতিপূরনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে”
রফিকুল ইসলাম সুজন, বাংলাদেশ গার্মেন্ট এন্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন

“গার্মেন্টশ শিল্প ও শ্রমিকদের নিয়ে প্রকাশিত সকল গবেষনা একত্রিত করা এবং প্রয়োজনে পূর্ণাঙ্গ গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া”
নাজমা আক্তার, আওয়াজ ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম **Bangladesh Labour Rights Forum**

পুঁজি, দক্ষতা, শিক্ষা ও প্রযুক্তির নানাবিধ সীমাবদ্ধতা নিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীরা অতি কষ্টে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন আইন বা নীতিমালা না থাকায় তারা কর্মক্ষেত্রে নানারকম নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা ও অন্যায্যতার শিকার হচ্ছে। এছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক শ্রেণীর আইনগত স্বীকৃতি থাকলেও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সমস্যা, তা থেকে উত্তরণের উপায় ও কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের জন্য একটি সাধারন প্লাটফর্মের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির ভিত্তিতে গত ৯ জুন ২০১২-এ এই খাতে কর্মরত ১৬ টি সংগঠনের সমন্বয়ে "বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম" এর গঠন এবং আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় একটি গতিশীল ও কার্যকর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে এ খাতে কর্মরত সকলকে সম্পৃক্ত করতে এ ফোরাম কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ফোরামের সহযোগী সংগঠন ৩১টি।

সহযোগী সংগঠনসমূহ: ইউএলএফ; মুক্ত শিশু ও নারী শ্রমিক ফেডারেশন; দলিত নারী ফোরাম; রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন; নাগরিক উদ্যোগ; বাস্তুহারা সমাজ কল্যাণ সমিতি; তৃণমূল নারী উদ্যোক্তা সোসাইটি; বাংলাদেশ গার্মেন্টস টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন; ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিকসা ও মিশুক শ্রমিক ইউনিয়ন; জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন; ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন; বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি; ঢাকা জেলা অটোরিক্সা-অটোটেম্পু মিশুক যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন; লেবার রিসোর্চ সেন্টার; বাংলাদেশ গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক ফেডারেশন; বাংলাদেশ মুক্তির সংগ্রাম গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন; সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন; আওয়াজ ফাউন্ডেশন; বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন; গার্মেন্টস দর্জি শ্রমিক কেন্দ্র; এসোসিয়েশন ফর ইউথ এডভান্সমেন্ট; বাংলাদেশ হকার্স ফেডারেশন; বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা কর্মীসংঘ, ঢাকা মহানগর ট্যাক্সি ক্যাব চালক ইউনিয়ন; বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন; রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন; ন্যাচার ক্যাম্পেইন বাংলাদেশ; জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন; ভাসমান নারী শ্রমিক উন্নয়ন কেন্দ্র; পার্টনারশিপ অব উইমেন ইন একশন (পাওয়া)।

ISBN: 978 984 33 9091 2

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

সচিবালয়: নাগরিক উদ্যোগ
বাড়ি নং ৮/১৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৫৮৬৮, ফ্যাক্স: ৯১৪১৫১১
ই-মেইল: info@nuhr.org
labourrightsforum@gmail.com